বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা

১৮০০-১৯০০

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা

১৮০০-১৯০০

'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থমালার

শেষ (পঞ্চম) খণ্ড
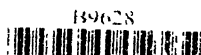
বিনয় ঘোষ

পরিবেশক

পাঠভবন

কলিকাতা-১২

ভারত সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষা উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের জন্য এই গ্রন্থের সুলভ মূল্য সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থকার কর্তৃক ৪৭।৩ যাদবপুর সেণ্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৩২ থেকে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০

ব্লক, প্লেট ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : সুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করা হয় ১৯৫৯ সালে। প্রথম সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা নিয়ে, এবং প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৬২ সালে। তারপর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'সম্বাদ ভাস্কর' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' 'বিদ্যাদর্শন' 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার সংকলন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বহু গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পত্রিকাগুলি সন্ধান করে, তার ভিতর থেকে উপকরণ-নির্বাচন করে, কপি করে, সম্পাদনা করে এক-একটি খণ্ডের কাজ শেষ করতে অনেক সময় লেগেছে। প্রায় দশ বছর লাগল কাজটি শেষ করতে। আত্মজীবনী, জীবনস্মৃতি, চরিতকথা, বংশবৃত্তান্ত ও পারিবারিক বৃত্তান্ত প্রভৃতি সামাজিক ইতিহাসের উপাদান আমাদের দেশে অত্যল্প বলে পুরাতন সাময়িকপত্রের এই উপাদানের মূল্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৮০০-১৯০০) এই গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম) বা উপসংহার-খণ্ড। এখানে উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, প্রধানত সমাজতাত্ত্বিক (Sociological) দৃষ্টিতে। পূর্বের চারখণ্ডের 'সম্পাদকীয়' প্রবন্ধে ও 'প্রাসঙ্গিক তথ্যে' উনিশ শতকের বাংলার বিভিন্ন দিক নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আমার লেখা 'বাংলার নবজাগৃতি' 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (তিনখণ্ড) 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' 'কলকাতা কালচার' প্রভৃতি গ্রন্থেও উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে। কাজেই বর্তমান গ্রন্থে তার পুনরাবৃত্তি করিনি, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে বাঙালী সমাজের পরিবর্তনের মৌল ধারা ও প্রকৃতি বিচারের প্রয়াস পেয়েছি। দুঃসাহসিক প্রয়াস সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসের গতি-ধারা বিশ্লেষণে অন্তত কিছুটা দুঃসাহসিক না হলে হয়ত নতুন চিন্তা ও দিক্‌নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

বিনয় ঘোষ

পৃথক Bibliography অনাবশ্যকবোধে দেওয়া হল না, কারণ প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বিস্তৃত 'নির্দেশিকা' দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থে সন্নিবেশিত চিত্রাবলী সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন পুরাতন চিত্রসংকলন থেকে। যেমন :

B. Solvyns : *A Collection of Two Hundred and Fifty Coloured Etchings, Descriptive of the Manners, Customs and Dresses of the Hindoos* : Calcutta 1799.

Charles Doyley : *The European in India*, London 1813.

Colesworthy Grant : *Rural Life in Bengal*, London 1860.

বসন্তক ১২৭৯-৮০ : বাংলা ব্যঙ্গপত্র।

শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত W. Taylor অঙ্কিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রটি (পৃষ্ঠা ১৬) তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রটি আসল চিত্রের অংশবিশেষ। মূল চিত্রটি কলকাতার লাটভবনে হার্ডিঞ্জের আমলে শিখযুদ্ধে বিজয়োৎসবের চিত্র।

বিনয় ঘোষ

বিষয়সূচী　　পৃষ্ঠা

চিত্রসূচী

১

গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের গতি

পরিবর্তনের স্রোত যত দ্রুত নাগরিক সমাজে প্রবাহিত হয়, গ্রাম্যসমাজে তা হয় না। নাগরিক সমাজ গতিশীল জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে, দ্বন্দ্ব-বিরোধের শব্দ-প্রতিশব্দে মুখর, কিন্তু গ্রাম্যসমাজ গ্রাম্য রাত্রির মতো স্থির শান্ত ও অচঞ্চল। ভারতের ও বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের এই শান্তস্থির অচঞ্চলতা শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্ষুব্ধ ছিল। হিন্দুযুগে ও মুসলমানযুগে রাজনৈতিক তরঙ্গের আঘাতে অথবা রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের ঝড়ঝঞ্ঝায় এই গ্রাম্যসমাজের শান্তিভঙ্গ হয়নি, অথবা তার একটানা সুস্থির প্রবাহে কোন তীরভাঙা নতুন স্রোত সঞ্চারিত হয়নি। গ্রামের কৃষক কারিগর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের লোকেরা বংশপরম্পরায় কৌলিকবৃত্তি পালন করত, কদাচ তার ব্যতিক্রম ঘটত না। খাদ্য উৎপাদন অথবা ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকত না-- যেমন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদের—তাঁরা নানাবিধ সমাজকর্মের জন্য গ্রাম্যসমাজে উৎপন্ন খাদ্য ও দ্রব্যের প্রয়োজনীয় ভাগ পেতেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রাম্য মানুষের জীবন কয়েকটি নির্দিষ্ট ছন্দে ও সুরে বাঁধা থাকত। এই ছন্দ ও সুর হল 'কাস্টম' বা সামাজিক প্রথা ও 'ট্রেডিশন' বা ঐতিহ্য, পুরুষানুক্রমিক ধারা। প্রথা ও ঐতিহ্যের শৃংখলে গ্রাম্যসমাজের অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি এমনভাবে বাঁধা থাকত যে হঠাৎ কোন পরিবর্তনের ঢেউ সজোরে আঘাত করলেও সেই বন্ধন সহজে ছিন্ন হত না। প্রথা ও ঐতিহ্যের তটে দৃঢ়-নোঙরিত জীবনতরী হয়ত গ্রাম্যসমাজের মৃদুতরঙ্গে সামান্য একটু দোলায়িত হত, কিন্তু নোঙর ছিঁড়ে সমাজের বুকে দিশাহারা হত না। জীবন ও সমাজের ভিত্ হল অর্থনীতি। সেই আর্থব্যবস্থায় কোন ভাঙন ও পরিবর্তন ঘটলে সমাজ-জীবনের অন্যান্য স্তরেও আবর্তের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে নতুন স্রোতও সঞ্চারিত হতে থাকে। কিন্তু গ্রাম্যসমাজে এই পরিবর্তন দ্রুত হয় না, অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয় এবং তার মন্থরগতিও কালিক ও দৈশিক বিশেষ-অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

সেকালের গ্রাম্যসমাজের সামাজিক শ্রেণীরূপও ছিল পিরামিডের মতো অচল স্তরবদ্ধ। সবার উপরে দেশের রাজা। রাজা ও প্রজার মধ্যে দূরত্ব এত বেশি ছিল যে কেউ কাউকে চোখের দেখাও দেখতে পেত না। বহুদূর দিগন্তের ওপারে, প্রজাদের কল্পনার এক বিচিত্র আলোকরাজ্যে, অদৃশ্য দেবতার মতো, রাজা তাঁর মণিমুক্তার সিংহাসনে বসে থাকতেন, রক্ষীবেষ্টিত বিশাল গড়বন্দী রাজপ্রাসাদে। প্রজারা থাকত ছোট ছোট নিস্তব্ধ নিঝুম গ্রামে, খড়পাতার কুটিরে। তারা হাল চষত, মাছ ধরত, জাল বুনত, লোহা পিটত, তাঁত বুনত, যাজন-ভজন করত, গ্রাম্যমেলায় উৎসব-পার্বণে আনন্দ করত, রাজার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ও হত না। দেশের রাজার প্রতিনিধিরূপে গ্রাম্যসমাজসমষ্টির শীর্ষস্থানে যিনি বিরাজ করতেন, তিনি স্থানীয় রাজা ও জমিদার। গ্রামের প্রজাদের থেকে তিনিও অনেক দূরে বাস করতেন এবং দেশের রাজার মতো প্রহরীবেষ্টিত গড়বন্দী রাজপ্রাসাদে। এই স্থানীয় রাজা-জমিদার ও প্রজাদের মধ্যেও দূরত্ব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু একেবারে দিগন্তপারের অদৃশ্য দূরত্ব নয়। মধ্যে মধ্যে খাজনার দায়ে, অথবা রাজবাড়ির কোন মহোৎসবে স্থানীয় রাজা-প্রজার মধ্যে 'দৈশিক-অপরত্ব' বা 'নিকটত্ব'-যোগ ঘটত, হয়ত দৃষ্টিরও বিনিময় হত—রাজা-জমিদারের মহামানবসুলভ উদার-উদাস দৃষ্টির সঙ্গে প্রজার ভয়বিহ্বল নিরীহ ভক্তসুলভ দৃষ্টির বিনিময়। কানুনগো পাটোয়ারী, নায়েব গোমস্তা, সেপাই বরকন্দাজ প্রভৃতি জমিদারের রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারী প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতেন। কিন্তু এঁদের ঠিক গ্রাম্যসমাজের মধ্যশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বিত্তের দিক থেকে, অথবা প্রতিপত্তির দিক থেকে গ্রাম্যসমাজে আগেকার কালে মধ্যশ্রেণী একটা ছিল, কিন্তু তাদের শ্রেণীগত প্রভাব সমাজে তেমন ছিল না। সংগতিপন্ন খোদকস্ত কৃষকরা ও কারিগররা বিত্তের দিক থেকে মধ্য-শ্রেণীভুক্ত হলেও, সামাজিক প্রভাব ছিল তাদের চিরন্তন প্রথানুগত, বিত্তগত নয়। আসলে গ্রাম্যসমাজের প্রভাবপ্রতিপত্তি বিত্তনির্ভর ছিল না, কুলবৃত্তিগত ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁর কুলবৃত্তির জন্যই গ্রাম্যসমাজে অখণ্ড প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, বিত্তের জন্য নয়। বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভাব বিত্তবান বণিক কারিগর ও কৃষকের চেয়ে শতগুণ বেশি ছিল গ্রাম্যসমাজে। কাজেই বিত্তের দিক থেকে মধ্যশ্রেণী সেকালের গ্রাম্যসমাজে থাকলেও, যেহেতু সমাজে প্রথানুগ কৌলিক প্রভাব ছাড়া আর্থপ্রভাব কার্যকর ছিল না, সেইজন্য আধুনিক অর্থে

মধ্যবিত্তশ্রেণী সেকালের গ্রাম্যসমাজে ছিল এমন কথা বলা যায় না। গ্রাম্যসমাজের অচল পিরামিডের ভিত্তিভূমি শতকরা নব্বুই জন স্বল্পবিত্ত দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে গঠিত ছিল। বাকি দশজন বা পনেরজনের মধ্যে জমিদারদের আমলাবর্গ ছাড়া রাজকর্মচারীরা ছিলেন, কারুশিল্পীরা ছিলেন, অবস্থাপন্ন কৃষকরা ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন কুলবৃত্তিজীবীরা ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম্যসমাজের এই নীরেট পিরামিডের মূলে আঘাত লেগেছিল—রাজস্ববৃদ্ধির নানারকমের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে। গ্রাম্যসমাজের শ্রেণীগত রূপের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল, পিরামিডটা একটু টলে উঠেছিল, কিন্তু সেটা ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি অথবা গ্রাম্যসমাজের কোন মৌল রূপান্তর হয়নি। অথচ গ্রাম্যসমাজ-জীবনে বিত্তপ্রাধান্যের জন্য পরস্পরবিরোধী অনেক স্রোত সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং তার ফলে ঘূর্ণাবর্তেরও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। সাধারণ গ্রাম্যমানুষের জীবন পুরাতন ও নতুন স্রোতের টানাটানির মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

জমিদারশ্রেণীর রূপান্তর

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশে একশ্রেণীর নতুন জমিদার সৃষ্টি করে তাঁদের ভূসম্পত্তিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব স্বীকার করে নেয়। ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হবার আগে এদেশের বনেদী জমিদাররা বাস্তবিক ভূসম্পত্তির কোন বংশানুক্রমিক স্বত্ব ভোগ করতেন কিনা, এবং যদি না করে থাকেন তাহলে তাঁদের সামাজিক আর্থনীতিক সঠিক ভূমিকা বা রূপ কি ছিল, তাই নিয়ে ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। হেস্টিংস, গ্রাণ্ট, শোর, কোলব্রুক, হ্যারিংটন, ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং আরও অনেকে এই আলোচনায় যোগদান করেন। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন, তখন থেকে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন পর্যন্ত, প্রায় ২৮ বছর ধরে, শুধু আলোচনা নয়, রাজস্ব-সংগ্রহের নানারকম কৌশলের ভিতর দিয়ে এদেশের জমিদারদের সামাজিক রূপ বিদেশী শাসকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বা প্রথানুগ রূপ যতটা নয়, জমিদার সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব ধারণাগত রূপই তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁদের কাছে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। এই ধারণাগত রূপ অবশ্য ইংরেজদের প্রশাসনিক স্বার্থগত রূপ।

জমিদারদের রূপ বা সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে হ্যারিংটন বলেছেন:[১] "এদেশের জমিদাররা এমন একশ্রেণীর জীব যাঁদের এককথায় আমাদের ইংরেজি ভাষায় কোন পরিচয় দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রের পক্ষে রায়ত ও জমির উপস্বত্ব-ভোগীদের কাছ থেকে আঞ্চলিক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করেন জমিদার। জমিদারীর উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেন বটে, কিন্তু নতুন করে দেশের সম্রাটের কাছ থেকে তার জন্য সনদ নিতে হয় এবং সম্রাটকে পেসকশ ও প্রাদেশিক নাজিমকে নজরানা দিতে হয়। জমিদারী তিনি কিনতে পারেন, তবে তার জন্য সম্রাট ও নাজিমের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া বিধেয়। একদিক থেকে তাঁকে তাঁর জমিদারীর নির্দিষ্ট রাজস্বের বাৎসরিক কণ্ট্রাকটার বা ইজারাদার বলা যায়। অন্য কোন কর্মচারী বা ইজারাদার দিয়ে গবর্ণমেণ্ট যদি, বিশেষ কোন কারণে, সেই রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা করেন, তাহলে জমিদারকে সাধারণত তার জন্য উচ্ছেদ করা হয় না, আলাদা ভাতা ও কিছু সম্পত্তি দিয়ে তাঁকে পোষণ করা হয়। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে দেখা যায় যে নিজস্ব এলাকার মধ্যে জমিদার 'আবওয়াব' ও 'কর' আদায়ের অধিকার ভোগ করছেন। এই অধিকারও নিরঙ্কুশ নয়, দেশীয় সরকার যখন খুশি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। নিজের জমিদারীর কাজকর্মের সুবিধার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে জমিদার নানারকমের উপঢৌকনও আদায় করতে পারেন। তাঁর নিজস্ব অঞ্চলে শান্তিশৃংখলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে, অথচ এক্ষেত্রেও তাঁর সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা হয় না।"

হ্যারিংটন সাহেব ১৭৮০ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানির অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাঁর মতামতের গুরুত্ব আছে। জমিদারের স্বরূপ-নির্ণয়ের এই প্রকাশভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে অস্পষ্টতা এর মধ্যে কতখানি ছিল, অথচ একেবারে যে অস্পষ্ট বা ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাও নয়। আসল ব্যাপার হল, দীর্ঘকালের সামাজিক প্রথার বেড়াজালের মধ্যে এদেশের জমিদাররা অধিকাংশই অঙ্কুর থেকে মহীরূহে পরিণত হয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের বাঁধা সড়ক ধরে হননি। কাজেই ইংরেজদের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় তাঁদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সহজ হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তা প্রায় জলের মতো সহজ হয়ে যায়। হ্যারিংটনের বন্দোবস্ত-পরবর্তী জমিদারের সংজ্ঞা থেকে তা বোঝা যায়:[২] "জমিদার তাঁর জমিদারীর মালিক—

উত্তরাধিকার, দান বা কেনাবেচা থেকে তিনি এই মালিকানাস্বত্ব লাভ করতে পারেন—তাঁর দায়িত্ব হল—তাঁর জমিদারীর নির্দিষ্ট স্থায়ী রাজস্ব যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টকে পরিশোধ করা। তাঁর দেয় রাজস্ব চুকিয়ে দিয়ে তিনি আইন-সঙ্গতভাবে উপস্বত্বভোগী ও প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা ও খাজনা যতটা সম্ভব আদায় করতে পারেন এবং তা ভোগও করতে পারেন। পতিত জমি বা বনজঙ্গল হাসিল করা জমি প্রজাদের বিলি করতে পারলে তার খাজনাও তাঁর প্রাপ্য ও ভোগ্য হবে।"

একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন: "Lord Cornwallis modelled his scheme of Zemindary proprietors on the English system of large landed estates."[৩] কর্নওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদি-পরিকল্পক ছিলেন তা নয়, তাঁর আগে ফিলিপ ফ্রান্সিস ও আরও কেউ কেউ এদেশের জমিদারদের সঙ্গে এই ধরনের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। কর্নওয়ালিস তার বিধিসম্মত রূপ দিয়েছিলেন মাত্র। তাছাড়া ইউরোপ বা ইংলণ্ডের কোন-একটা বিশিষ্ট মডেল যে এদেশের জমিদারী বন্দোবস্তের সময় তাঁদের মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ছিল, তাও মনে হয় না। বরং একথা বলা যায়, বাংলাদেশে নবাবী আমলে মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানীর সময় যে রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল, ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাবার পর নানাবিধ পরীক্ষান্তে শেষ পর্যন্ত তাকেই অনুসরণ করেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এ সম্বন্ধে লিখেছেন: "ইংরেজদের ভূমিরাজস্বনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আসল উৎস হলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচ্ছন্ন ও কঠোর রূপ দিয়েছিলেন কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে।"[৪]

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্ব (১৭০০-১৭২৭) মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানী ও সুবাদারীর কাল। ঢাকার বদলে 'মখসুসাবাদ' তাঁর শাসনকেন্দ্র হয় এবং সেইজন্য পরে তার নাম হয়, তাঁরই নামে, 'মুর্শিদ-আবাদ'। কলকাতার আগে, এবং-ঢাকার পরে, এই মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার অন্যতম শহর ও রাজধানী। মুর্শিদ বাংলাদেশে এসে দেখেন যে অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তি বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের জায়গীর দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস হল বাণিজ্যশুল্ক। এই অবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধির দুটি উপায় তিনি স্থির করলেন। প্রথম উপায় হল, বাংলাদেশের জায়গীরগুলিকে খালসা জমিতে পরিণত করা এবং

জায়গীরদারদের বাংলার বদলে উড়িষ্যার বিভিন্ন বনময় অঞ্চলে জায়গীর দেওয়া। দ্বিতীয় উপায় হল, রাজস্ব আদায়ের জন্য 'কনট্র্যাক্ট' বা 'ইজারা' দেওয়া। হিন্দু ও পাঠান রাজত্বকাল থেকে যাঁদের প্রতিষ্ঠা, সেই বাংলাদেশের বনেদী জমিদারদের মুর্শিদের সময় যথেষ্ট অধঃপতন হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠার ফলে মুর্শিদ রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করেন। তাঁর এই ব্যবস্থাকে 'মাল জামিনি' ব্যবস্থা বলা হয়। বনেদী জমিদাররা রইলেন, কিন্তু ইজারাদারদের আওতায়। ক্রমে অবশ্য তাঁরা অনেকে লোপ পেয়ে গেলেন। দু'তিন পুরুষের মধ্যে দেখা গেল, মুর্শিদের এই ইজারাদাররা রাজা-মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হয়ে বেশ বড় বড় জমিদারে গোত্রান্তরিত হয়েছেন। এঁরা কেউ—"though not of princely birth, but merely glorified civil servants, paid by percentage on their collections."—তাহলেও এঁরাই ছিলেন মুর্শিদের আমলের কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানটিতে ইংরেজদের জমিদারী ভোগ করার সময়কার বাংলার প্রতাপশালী জমিদারশ্রেণী। "Indeed, under Murshid Quli and the Permanent Settlement of Cornwallis, our hereditary landed families of historical origin (except a few small fry) were extinguished and their places were caken by new men of the official and capitalist classes."[৫]

মুর্শিদ হিন্দুদের ভিতর থেকে ইজারাদার নিয়োগ করতেন বেশি, তার কারণ সেই সময় মুসলমান ইজারাদাররা রাজস্বের টাকা তছরূপ করে পরে আর তা পরিশোধ করতে পারতেন না। হিন্দু ইজারাদাররা এ ব্যাপারে একটু বেশি রাজভক্তি দেখাতেন, বোধহয় দেওয়ান ও নবাবের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়। সেই অনুগ্রহ হল জমিদারী ও তার সনদ। মুর্শিদের সময় উত্তর-পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ ও আলপ্‌সিংহ, দক্ষিণবাংলার যশোহর-খুলনা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়মিত সরকারী রাজস্ব-আয়ের অঞ্চলে পরিণত হয়। ভাগ্যবান যাঁরা মুর্শিদের পোষকতায় বড় বড় জমিদারে পরিণত হন, তাঁদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন অন্যতম। প্রথমে তিনি মুর্শিদাবাদে রাজস্ববিভাগের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন মাত্র। সেখানে তাঁর বৈষয়িক ব্যাপারে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুর্শিদ তাঁকে রাজস্ববিভাগের অন্যতম উপদেষ্টা

নিয়োগ করেন। এই সময় ধীরে ধীরে, নিজের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে, তিনি অনেক জমিদারী তাঁর ভাই রামজীবনের নামে হস্তান্তরিত করেন। তার মধ্যে, সীতারামের পতনের পর (১৭১৪ সাল), ভূষণা পরগণার জমিদারী অন্যতম। রামজীবনের মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র রামকান্ত জমিদারীর সনদ পান (১৭৩৩ সাল)। প্রসিদ্ধ রানী ভবানী রামকান্তের স্ত্রী। এইভাবে উত্তরবঙ্গের নাটোর রাজবংশ ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান রাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। তিলি জাতির দয়ারাম রায় রঘুনন্দনের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন এবং রাজা সীতারামকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন চক্রান্তের অধিনায়ক। দয়ারাম পুরস্কৃত হন এবং রাজানুগ্রহে দিঘাপতিয়া রাজবংশ (রাজশাহী জেলা) প্রতিষ্ঠা করেন। রানী ভবানীর পর নাটোরের জমিদারী যখন তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীর হাতে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন তাঁর একজন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ কর্মচারী যশোহরে নড়াইল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজশাহী জেলার তাহিরপুর ও পুটিয়ার দু'টি জমিদারবংশ নাটোরের চেয়ে পুরাতন, কিন্তু পরে তাঁদের অবস্থা অনেক পড়ে যায়। এই দুটি বংশই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশ। আরও দু'জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার মুর্শিদকুলির কাছে তাঁদের উন্নত পদমর্যাদার জন্য কৃতজ্ঞ—একজন বগুড়ার শ্রীকৃষ্ণ হালদার, আর একজন মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী। মুর্শিদকুলির পূর্বেকার জমিদারদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মল্লবংশ, বীরভূমের আসাদ্-উল্লার বংশ, পঞ্চকোটের রাজবংশ প্রভৃতি কয়েকটি বড় জমিদারবংশ হস্তান্তরিত হয়নি। কিন্তু রাজশাহীর (পরবর্তী রাজশাহী জেলার প্রায় তিনগুণ বড়) পুরাতন বনেদী জমিদারবংশ—যাঁদের জমিদারী প্রায় ১৩,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং রাজস্ব ছিল ২৭ লক্ষ টাকা—মুর্শিদকুলির আমলে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে নাটোর প্রভৃতি রাজবংশের উৎপত্তি হয়।[৬]

জন শোর তাঁর একটি 'মিনিটে' (১৭৮৮) বলেন—"most of the considerable Zamindars in Bengal may be traced to an origin within the last century and a half."[৭] জেমস্ গ্র্যান্ট বাংলার জমিদারদের আভিজাত্য আরও বেশি খর্ব করে বলেছেন—"the universally new creation of the necessary class and officers denominated Zamindars in the course of Jafer Khan's (Murshid Quli

Khan's) viceroyalty."[৮] জন শোর ও জেমস্ গ্র্যান্টের কথা অনেকটা সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। মুর্শিদকুলি যে অনেক পুরাতন বনেদী জমিদারবংশ ভেঙ্গে নতুন জমিদারবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইজারাদারদের জমিদারে রূপায়িত করেছিলেন, সেকথা আমরা আগে বলেছি। বাস্তবিক মুর্শিদকুলি বাংলাদেশে যে নতুন জমিদারশ্রেণী পত্তন করেন, ইংরেজ শাসকরা পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে তাঁদের পদমর্যাদা ও বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ভিত্তি পোক্ত করে দেন।[৯] শুধু তাই নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ আমলের আরও অনেক বিত্তশালী অর্বাচীনের সামনে অভিজাত জমিদারশ্রেণীর মর্যাদা লাভের পথ প্রশস্ত করে দেয়। কিন্তু মুর্শিদকুলির আগে জমিদারবংশ যে বাংলাদেশে ছিল না তা নয়। দিনাজপুর, বর্ধমান, নদীয়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি জমিদারবংশ মুর্শিদ কুলির আগে প্রতিষ্ঠিত। মুর্শিদের দেওয়ানীকালে এই জমিদাররা সকলে মর্যাদাচ্যুত হননি, জমিদারীও তাঁদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ধমান ও নদীয়ার রাজাদের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, এঁদের দ্রুত পতন হতে থাকে এবং নানারকমের উপস্বত্বের সংঘাতে জমিদারী শতখণ্ড হয়ে যায়। কত যে ফাটল ধরে এক-একটা জমিদারীর মধ্যে তার ঠিক নেই। সেকথা আমরা পরে বলব।

ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৯ অক্টোবর ১৭৭৪ ভারতবর্ষে আসেন। ২২ জানুয়ারি ১৭৭৬ তিনি একটি মিনিটে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব পেশ করেন। ১৭৮৯-৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করা হয়। এই বন্দোবস্তের প্রবর্তক যাঁরা তাঁদের ধারণা ছিল, জমিদারদের দেয় রাজস্ব স্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিলে নিজেদের জমিদারী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন। জমিদারী যদি তাঁদের কাছে লাভবান হয়, তাহলে স্বার্থের দিক থেকেও তাঁরা নিজেদের জমিদারীর উন্নতিসাধনে তৎপর হবেন। প্রচলিত পরগণা-হারে কৃষকদের কাছ থেকে তাঁরা খাজনা আদায় করবেন, কোনরকম লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের খাজনা বৃদ্ধি করবেন না। সুতরাং কর্নওয়ালিস ও তাঁর সমর্থকরা জমিদারদের ভূসম্পত্তিতে স্থায়ী স্বত্ব দান করে ভাবলেন যে তাতে চাষবাসের উন্নতি হবে, গ্রাম্যসমাজের উন্নতি হবে এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু তাঁদের ধারণার ঠিক বিপরীত ফল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বাংলাদেশে ফলল।

বাম থেকে দক্ষিণে দাঁড়ানো কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরিচয় :

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব ব্যানার্জি, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রুস্তমজী কাওয়াজী, আশুতোষ দেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, মাণিকজী রুস্তমজী, আগা কারবালাই মহম্মদ, হাফিজ মহম্মদ কবীর, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। (সামনের ছেলে-মেয়েরা)—মাণিকজীর কন্যা, শিবচন্দ্র দাসের পুত্র, রামরতন বসুর পুত্র, আগা কারবালাইয়ের পুত্র, রামনারায়ণ মতিলালের পুত্র।

—ডব্‌লু. টেলার অঙ্কিত-১৮৪৬

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হবার আঠার-উনিশ বছর পরে, ১৮১২ সালের 'সিলেক্ট কমিটি'—বিখ্যাত Fifth Report-এর লেখকরা—সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পেঁছিলেন যে বাংলাদেশের জমিদাররা জমির বা সম্পত্তির মালিক নন। 'জমিদার' হল একটা 'Office', অর্থাৎ রাজকীয় দায়িত্ব-নির্দিষ্ট একটি 'পদ'মাত্র, তার সঙ্গে জমিদারীর মালিকানাস্বত্বের কোন সম্বন্ধ নেই। পঞ্চম রিপোর্টে বলা হয় যে এই বিশেষ রাজপদের দায়িত্ব হিসেবে জমিদারদের কর্তব্য হল—"to superintendant that portion of the country committed to his charge, to do justice to the ryots or peasants, to furnish them with the necessary advances for cultivation" এবং কলেক্টর হিসেবে "to collect the rent of Government." এই রাজকর্তব্য পালনের জন্য জমিদাররা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পেতেন, যেমন বিনা খাজনায় কিছু সম্পত্তি তাঁরা ভোগ করতেন এবং তার সঙ্গে অন্যান্য কিছু পাওনাও তাঁদের থাকত, যা তাঁদের সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা দশভাগের বেশি নয়। জমিদারের আয় হিসেবে এটা যে খুব কম তা নয়। এই রাজপদের উৎপত্তি হিন্দু রাজাদের সময় থেকে সন্ধান করা যায়। গোড়াতে এঁরা 'চৌধুরী' বলে পরিচিত ছিলেন, পরে মুসলমান রাজত্বকালে 'ক্রোড়ী' নামে পরিচিত হন। এক ক্রোড় বা কোটি 'দাম' (Dam)—প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা—রাজস্বের এক-একটি অঞ্চলে এঁদের কলেক্টর নিযুক্ত করা হত বলে বোধহয় এঁদের 'ক্রোড়ী' বলত। মুসলমান আমলের শেষ দিকে 'জমিদার' কথাটি বেশি প্রচলিত হয়—"which, literally signifying a possessor of land, gave a colour to that misconstruction of their tenure which assigned to them an hereditary right to the soil." অতএব সিলেক্ট কমিটি তাঁদের Fifth Report-এ বলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারদের এমন অধিকার দিয়েছেন বাংলাদেশে যা তাঁরা কোনকালে ভোগ করেননি ("rights hitherto unknown and unenjoyed in Bengal")। এই কথা বলে তাঁরা মন্তব্য করেন যে বাংলাদেশে স্থায়ী জমিদারী-স্বত্ব এমন লোকদের দেওয়া হয়েছে যাঁদের কোনরকম দায়িত্ব পালন করবার যোগ্যতা নেই। এই জমিদারদের Fifth Reportএ যে-সমস্ত বিশেষণে ভূষিত করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি হল এই :

"idiots or of weak understanding; poor creatures sunk in sloth and debauchery; extravagant, necessitous, and therefore exacting; ignorant and rapacious; harbourers of dacoits; obstructive zemindars, more plague than profit."

ইডিয়ট নির্বোধ উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী অমিতব্যয়ী স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর স্বার্থপর ডাকাতপোষক—এগুলি হল জমিদারদের বিশেষণ। এই জমিদারশ্রেণীর হাতে ইংরেজ শাসকরা বাংলার গ্রাম্যসমাজের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে যখন এই গুরুদায়িত্ব জমিদারদের দেওয়া হল, তখন বাংলাদেশের অবস্থা কি? এই বন্দোবস্তের আগেই ইংরেজদের রাজস্ব-সংগ্রহের নানারকম কৌশল প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশের বনেদী জমিদার ও কৃষক উভয়শ্রেণীই চরম দুরবস্থায় পৌঁছেছিল। তার উপর ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার গ্রাম প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল বলা চলে। এই ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের চিত্র জন শোর তাঁর একটি কবিতায় জীবন্তরূপে এঁকেছেন: [১০]

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Still hear the mother's shrieks and infant's moans.
Cries of despair and agonising moans.
In wild confusion dead and dying lie;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, amidst the glare of day
They riot unmolested on their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface."

দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরে দেখা যায় যে বাংলাদেশের কৃষকদের প্রায় তিনভাগের একভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং প্রাচীন জমিদারদের মধ্যে অনেকে দারুণ দুরবস্থায় পড়েছেন। হাণ্টার লিখেছেন যে ১৭৭০ সাল থেকে বাংলাদেশের পুরাতন অভিজাতশ্রেণীর ধ্বংসের কারণ সন্ধান করা যায়।[১১] বাংলার গ্রাম্য

সমাজের এই চরম দুর্দিনে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় এবং তাঁদের এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয় যাতে তাঁরা অন্তত নিজেদের সুদিনের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তাও অনেকে করতে পারেননি। চিরদিনের বিলাসিতার অভ্যাস ও স্বভাবশৈথিল্যের জন্য জমিদারদের মধ্যে অনেকেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণের মধ্যে তাঁদের দেয় রাজস্ব সরকারকে দিতে পারেননি। নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা রাজস্ব বাকি ফেলেছেন এবং প্রজাদের দুরবস্থা ও খাজনা অনাদায় তার প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আসল কারণ হল, এদেশের জমিদাররা রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে সূর্যাস্ত আইনের মতো কোন কঠোর আইনকানুনের বন্ধন মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তার ফলে অনেকেরই জমিদারী 'লাটে' ওঠে এবং নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। নিলামে এইসব জমিদারী যাঁরা কেনেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হলেন কলকাতার মতো শহরের একশ্রেণীর একপুরুষের ধনিক—যাঁরা ইংরেজ আমলে কলকাতা শহরে দেওয়ানী-বেনিয়ানী-মুচ্ছুদ্দিগিরি করে, হাটবাজারের ইজারা নিয়ে, প্রচুর ধন উপার্জন করেছিলেন। কর্নওয়ালিস কোম্পানির ডিরেক্টরদের একটি চিঠিতে (৬ মার্চ ১৭৯৩) পরিষ্কার লিখেছিলেন—"The large capitals possessed by many of the natives, which they will have no means of employing···will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured."[১২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কর্নওয়ালিসের এই উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। এদেশের যে ধনিকদের কথা কর্নওয়ালিস এই চিঠিতে ইঙ্গিত করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই কলকাতা শহরের দেওয়ান-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিও*—যাঁর স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ ছিল—শেষ পর্যন্ত তাঁর সঞ্চিত ধন বাণিজ্য থেকে জমিদারী ও ভূসম্পত্তিতে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১৩] অন্যান্য বেনিয়ান বা মুচ্ছুদ্দিদের কথা বলাই বাহুল্য। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, লাহা ও মল্লিকরা, পাইকপাড়ার রাজা সিংহরা, হাটখোলার ও রামবাগানের দত্তরা, সকলেই প্রায় সঞ্চিত ধনদৌলতে শহরের ও গ্রামের জমিদার হন। অর্থাৎ তাঁরা শহরেও সম্পত্তি কেনেন, গ্রামেও সম্পত্তি কেনেন। এককথায় বলা যায়, তাঁরা নাগরিক ও গ্রাম্য ভূসম্পত্তির মালিক

* তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হয়ে অনায়াসলব্ধ উপার্জন ও মুনাফা (unearned income ও profit) লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার দিকে সবসময় তাঁদের নজর বেশি থাকত বলে, বেশিরভাগ সময় শহরেই তাঁরা থাকতেন। শুধু বিলাসিতার জন্য নয়, নাগরিক সমাজে তাঁদের আভিজাত্য প্রদর্শনের পথ অনেক বেশি উন্মুক্ত ও প্রশস্ত বলেও তাঁরা শহুরে হয়ে গিয়েছিলেন।

হাণ্টার এইসময়কার হাতেলেখা নথিপত্র সন্ধান করে চারটি খণ্ডে সংকলন করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন: "In these four volumes of *Bengal Records,* I cite many hundred letters written at that disastrous period, and showing how the disintegration of estates went on in every district of Bengal."[১৪] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তের-চোদ্দ বছরের মধ্যেই অনেক জমিদারী খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যেতে থাকে। ভাঙনের সুযোগে যাঁরা এইসব জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হতে থাকেন, তাঁরা হলেন শহরের ধনিকশ্রেণী। কার্ল মার্ক্স তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের খসড়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল প্রসঙ্গে লিখেছেন, "greater part of the province's landholdings fell rapidly into the hands of a few city-capitalists who had spare capital and readily invested it in land."[১৫] বাস্তবিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারী কেনাবেচার ইতিবৃত্ত যদি সরকারী দলিল-দস্তাবেজ থেকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যেত, তাহলে কার্ল মার্ক্স-এর কথা যে কতখানি সত্য তা প্রমাণ করা সম্ভব হত। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো কয়েকজনের জীবনবৃত্তান্ত থেকে যেটুকু জানা যায় তাতে এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কিছু থাকে না।

প্রত্যাশা ও বাস্তব ফলাফলের মধ্যে যে কতখানি পার্থক্য ঘটেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপ্রবর্তনের পর, তা এই সমস্ত উক্তি ও আলোচনা থেকে বোঝা যায়। জাস্টিস জর্জ ক্যাম্বেল বলেন (১ জুন ১৮৬৪): "বড় বড় জমিদাররা, কদাচিৎ দুইএকজন ছাড়া, নিজেদের জমিদারীর উন্নতির জন্য একটি কপর্দকও খরচ করেন না। তিনি নিজে চাষ তো করেনই না, চাষের উন্নতির জন্য কোন নতুন উন্নত কলাকৌশলও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন না। ইংরেজ জমিদারদের মতো 'ফার্ম' বা 'ফার্ম-হাউস' কিছুই তৈরি করেন না। চাষের জমি ঘিরে দেওয়া, গাছ-গাছড়া ও বীজের ব্যবস্থা করা, নালা-নর্দমা বা সেচের ব্যবস্থা করা—এসব

কিছুই তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন না। তিনি শুধু চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য যা-কিছু তাঁর নিজের পাওনা তা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করেন, যতটা পারেন বেশি করে আদায় করার চেষ্টা করেন।” জাস্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলেন (১৯জুন ১৮৬৫): “বাংলাদেশের জমিদাররা মূলধন নিয়োগ করে তাঁদের জমিদারীর উন্নতি করেছেন, এরকম বড়-একটা দেখা যায় না। জমিদাররা একাজ করবেন, একথা আইনে লেখা আছে বটে, কিন্তু জমিদাররা তা কাজে বিশেষ পরিণত করেন নি।” জাস্টিস সিটন-কার বলেন (১৯জুন ১৮৬৫): “কৃষিকাজের উন্নতির জন্য জমিদাররা কোনরকম দায়িত্ব পালন করেননি। চাষীদের মূলধন বা বীজ দিয়ে সাহায্য করা, সেচের ব্যবস্থা করা, পথঘাটের উন্নতি করা, এসব কর্তব্য তাঁরা পালন করেননি। কিছু পুকুর, এখানে-ওখানে কিছু পথঘাট, হাট ও গঞ্জ তাঁরা করেছেন বটে, কিন্তু যা করা উচিত ছিল তার তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। বরং অধিকাংশ জায়গায় বনজঙ্গল হাসিল করে চাষীরা নিজেরাই আবাদের জমি বৃদ্ধি করেছে এবং জোতদার ও অবস্থাপন্ন চাষীদের জন্যই খেজুর আখ তামাক প্রভৃতির চাষ উন্নত হয়েছে। জমিদারদের জন্য এসব উন্নতি কিছু হয়নি, তাঁরা শুধু উন্নতির ফলটুকু ভোগ করেছেন।” রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও আরও ২০ জন মিশনারী বলেন (এপ্রিল ১৮৭৫): “জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কতরকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।”[১৬]

এরকম আরও অনেকের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়, বক্তব্য সকলেরই এক—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষীর সর্বনাশ হয়েছে, চাষের অবনতি হয়েছে, গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন জমিদার নিজেদের অযোগ্যতা ও স্বভাবশৈথিল্যের জন্য উচ্ছন্নে গেলেও, অধিকাংশ জমিদার যাঁরা শেষ পর্যন্ত জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত বন্দোবস্তের ফলে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন। উনিশ শতকের সাময়িকপত্রের আলোচনা থেকেও বাংলাদেশের এই জমিদারদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। কয়েকটি

আলোচনার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জমিদারদের রাজস্বসংগ্রহ প্রসঙ্গে লিখেছেন (শ্রাবণ ১৩৭২ শক): [১৭]

"রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি পরিপাটি নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন! প্রজারা নিঃস্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূস্বামির সর্ব্বস্বান্ত হউক, তথাপি তিনি ত্রি মাসের পর কপর্দ্দক মাত্র রাজস্বও অনাদায়ি রাখিতে পারেন না। অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদায় শস্য শুষ্ক হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাউক, রাজস্বদানে অক্ষম হইয়া প্রজারা পলায়ন করুক, তথাপি নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্তের প্রাক্‌কালে তাঁহাকে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতে হইবে।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছেন যে ভিন্ন ভিন্ন ভূস্বামী কতরকমের ছল-বল-কৌশল প্রয়োগ করে যে প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন তা গণনা করা যায় না। তাঁদের অধীন সমস্ত প্রজার যা-কিছু সম্পত্তি বা ভোগ্যবস্তু সবই তাঁরা নিজেদের মনে করেন। প্রজাদের ফলমূল গাছ পর্যন্ত ভূস্বামীর সর্বগ্রাসী লোভের কাছে রক্ষা পায় না। কোন দরিদ্র প্রজা ফলের গাছ রোপণ করে, অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করে, বহুদিন পরে হয়ত ফল ফলাল, কিন্তু তাতেও ভূস্বামীর প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ল। গাছের ফল তিনি আগে ভোগ করবেন, তারপর প্রজা করবে। নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য যদি কোন প্রজাকে তিনি আম জাম বা কাঠাল গাছ ছেদন করতে বলেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই গাছ ছেদন করে প্রদান করতে হয়। ছেদন করার পরেও সেই গাছের জন্য প্রজাকে কর দিতে হয় জমিদারকে। জমিদার ফলবান বড় গাছটির বদলে অন্য একটি ছোট গাছ রোপণ করার অনুমতি দিয়ে প্রজার কাছ থেকে কর গ্রহণ করতে থাকেন। প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাদের দেহ ও দৈহিক পরিশ্রমও জমিদাররা নিজেদের কেনাবস্তু বলে মনে করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষ্ণনগরের জমিদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জমিদারের হুকুম যে বিনামূল্যে ও বিনাবেতনে গোপরা তাঁকে দুধ দেবে, জেলেরা মাছ দেবে, নাপিতরা ক্ষৌরকর্ম করবে, যানবাহকরা বহন করবে, চর্মকাররা পাদুকাদি দেবে, "ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের সেবা করিবেক।" জমিদার যখন নিজের গ্রামে থাকেন, "তখন তাঁহাকেও নিজধনে বাসার ব্যয় সম্পাদন করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে

চতুর্দ্দিক হইতে নানাপ্রকার সামগ্রীপত্র আসিতে থাকে।" "ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না।" তাঁর জমিদারী এলাকায় যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তাঁদেরও জমিদারের ইচ্ছাধীন মূল্যে পণ্যদ্রব্য দিতে হবে, তার নাম "সরকারী মূল্য।" যে জিনিসের দাম বাজারে দু'টাকা, জমিদারের কাছে হয়ত তা চার আনায় বেচতে হবে। জমিদারের শোষণের লোভ যেন সীমাহীন।

ভূস্বামীরা তাঁদের দুর্নিবার ধনতৃষ্ণা চরিতার্থ করার আরও একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন। প্রজায় প্রজায় বিবাদ-বিসম্বাদ হলে ভূস্বামীর কাছে বিচারের জন্য যেতে হয়। ভূস্বামী তখন কি করেন? "তিনি বিচারক নাম গ্রহণ করিয়া সর্বতোভাবে অবিচার করেন—ধর্মাবতার নাম ধারণ করিয়া সম্পূর্ণরূপ অধর্মাচরণেই প্রবৃত্ত থাকেন।··উৎকোচের তারতম্যানুসারে তাঁহার বিচার-ক্রিয়ার তারতম্য হয়···।" কোন কোন ভূস্বামী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর, দেবতার দেবোত্তর সম্পত্তি পর্যন্ত গ্রাস করতে কুণ্ঠিত হন না। ডাকাত লেঠেল ও গুণ্ডা ভূস্বামীরা পোষণ করেন প্রজাদের পীড়ন করার জন্য। অবাধ্য ও বিদ্রোহী প্রজাদের ধান লুঠ করা, গো-হরণ করা, প্রজাদের জলমগ্ন করা ও প্রহার করা তাঁদের প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। গ্রামের জমিদাররা প্রজাদের উপর শুধু শারীরিক অত্যাচার যে কতরকমের করেন, কলকাতার মতো শহরের অধিবাসীরা তা ঠিক জানেন না বলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তার একটি ১৮-দফা তালিকা প্রকাশ করেন:

১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত।
২। চর্মপাদুকা প্রহার।
৩। বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন।
৪। খাপরা দিয়ে কর্ণ ও নাসিকা মর্দন।
৫। ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ।
৬। পিঠে দুইহাত মোড়া দিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোচড় দেওয়া।
৭। গায়ে বিছুটি দেওয়া।
৮। হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা।
৯। কান ধরে দৌড় করানো।
১০। কাঁটা দিয়ে হাত দলন করা। দু'খানা কাঠের বাখারির একদিক বেঁধে তার মধ্যে হাত রেখে মর্দন করা। এই যন্ত্রটির নাম 'কাটা'।

১১। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদে ইটের উপর পা ফাঁক করে দুহাতে ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা।

১২। প্রবল শীতের সময় জলে চোবানো।

১৩। গোনীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা।

১৪। গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান দেওয়া।

১৫। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা।

১৬। চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা।

১৭। কারারুদ্ধ করে উপবাসী রাখা।

১৮। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে লঙ্কা মরীচের ধোঁয়া দেওয়া।

প্রজাপীড়নের এই ১৮-দফা ক্যাটালগও যথেষ্ট নয়, জমিদারদের যথেচ্ছাচারিতার সম্পূর্ণ চিত্র এর মধ্যেও ফুটে ওঠে না। উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় জমিদারদের এই অত্যাচারের আরও অনেক মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে।[১৮] তার একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই এখানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের গোত্রান্তরিত করেছিল। পূর্বের ফিউডাল বদান্যতা এই হঠাৎ-জমিদারদের ছিল না। তাঁরা স্বার্থপর অর্থপিশাচ হৃদয়হীন ঠিকাদারে পরিণত হয়েছিলেন—ইংরেজদের রাজস্বের ঠিকাদার। তার উপর বাংলাদেশে, মার্ক্স-এর ভাষায়, শহরের পুঁজিপতিরাই নিলামে জমিদারী কিনে গ্রামাঞ্চলের জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন। গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে তাঁদের কোন অন্তরের যোগ, নাড়ীর যোগ ছিল না। ইংরেজ আমলে বাংলার জমিদারশ্রেণীর এই গোত্রান্তর একটা বড় রকমের সামাজিক পরিবর্তন, যা গ্রাম্যসমাজকে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়েছিল।

গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও বিস্তার

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার জমিদাররা যখন সরকারী রাজস্বের কনট্রাক্টারে পরিণত হলেন, তখন দেখতে দেখতে তাঁদের অধীনে নানাশ্রেণীর সাব-কনট্রাকটার গজিয়ে উঠতে লাগলেন। উপরের জমিদার ও নিচের কৃষকদের মধ্যে একটা বিশাল মধ্যস্বত্বভোগীর দল বা উপশ্রেণীর সৃষ্টি হল। বাংলার গ্রাম্যসমাজের মধ্যস্তর বা গ্রাম্য মধ্যবিত্তশ্রেণী এঁদের বলা যায়, যদিও নাগরিক জীবনের আকর্ষণে গ্রামের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক (আর্থিক শোষণের সম্পর্ক ছাড়া) অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। ব্রিটিশ আমলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের

আর-একটি বড় পরিবর্তন হল এই বিভিন্ন স্তরভুক্ত মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ। একজন ইংরেজ লেখক লিখেছেন : [১৯]

"The creation of middlemen, on permanent tenures, down to the third and fourth degrees, and lower, was permitted without stint···the permission of numerous grades of middlemen between zemindar and ryot, on old estates, all of whom, as well as zeminder, derived their income out of the ryot's payments, only set in train so many agencies for repeated illegal enhancements of rent, beyond the amount warranted by established custom. These middlemen, or farmers of rents have proved a scourge of the country".

সেকালের সাময়িকপত্রে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। 'সংবাদপ্রভাকর' লিখেছেন (ভাদ্র ১২৫৯) :[২০]

"কোন বৎসর শস্য হউক বা না হউক তাঁহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না, এতদ্ভিন্ন ইজারদার পত্তনিয়াদার ও দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি বহুলোকে কৃষকের পরিশ্রমার্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণপূর্বক আপনাপন উপার্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে···"।

"পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও ইজারদার ও বাড়ীদারদিগের অত্যাচারের ব্যাপার আমরা পুনঃ ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঐ সকল দৌরাত্ম্য কোনকালে নিবারণ হয় এমত বোধ করি না, দীনদুঃখিদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণা রসে আর্দ্রা হইতেছে, জমীদার, ইজারদার, যোৎদার প্রভৃতি দ্বার হইতে মুক্ত হইলেও বাড়ীদারের বাড়ীর প্রহার হইতে রক্ষা পাওয়া কথনই সম্ভবে না·" (আষাঢ় ১২৫৮)।

"গবর্নমেণ্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারদিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্বাহ করণের সম্যক্‌নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টিবর্ধন করিতে হয়।" (অগ্রহায়ণ ১২৯৯)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতেও একাধিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।[২১] যেমন—

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি এ পর্যন্ত ঐ প্রদেশে ভূমিজরিপ বা প্রজার কর বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু জমিদারকে ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে যে মালিকানী শরঞ্জামী দেওয়া হয়, জমিদার তদপেক্ষা প্রচুর লভ্য ভোগ করিতেছেন। তাহার উক্ত অবধারিত সদর জমা ও মালিকানী শরঞ্জামির অন্যথা হয় নাই, ভূমির বা প্রজার উন্নতির নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেও হয় নাই, তবে এক্ষণে প্রজার কর কি জন্য বৃদ্ধি হইবে?...যখন জমিদারের প্রচুর লভ্য থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাহার অধীন পত্তনিদারের স্বীয় লভ্যের নিমিত্ত প্রজার উপরে কর বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না" (৯ মাঘ ১২৭৮)।

"১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তনি দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা প্রজাগণের অধিকতর অনিষ্টের কারণ। সুচতুর জমিদারগণ স্বীয় অধিকারস্থ জমিদারী জরীপ ও নিরিখ ধার্য্য করিয়া পত্তনি দিবার ঘোষণা করিয়া দেন, নীলামের ডাকের ন্যায় উহার ডাক বাড়িতে থাকে, যে ব্যক্তি অধিক পণ জমা দিতে সম্মত হয়, তাহার সহিত পত্তনির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পত্তনিদার মহলে উপস্থিত হইয়া খাজনা আদায় করিবার পুর্বে এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে যে প্রজা টাকায় সিকি বৃদ্ধি স্বীকার না করিবে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবে না। এই নিমিত্তই প্রজারা ভূমিতে জমিদারের জরীপের রজ্জুপাতকে হৃদয়শল্য জ্ঞান করে··· ভূমি মাপিবার রসি স্থির না থাকাতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় পত্তনিদারের লোকেরা ১৮ কাঠায় বিঘা হয়, এমত রসি লইয়া মাপ আরম্ভ করে, এবং ১০ বিঘার বন্দকে জরীপ মুখে ১২ বিঘা করিয়া তুলে, যখন প্রজারা মাঞ্চেষ্টারের মজুরদিগের ন্যায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পত্তনিদারের দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারদার, ছে-ইজারদারের হস্তে নিত্য নূতন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে কি প্রজাদিগের সুখ-সৌভাগ্যের প্রত্যাশা আছে।"

(১৪ ভাদ্র ১২৭০)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও বাংলার এই মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রজাশোষণের বিচিত্র কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[২২] ইজারাদার সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

"তিনি সেই লোভাগ্নির উপভোগ আহরণার্থে ভূ-স্বামী-সংস্থাপিত নানাপ্রকার নিপীড়ন প্রণালীর কোন ভাগই পরিত্যাগ করেন না, বরঞ্চ সর্ব-প্রযত্নে তাহার বৃদ্ধিরই চেষ্টা পায়েন। বিশেষতঃ প্রজারা ভূ-স্বামীর চিরন্তন ধন, তাহারা এককালে উচ্ছিন্ন না যায় ও অধিকার পরিত্যাগ না করে, তাহার এমত বাসনা অবশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু ইজারার নিরূপিত সময় অতীত হইলেই ইজারাদারের স্বত্ব লোপ হয়, সুতরাং

প্রজাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ সঞ্চারের সম্ভাবনা কি? নিঃশেষে ধন শোষণ করিতে পারিলেই তাঁহার মঙ্গল। বিশেষতঃ ভূস্বামী তাঁহার নিকট যাদৃশ নির্বন্ধ করিয়া কর গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার লাভভাবের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তিনি স্বীয়লাভ প্রত্যাশায় উপায়ান্তর চেষ্টা করেন, বিবিধপ্রকার কুটিল কৌশল কল্পনা করিতে থাকেন। প্রজার সর্বনাশই সেই সকল বিষম যন্ত্রণার একমাত্র তাৎপর্য্য। তাহারা ভূস্বামীকে যত রাজস্ব প্রদান করিত, ইজারাদারকে তদপেক্ষায় চতুর্থাংশ অধিক দিতে হইবেক।"

"কল্য যে ভূম্যধিকারির লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব ছিল, অদ্য তাহাতে আর পঞ্চবিংশতি সহস্র যুক্ত হইল। অতএব ইজারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৃদকম্প না হইবে কেন?"

"এক্ষণে যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে. তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহারদের দারুণ দুর্দশা বাক্যপথের অতীত।"

(বৈশাখ ১৭৭২ শক)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেও মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তখন এই সামাজিক উপশ্রেণী বা মধ্যশ্রেণী এরকম ব্যাপক ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে, নতুন জমিদারশ্রেণীর অধীনে যে নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হতে থাকে, তাদের চরিত্রই আলাদা। ১৮১৯ সালের অষ্টম রেগুলেশন অনুযায়ী (Regulation VIII, 1819) যখন মধ্যস্বত্বগুলিকেও জমিদারীস্বত্বের মতো পাকাপোক্ত বিধিসম্মত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন থেকে মধ্যস্বত্বের দ্রুত সম্প্রসারণ হতে থাকে।[২৩] জর্জ ক্যাম্বেলের আমলে বাংলা সরকার তাঁদের প্রশাসনিক রিপোর্টে (১৮৭২-৭৩) মধ্যস্বত্বের বিস্তার সম্বন্ধে লেখেন ঃ

> "The practice of granting such undertenures has steadily continued until, at the present day, with the putnee and subordinate tenures in Bengal proper..., but a small proportion of the whole permanently-settled area remains in the direct possession of the zemindars."

অর্থাৎ ১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যেই—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ৮০ বছরের মধ্যে—বাংলাদেশের প্রত্যেক জমিদারীতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ইজারার স্তরবিন্যাসের ফলে জমিদারী এতদূর খণ্ডিত

হয়েছিল যে প্রকৃত জমিদারের অধীনে খুব সামান্য জমিদারী ছিল। এই রিপোর্টেই দেখা যায় যে বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বের বিস্তারের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে জমিদারীর সংখ্যা বেড়ে দেড় লক্ষের বেশি হয়। তার মধ্যে ৫৩৩-টি হল বড় জমিদারী—২০ হাজার একরের উপরে, ১৫৭৪৭-টি হল মাঝারি জমিদারী—২০ হাজার থেকে ৫০০ একরের মধ্যে, এবং ১৩৭৯২০৩-টি হল ছোট জমিদারী—৫০০ একর ও তার কম।[২] ১৮৭১-৭২ সালে বেভারলে'র সেন্সাস রিপোর্টে থেকে কৃষক ও জমিদারের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের উপস্বত্বভোগী ও কর্মচারীদের একটা পরিচয় পাওয়া যায়:[২৫]

কৃষক	: ৬৩৯১০৭৪	জোতদার	: ১৯৫৬৪
জমিদার	: ৪২৬১৮	গাঁতিদার	: ৬৮২৪
ইত্মামদার	: ৫৮৬	হাওলাদার	: [illegible]৬৪৩
ঠিকাদার	: ৩০৩	গোমস্তা	: ১৮,৪০২
ইজারাদার	: ৩:৫৪	তহশীলদার	: ১০,৫৪৬
লাখেরাজদার	: ২৩০৭০	পাটোয়ারী	: ১৩৭৬
জায়গীরদার	: ৩৬৫	পাইক	: ১৪,৭৯৭
ঘাটোয়াল	: ৬৬৮	জমিদারের ভৃত্য	: ১১,০৫০
আয়মাদার	: ২০০৪	দফাদার	: ২০২
মকরারীদার	: ৯৯৩৩	দেওয়ান	: ১০৪
তালুকদার	: ৯৬০৫০	মণ্ডল	: ১৬২০
পত্তনিদার	: ৩৩৭২	নায়েব	: ৫৮১
খোদকস্তপ্রজা	: ৭৫৫২	এস্টেট-ম্যানেজার	: ২১
মহলদার	: ১১২৮		

একমাত্র কৃষকদের বাদ দিলে বাকি সকলকেই প্রায়—জমিদারের বেতনভুক ভৃত্য ও পাইক-বরকন্দাজদেরও—গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর আকৃতি ও প্রকৃতি সেন্সাসের সংখ্যা থেকে অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রকৃতি সম্বন্ধে সুন্দর বিস্তারিত একটি বিবরণ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়', বেভারলে'র সেন্সাসের আরও প্রায় কুড়ি বছর আগে ১৮৫০-৫১ সালে, প্রকাশিত হয়।[২৬] ভূস্বামীদের নিযুক্ত "ব্যাঘ্রসম নিষ্ঠুর-স্বভাব" কর্মচারীদের কথাপ্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী প্রথমে গোমস্তা ও নায়েবদের কথা বলেছেন। প্রজাদের "কর্ণকুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায়

ভয়ানক বোধ হয়।" নায়েব ও গোমস্তা "নিতান্ত নির্মায়িক" (অমায়িকের বিপরীত) হয়ে প্রজাদের উপর নানারকম উপদ্রব করেন। "ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্বেই আপনাপন ভাগ গ্রহণ করে, এবং সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্মছল পাইলেই প্রজার ধন হরণ করিতে থাকে। বনচর ব্যাঘ্র বরাহ তাহারদের অপেক্ষায় কত অনিষ্ট করিতে পারে?" শুধু নায়েব গোমস্তা নন, জমিদারের সংসার-সংক্রান্ত সামান্য কাজেও যাঁরা নিযুক্ত থাকেন, গ্রামাঞ্চলে তাঁদের প্রতাপও কম নয়। "ভূ-স্বামীর সংসার-সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্র কর্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার প্রভাবের আর পরিসীমা থাকে না, বাজার-সরকারও রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে।" এরপর আছেন গ্রামের কুখ্যাত দারোগাবাবু—"দারোগা ও তৎসংক্রান্ত কর্মচারিদের প্রসিদ্ধ দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে।" "দারোগার দীর্ঘোদর পূরণার্থে" প্রজাদের যে কত কি উৎসর্গ করতে হয় তা বলে শেষ করা যায় না। দারোগাবাবুর পরে আছেন গ্রামের মহাজন। দেনা ও দৈন্যের দায়ে মুমূর্ষ কৃষকদের যাঁরা ঋণ দিয়ে চিকিৎসা করেন তাঁরাই হলেন 'মহাজন'। "এই সমস্ত মহাজন সংজ্ঞক বিষদ্ বৈদ্যের হস্তে পতিত হইলে নিষ্কৃতির পথ এককালে রুদ্ধ হয়। মহাজন মূলধনের অর্ধ বা তদনুরূপ সমধিক বৃদ্ধিলাভ ব্যতীত ঋণদান স্বীকার করেন না, কারণ তদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থপিপাসা সম্যক চরিতার্থ হয় না।"

ইংরেজ আমলের আদালত ও নতুন বিচারব্যবস্থার ফলেও গ্রাম্যসমাজে নতুন একশ্রেণীর লোকের উৎপত্তি হয়, যাঁদের তথাকথিত মামলাবিশারদ (আসলে দালাল) বলা যায়। এঁরাও এই গ্রাম্য মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত। "পূর্বে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে দেশের দশজনকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইত। এক্ষণে অর্ধ হস্ত ভূমির জন্য লোকে চতুর্দশবার আদালতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। এই ছুটাছুটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একশ্রেণীর নূতন লোক দেখা দিয়াছে। লোকের বিবাদে সাহায্য করা উহাদের কাজ। ঐ সকল অলস পরশ্রীকাতর লোকের হয়ত অন্নের সংস্থান আছে, পরের কাজ পাইলে ইহাদের সময়টা একটু সুখে যায়। ইহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে যাতায়াত করিয়া আদালতের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। ইহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্বোধ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য

দিতে, জাল মকদ্দমা প্রস্তুত করিতে, উকিল, সাক্ষী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে ইহারা বড় পটু। ইহারা একজনের পক্ষ হইয়া অপরের সর্বনাশ করে, আবার সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্বনাশের চেষ্টা পায়" (সোমপ্রকাশ, ১৯ আশ্বিন ১২৮৯)।[২৭] এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা আজও গ্রামাঞ্চলে কম নয়।

পত্তনিদার দর-পত্তনিদার ছে-পত্তনিদার ইজারাদার গাঁতিদার তালুকদার জোতদার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব গোমস্তা দেওয়ান ম্যানেজার তহশীলদার থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ, এমন কি জমিদারের বাজার-সরকার পর্যন্ত আমলাবর্গ, নতুন পুলিসের দারোগা কনেস্টবল, মহাজন এবং আইন-আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালাল থেকে উকিল পর্যন্ত নানারকমের লোক নিয়ে বাংলার গ্রাম্যসমাজে যে বিপুল-কলেবর এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হল, অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের (production) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রইল না। পরনির্ভর স্বার্থপর অর্থপিশাচ বেতনভুক এই গ্রাম্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাজার নখদন্ত বাংলার কৃষকদের দিকে ধাবিত হল। বাংলার কৃষকরা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' ভাষায়, "রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই স্বপ্ন দেখে! সর্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাহাদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে!" সহস্রমুখী জোঁকের মতো কৃষকদের শ্রম ও শ্রমার্জিত অর্থ শোষণ করা ছাড়া গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর আর কোন উপায় রইল না। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন: "পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্ন ভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে" (৫ভাদ্র ১২৬৪)।[২৮] কৃষকের শ্রমোৎপন্নভোগীর সংখ্যা গ্রাম্যসমাজে বেড়েছে, ব্রিটিশ শাসকরা আইনবলে তাঁদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। উৎপাদনকর্ম থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এরকম শোষণমুখী অর্থলোভী বিপুলাকার মধ্যশ্রেণী বাংলার গ্রাম্যসমাজে ব্রিটিশপূর্ব যুগে, মুসলমান বা হিন্দু রাজত্বকালে, ছিল না। বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের এই পরিবর্তন একদিক থেকে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নীলকর ও নীলচাষ—গ্রাম্যজীবনের অভিশাপ

ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে শাসক হয়েছিলেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁদের খুব সজাগ ছিল। এই সজাগ বণিকবুদ্ধি যখন বাংলার উর্বর ফসলক্ষেতে প্রযুক্ত হল, তখন সেখানে খাদ্যফসলের (food crops) পরিবর্তে বাণিজ্য-ফসল (commercial crops) উৎপাদনে তাঁরা উৎসাহী হলেন। ইংরেজ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা জানতেন যে নীল (indigo) পাট (jute) ইত্যাদি বাণিজ্য-ফসল এদেশের মাটিতে প্রচুর ফলাতে পারলে সোনা ফলানোর মতো হবে। এদেশের মাটিতে, এদেশের দরিদ্র চাষী মজুরের সুলভ মজুরীতে বাণিজ্য-ফসল ফলিয়ে, নিজেদের দেশে ইংলণ্ডে ও অন্যত্র রপ্তানি করতে পারলে তাঁরা পর্যাপ্ত মুনাফা করতে পারবেন, যা অন্য কোন সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্যে সহজে করা সম্ভব হবে না। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর মূলধন তাই বাণিজ্য-ফসল উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হল। নীলের কথা বলি। বাংলাদেশে বিদেশী মূলধন ও বাণিজ্য-ফসলের ইতিহাসে নীল ও পাট দু'টি স্বতন্ত্র অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। বাংলার গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে নীলকর ও নীলচাষের সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। কারণ নীলচাষের ব্যাপারে (পাটের ব্যাপারে নয়) নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ীরূপে নয়, এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার-রূপেও বিরাজ করতেন। চাষের ক্ষেত থেকে আরম্ভ করে তাঁদের নীলকুঠি (indigo factory) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁরা এক বিচিত্র রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন। নীলকর সাহেবরা ছিলেন বিদেশী শাসকদের প্রতিভূ, কাজেই স্থানীয় এদেশী জমিদার-তালুকদার-পত্তনিদারদের চেয়ে তাঁদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি শতগুণ বেশি ছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদাররাও তাঁদের অধীন নীলকর সাহেবদের যথেষ্ট সমীহ ও ভয় করে চলতেন।

১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে, বাংলাদেশে নীলচাষ আরম্ভ হয়। কোন্ ব্যক্তি প্রথমে নীলচাষ আরম্ভ করেন, তাই নিয়ে মতভেদ থাকলেও, মোটামুটি জানা যায় যে ল্যুই বোনদ (Louis Bonnaud) নামে এক ব্যক্তি মরিশাসে নীলচাষ করে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১৭৭২ সালে তিনি চন্দননগরের কাছে গোঁদলপাড়া গ্রামে দুটি মাত্র ভ্যাট নিয়ে একটি ছোট নীলকুঠি স্থাপন করেন। এটাই বাংলার প্রথম নীলকুঠি। পরে বোনদ চন্দননগর ও চুচুঁড়ার মাঝামাঝি একটি জায়গায় আর-একটি নীলকুঠি করেন ১৭৭৩

সালে। হাওড়ায় শ্যামপুকুরে দু'জন ফরাসী চিকিৎসক এই সময় একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৭৮৩ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি নীলকুঠি স্থাপিত হয় এবং বাংলাদেশ থেকে ইংলণ্ডে ঐ বছরে ১২০০।১৩০০ মণ নীল রপ্তানি হয়। ১৭৯৫-৯৬ থেকে ১৮০৪-৫ সালের মধ্যে বছরে ২৪,০০০ থেকে ৬২,০০০ মণ নীল উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে। ১৮১৪-১৫ সালে ৮৫,৪০৮ মণ নীল কলকাতা থেকে লণ্ডনে চালান দেওয়া হয়। বাংলাদেশের নীলের জন্য কোম্পানি ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী উভয়েই মূলধন খাটাতেন। যে দামে বাংলা-দেশে নীল তাঁরা কিনতেন (গড়ে ১৬০ টাকা থেকে ২০০ টাকা মণ), তার তিন-চারগুণ বেশি মূল্যে লণ্ডনের বাজারে বিক্রি করতেন। নীলকরদের দাদন দিয়ে নীল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হত। ১৮১৯-২০ থেকে ১৮২৬-২৭ সালের মধ্যে কোম্পানি মোট যত মূলধন বাংলার নীলের জন্য বিনিয়োগ করেন, তাতে তাঁদের মুনাফা হয় ৩৪৯,০৪০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা।[২৯] পার্লামেণ্টে দাখিল করা হিসেব থেকে মুনাফার এই অঙ্ক গৃহীত, কাজেই হিসেবে যে যথেষ্ট গোঁজামিল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মুনাফার অঙ্ক অন্তত দ্বিগুণ হওয়া স্বাভাবিক, অর্থাৎ ১৮১৯-২০ থেকে ১৮২৬-২৭ সালের মধ্যে শুধু কোম্পানির বাৎসরিক মুনাফা হত বাংলার নীল থেকে প্রায় ১০।১২ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া 'প্রাইভেট মার্চেণ্ট' সংখ্যায় যথেষ্ট ছিলেন, তাঁদের মূলধন ও মুনাফার পরিমাণ কোম্পানির চেয়ে বেশি ছাড়া কম ছিল না। এদেশী জমিদাররাও অনেকে নীল চাষের মুনাফায় প্রলুব্ধ হয়ে নীলকর হয়েছিলেন এবং নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়

নীলচাষের এই প্রথম পর্বের ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে বাণিজ্য-ফসল নীল বাংলার উর্বর ফসলক্ষেত কতদূর পর্যন্ত জবর-দখল করেছিল এবং নীলকর ও নীলকুঠির প্রভাব বাংলার গ্রামে কত দূর বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলাদেশে এমন কোন জেলা নেই যেখানে নীলকর সাহেবের কথা রোমাঞ্চকর জনকাহিনীতে পরিণত হয়নি। হাওড়া-হুগলি, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় গ্রামে গ্রামে নীলকুঠির ভগ্নস্তূপ এখনও দেখা যায়, স্থানীয় গ্রাম্য লোক ঐতিহাসিক নিদর্শন বলে সেগুলি দেখিয়ে দেন এবং গল্প বলেন যে নীলকর সাহেবের প্রেতাত্মা এখনও নাকি ঘোড়ায় চড়ে, বেত

নীলকুঠির চুল্লী

ঘর
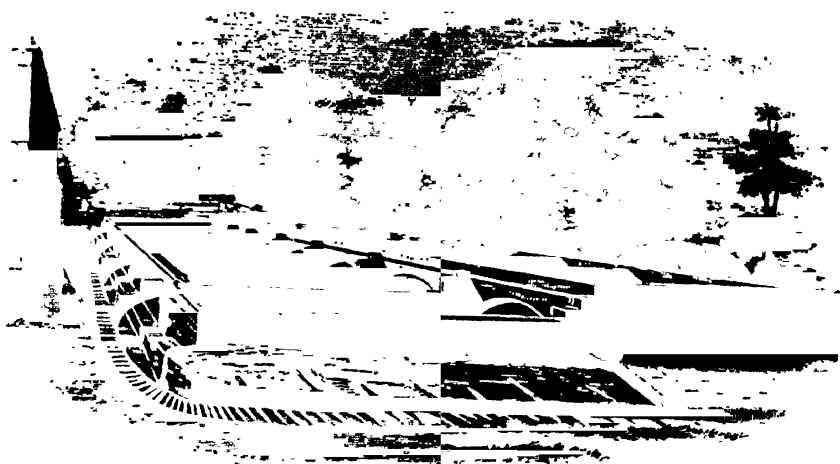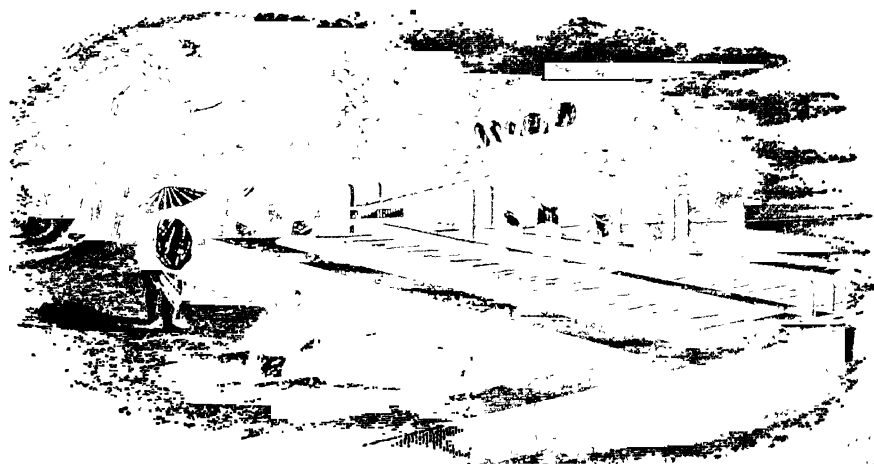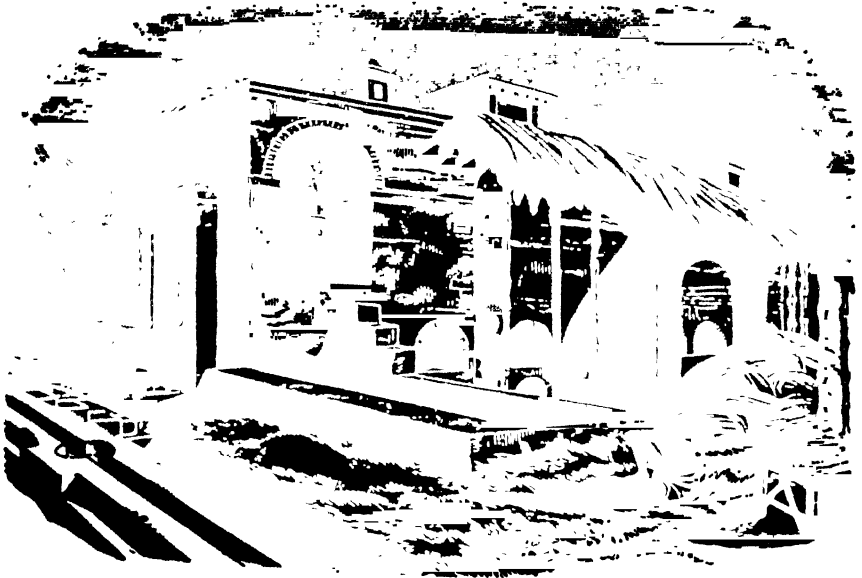
গরুর গাড়িতে নীলগাছ বোঝাই করে কুঠিতে আনা হয়
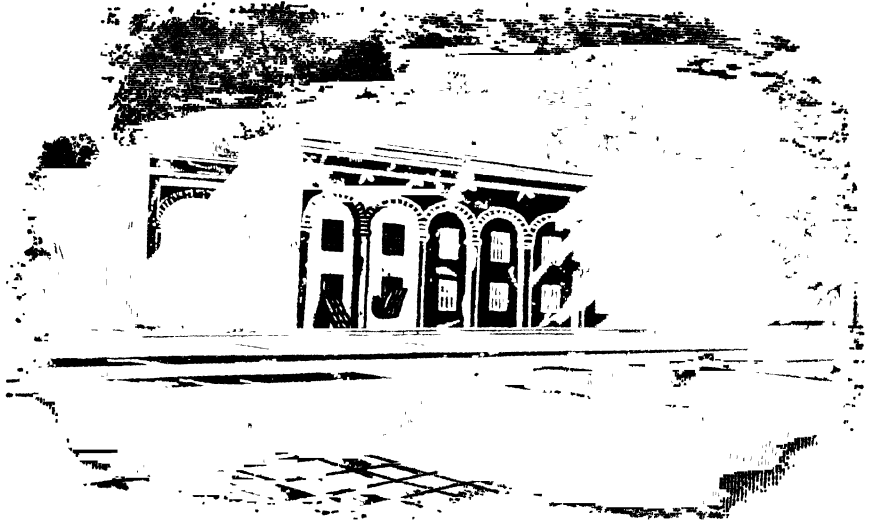
নীলকুঠি
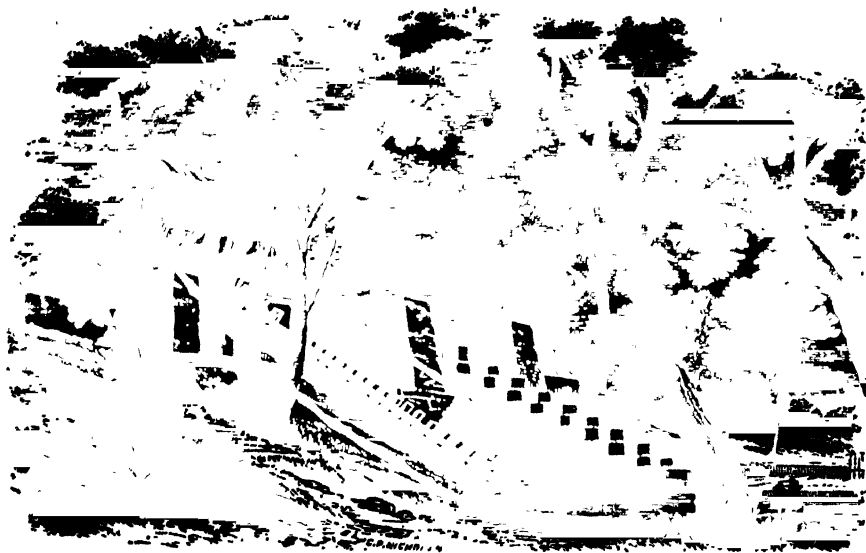
চীনা পাম্প
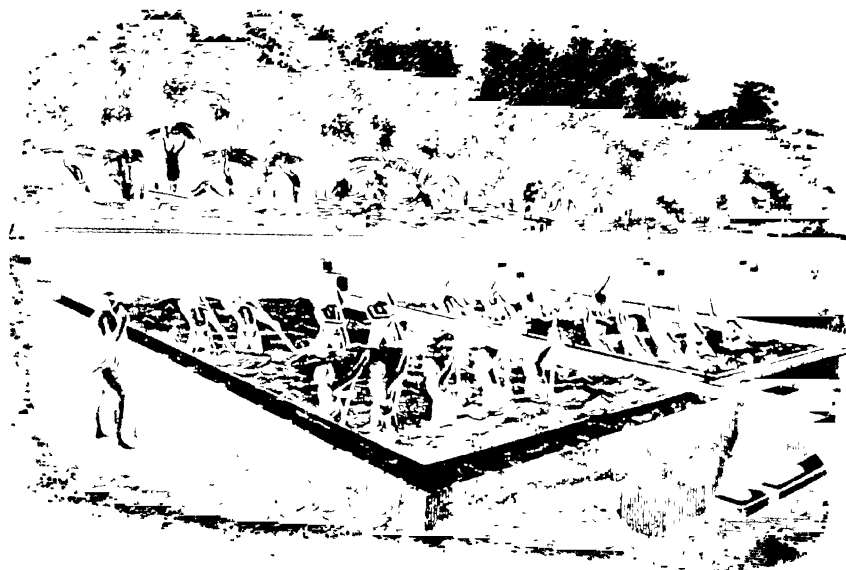
নীল পেটাই

নায়েব গঙ্গানারায়ণ মুখার্জি

ডাক্তার দীননাথ ধর

চারুচন্দ্র রায় (গোমস্তা)

নীলকুঠির কর্মচারী

হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি
(জমাদার)

কুলিসর্দার

জমাদার

কৃষ্ণনগর কলেজ

কৃষ্ণনগর গির্জা
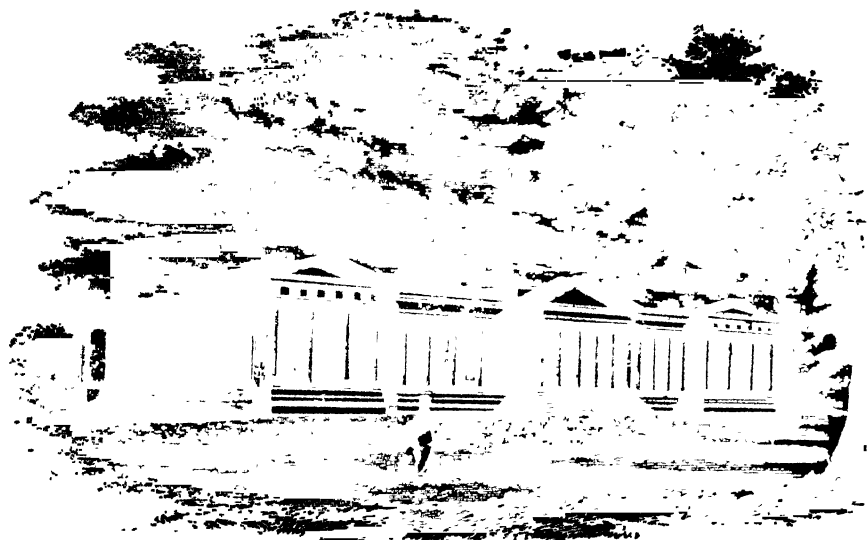
হাতে নিয়ে, পরিত্যক্ত নীলকুঠির আশপাশের জঙ্গলে অন্ধকার রাতে ঘুরে বেড়ায়। প্রবল শীতের শিহরণের মতো এখনও সেই নীলকর সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী শুনলে গ্রামের লোকের শরীর শিউরে ওঠে।

উনিশ শতকের বাংলা ও ইংরেজী সাময়িকপত্রে নীলকরদের দৌরাত্ম্য ও দুর্বিনীত আচরণের কাহিনী এত প্রকাশিত হয়েছে যে শুধু বাংলা পত্রিকার রচনাগুলি সংকলন করলে একটি হাজার পৃষ্ঠার বড় বই হতে পারে। আমরা কয়েকটি রচনার বক্তব্য উল্লেখ করছি।° 'সংবাদ প্রভাকর' (৩ আষাঢ় ১২৫৫) লিখেছেন, নীলকরদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা মামল-মকদ্দমা কিছু করা যায় না, কারণ ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকে এবং তাঁরা প্রায় নীলকরদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। জেলার কর্তা যদি শিকারে যান, বিলাসে যান, তাহলে স্থানীয় কোন নীলকর সাহেবেরই অতিথি হয়ে নীলকুঠিতে অবস্থান করেন। "এই নীলকুঠি সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইল, সদর নিজামতের ঘর এ বিষয়ে নথিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে এ পর্যন্ত কোন উপকার হইল না।...কয়েক জিলায় কয়েকজন জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, অথচ অত্যাচারের কিছুমাত্র খর্বতা হইল না, ইহার তাৎপর্য এক সাদা বর্ণের সর্বনাশ করিয়াছে, সাহেবেরা ম্যাজিস্ট্রেট হইলে কি হইবে, ঝাঁকের পায়রা ঝাঁকে মিশিয়া যান। তাহার উপর আবার 'শাদা মুল্লুক জাদা'..."—(সংবাদ প্রভাকর, ১ মাঘ ১২৬৫)। নদীয়া জেলায় নীলকরদের অত্যাচার প্রসঙ্গে প্রভাকর লিখেছেন (৬ মাঘ ১২৬৬): "প্রদেশ মধ্যে রাজশাসন প্রণালী নাই বলিলেই হয়। নীলকরেরাই রাজা এবং হর্তা কর্তা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন।" মরে সাহেব বিখ্যাত নীলকর ছিলেন, সুন্দরবনে তাঁর নীলের আবাদও ছিল। তাঁর নামেই 'মরেলগঞ্জ'। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (২ বৈশাখ ১২৬৯) এই নীলকর মরে সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতার একটি বিস্তারিত বিবরণ—'সুসভ্য ইংরাজবংশাবতসং নীলকর শ্রীযুক্ত মরে হইতে প্রজাদিগের নির্বাসন, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা, বলাৎকার, জালকারিতা প্রভৃতি'—শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়: "ইংরাজ জাতির মধ্যে যে এতদূর দুরাত্মা, এতদূর নির্দয়, এতদূর নিষ্ঠুর আছে, তাহা আমরা পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না। মরে সাহেব অধুনা যাদৃশ দুষ্কর্ম করিতেছেন তাহাতে বোধ হয়, কি অসভ্য বাঙ্গালি, কি প্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর মুসলমান

কেহ কখন এতদ্দেশে তাদৃশ ঘৃণিত কার্যে প্রবৃত্ত হন নাই।" নীলকরের অত্যাচারে কাতর একজন মুসলমান চাষীর একটি চিঠির অবিকল প্রতিলিপি 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ করেছিলেন (১৬ চৈত্র ১২৭০)। তার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হল :

"হা খোদা! তোর মনে এই ছিল! এই রকম কত করছে। থানার দারোগা ৭০০ টাকা ফুরণ করিয়া নিয়েছে সকল গাঁয় নীল বুনিয়ে দেবে, মেজেষ্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে না মঞ্জুর, সারা বছর না খেয়ে মজুরি করে জমিগুলি চাষ করিয়া রাখিয়াছি, আশমান পানি দিলিই ধান বুনবো তাবে বাল বাচ্চা সমেত খেয়ে জান বাঁচাবো। তাই নীল বুনে নেবে, চুক্তি ভঙ্গ বলে সকলে বেচে কিনে নিল, জমায় তিনচারগুণ বেশী করলো, খোদার বান্দা ফাটকে মলো। আরো কত মরে তার ঠেকনা কি? আয়েন্দা ভাত পানির দফা যায়। আল্লা এমন করে মারিস ক্যান্? তুই তো সকলই পারিস। একদিন কেন সব রাইয়ত গুষ্টি সমেত মেরে ফেলে সাহেবগারে সব দে না? আর তো বরদাস্ত হয় না। দোহাই আল্লা! এই দরখাস্ত করছি তুই আমাদের মেরে ফেল।"

—আবদুল মতলেব মণ্ডল

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকার একজন গ্রাহক লিখেছেন (২৪ ভাদ্র ১২৬৯) : "নীলদর্পণের বর্ণনায় যদি কোন মহাত্মার সন্দেহ থাকে, তবে বারেক এ প্রদেশে আগমন করিয়া নীলকরের অত্যাচার ও বিচার প্রণালী ও অস্মদের অবস্থা ক্ষণকাল অবলোকন করিলেই বর্ণিত পুস্তকের একটি কথার প্রতিও অবিশ্বাস করিবার অনুমাত্র কারণ থাকিবে না।"

একজন বিদেশী শিল্পী বাংলাদেশের নীলচাষ ও নীলকুঠির বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন।[৩১] এই বিবরণ থেকে নীলকুঠিতে গড়ে কতজন লোক কি কাজ করত তার একটা হিসেব পাওয়া যায় :

কর্মী	সংখ্যা	মাসিক বেতন
গাড়িচালক (১২০ গো গাড়ি)	১২০	৭॥০
মাঝি (৪৮ নৌকা)	৯৬	৪৲
সর্দার	১	৪৲
জ্যাট-কুলি	বুনো ৭২	৩৲
	মেদিনীপুরী ৪০	৪৲

কর্মী	সংখ্যা	মাসিক বেতন
গাছঝাপা	২৲	২৲
চীনা পাম্প-চালক	৩০	৩৸৹
পিন-কুলি	১	৪৲
বয়েলার হাউসের লোক	৬	৩৲
স্টোকার	৩	৩৸৹
দলাই-মাড়াই	৬	৩।৹
ঘাট-মুটে (মেয়ে)	৬	২৲
গুদাম-কুলি	৪	২৲
কুলিসর্দার	বুনো ২	৩৲
	মেদিনীপুরী ২	৫৲
ঘাট-মাঝি	১	৪৲
কেক কাটার	১	৪৲
ছুতোর	১	৪৲
কর্মকার	১	৫৲

মোট কুলির সংখ্যা ৩৯৫ জন। লেখক বলেছেন, যে বছর চাষ ভাল হয় না, সেই বছর কুলির সংখ্যা সাধারণত এইরকমই থাকে, চাষ ভাল হলে কুলির সংখ্যা এর দ্বিগুণ হয়। এছাড়া ভদ্রলোক কর্মচারী—নায়েব গোমস্তা সরকার প্রভৃতি—সংখ্যায় কম থাকেন না।

নীলকররা কিভাবে জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করান তার একটি নিখুঁত মর্মস্পর্শী বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে (অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শক, ৮৮ সংখ্যা)। তত্ত্ববোধিনী লিখেছেন: "নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহারদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগকে উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিৎ পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য করেন···কখন কখন এপ্রকারও ঘটে যে কোন কৃষক শস্য বপনার্থে কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র সুচারুরূপে কর্ষণপূর্বক অতি পরিপাটিরূপে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, ইতিমধ্যে নির্দয় নীলকরের প্রেরিত নিদারুণ লোকেরা তাহার অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইয়া নীলের বীজ বপন করিয়া যায়—তাহার আশাবৃক্ষ সমূলে নির্মূল করিয়া প্রস্থান করে।"

নীল উৎপাদন করার পরেও চাষীদের নিস্তার নেই। নীল কেটে যখন তারা কুঠিতে উপস্থিত করে তখন তাদের "বিষম বিপত্তির কাল।" "হিংস্র জন্তুবৎ নৃশংস-স্বভাব আমলারা" দাদন দেবার সময় চাষীদের কাছ থেকে টাকা নেয়, তারপরেও নানারকম ছুতোনাতায় চাষীদের কাছ থেকে তারা টাকা আদায় করে, এবং অবশেষে কুঠিতে যখন চাষীরা নীল নিয়ে আসে তখনও তাদের পীড়ন করা হয়। পঁচিশ মণ নীল খাতায় পাঁচ মণ লেখা হল এই ভয় দেখিয়ে কুঠির ভদ্রলোক আমলারা টাকা আদায় করতে ছাড়ে না। "একে নীলকর সাহেব তাহারদিগকে উচিত মূল্যের অর্ধমাত্রও প্রদানে স্বীকৃত হন না, তাহাতে আবার আমলারা তাহারদের উপর ছলে বলে কৌশলে নানাপ্রকার অত্যাচার করে। ইহাতে শত শত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে নীলকর সাহেবদের সন্নিধানে নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া ক্রমে এপ্রকার ঋণগ্রস্ত হইতে থাকে, যে তাহাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎপরিশোধে সমর্থ হয় না।"

নীলকর ও তাদের অনুচররা কেবল যে চাষীদের উপরই এরকম অত্যাচার করেন তা নয়। "যাহারা গাড়ি নৌকা বা মস্তকে করিয়া নীলপত্র বহন করে, ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য করে, তাহারদিগেরও প্রতি এই প্রকার ব্যবহার।" চাষীরা যেমন নীলের ন্যায্য মূল্য পায় না, কুঠির কুলিরাও তেমনই উচিত বেতন পায় না, তার জন্য নীলকরের কাছে তারা কাজ করতে চায় না। কিন্তু না চাইলে কি হবে, "সাহেবের অনিবার্য অনুমতি অবশ্যই অবশ্য পালন করিতে হয়।" নীলকুঠির ভদ্রলোক কর্মচারীদের চরিত্র বর্ণনা করে তত্ত্ববোধিনী লিখেছেন: "তাহারা ভদ্রলোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারানুসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে তাঁহারদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যতকিঞ্চিৎ অঙ্কশিক্ষা মাত্র তাঁহারদের বিদ্যার সীমা; তাঁহারা বিদ্যারসের স্বাদ গ্রহণও করেন না, নীতিশাস্ত্রেও শিক্ষিত হয়েন না। বিদ্যা ও ধর্মবিহীন লোকের যে প্রকার আচরণ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে? তাঁহারদের মুখশ্রীতে কেবল লোভ ও নির্দয়তার নিদর্শনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, জ্ঞান ও ধর্মের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টি করা যায় না।" এদের ছেলেপিলেরাও পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখে নীলকুঠির যে-কোন কাজে ঢুকে পড়ে, এবং তারপর বাবাখুড়োর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নানারকম কদাচার ও অবিচারে প্রবৃত্ত হয়। অনেক পল্লীগ্রামে নীলকুঠির সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোক আমলাদের এক-একটা অত্যাচারী

গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, গ্রামের শান্ত ও নিরীহ লোকজন তাদের সাক্ষাৎ যমদূত মনে করে। [৩২]

নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনীর শেষ নেই। মনে হয় সারা পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারিতার ইতিহাসে বাংলাদেশের নীলকর সাহেবরা যেন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদের জীবনের জপতপধ্যান হল টাকা আর টাকা, মুনাফা আর মুনাফা। খাদ্যফসলের প্রয়োজন নেই, নীলের মতো টাকার ফসল চাই। তার জন্য চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা, তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা, ধানী জমিতে জোর করে নীল চাষ করা, এবং তার জন্য থানার দারোগা থেকে যে-কোন দুর্বৃত্তের সঙ্গে টাকার চুক্তি করা—এসব যেন নীলকরদের জন্মগত অধিকারে পরিণত হয়েছিল মগের মুল্লুক বাংলাদেশে। এই চরম অত্যাচারের ফলেই বাংলাদেশে নীলবিদ্রোহ (১৮৬০) হয়।[৩৩] এ দেশের চিরস্থায়ী জমিদার-পত্তনিদার-তালুকদার এবং বিদেশের নীলকররা বাংলার গ্রাম্য সমাজের শান্তি-শৃংখলা ধ্বংস করে, তার যুগযুগান্তের স্থৈর্য ও আত্মসমাহিত রূপ বিকৃত করে, গ্রামের দীনদরিদ্র সাধারণ মানুষকে এই সত্যই উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন যে সবার উপরে টাকা সত্য, তার উপরে আর কিছু নেই। বর্তমান যুগের 'money economy' বা টাকাপ্রধান আর্থনীতিক ব্যবস্থার স্বরূপ যে কতদূর হৃদয়হীন ও বিবেকহীন হতে পারে, বাংলার নীলচাষ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, এবং নীলকররা তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নীলকররা কেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী বাংলার জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরাও তার ঐতিহাসিক সাক্ষী।

গ্রাম্য কারুশিল্প ও কারিগরদের অবনতি

প্রধানতঃ ব্যবহার বা ভোগ-প্রধান অর্থনীতির (use economy) উপর প্রাচীন কারুশিল্প ও কারিগরশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ছিল। কিছুটা বহির্বাণিজ্যও তার সমৃদ্ধির কারণ ছিল। কিন্তু বিনিময়-প্রধান অর্থনীতির (exchange economy) যুগে এই সব কারুশিল্প সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবই বদলে গেল। কারখানার যন্ত্রপাতি আর কর্মকারের হাতে-গড়া যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রভেদ অনেক। কারখানার কলে তৈরি বস্ত্র আর তন্তুবায়ের হাতে তাঁতে তৈরি বস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। ভোগ্য ও ব্যবহার্য জিনিসের প্রতি কলকারখানা ও বিনিময়-প্রধান অর্থনীতির যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত-পরিবর্তনশীল। ব্যক্তিগত রুচি,

সখ ও বিলাসিতা চরিতার্থ করার জন্য বাংলার গ্রাম্য অভিজাতশ্রেণী একদা বাঙালী কারুশিল্পীর উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ইংরেজ শাসকদের নতুন রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফলে তাঁরা একে-একে ধ্বংস হয়ে গেলেন। তাঁদের পরিবর্তে যে নতুন গ্রাম্য অভিজাত ও ধনিকশ্রেণীর উদ্‌ভব হল, তাঁরা অধিকাংশই একপুরুষের হঠাৎ-ধনী, প্রধানত শহরে দালালী-বেনিয়ানী-দেওয়ানী করে অর্থ রোজগার করেছেন এবং নিশ্চিন্ত-নিষ্ক্রিয় আয়ের (unearned income) নিষ্কণ্টক পথ অন্বেষণ করে জমিদারী কিনে 'চিরস্থায়ী' জমিদার হয়েছেন। বড়-মাঝারি-ছোট নির্বিশেষে এই শ্রেণীর 'city-capitalist' (কার্ল মার্ক্স-এর ভাষায়) জমিদাররা 'বিলাতী' বা বিদেশী ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন বেশি, এমন কি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্গে তাঁদের নতুন সামাজিক পদমর্যাদার (social status) যোগসূত্রও স্থাপন করলেন, এবং অনাদরে ও উপেক্ষায়, পোষকতার অভাবে, সেকালের বংশানুক্রমিক কারুশিল্পজীবীরা উৎসন্নে গেলেন। তাছাড়া বিনিময়-যুগের বাজার (market) হল প্রতিযোগিতার বাজার। কারখানাজাত বিলাতী দ্রব্যের কাছে বিনিময়-মূল্যের প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করে দেশীয় কারুশিল্পকে বাজার থেকে বিদায় নিতে হল। দুটি কারণে দেশীয় শিল্পের অবনতি হল—দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি এদেশের ব্যবহারকদের (consumers) মনোভাবের পরিবর্তন, নতুন উপযোগ-বোধ (utility) এবং কলে তৈরি বিলাতী দ্রব্যের সুলভ মূল্য। 'সোমপ্রকাশ' এ-সম্বন্ধে লিখেছেন (২৬ চৈত্র ১২৯০):[৩৪]

"এক্ষণে বঙ্গদেশের মধ্যে যে কিছু শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বাহিরের মুখ দেখিতে পায় না। পূর্বে যে যে শিল্পের সদ্ভাব ছিল, পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্য সংস্রবে তাহার যে মহত্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, চিন্তাশীল লোকমাত্রেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। ১৮৮২।৮৩-এর বঙ্গদেশীয় শাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে 'ইংলণ্ড হইতে বাহুল্যরূপে বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প ও যন্ত্রসকল বিনষ্ট হইতেছে।' পূর্বের ন্যায় আর ঢাকায় মসলিন প্রস্তুত হয় না, এখনকার ঢাকাই তন্তুবায়গণ আর সে প্রকার সূতা প্রস্তুত করিতে পারে না। তাহারাও সম্পূর্ণরূপে ম্যাঞ্চেষ্টারের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় তন্তুবায়েরা সূতার কাজ প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। বিলাত হইতে যে সকল সূতার আমদানী হয়, এখানকার তাঁতিরা তাহারই ব্যবহার করে। বস্ত্রবয়ন কার্য প্রায় উঠিয়া গেল। এক্ষণে চটের থোলের ব্যবসায়

তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানাদিতে চটের কলে খাটিয়া অধিকাংশ লোক জীবিকা উৎপাদন করে। এক্ষণে যে যে স্থানে যে যে সামান্য প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তদ্‌বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। বর্ধমান বিভাগে কালনার লালবাগানে যে সকল ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিলাতের বস্ত্রের আমদানিতে ইহারও ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। বর্ধমান জেলায় ৯টা পাটের কল ও ৬টা কাপড়ের কল আছে এই সকল কলে চট ও বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। রামপুর উপবিভাগে পাটের দড়ি অধিক হইয়া থাকে। গত বৎসর পাটের কলে ৭১৪৭৫৭ মণ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। হাবড়ায় তুলার কলের কার্যের ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে তুলার কলে যেরূপ লাভ হইতেছে, হাবড়ার কলে সেরূপ হইতেছে না কিন্তু চটের কলে উত্তমরূপ লাভ হইতেছে। পাটের গাঁইট কষার জন্য ৩টি কোম্পানী হইয়াছে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় কতকগুলি লাক্ষার কারখানা আছে। এক বাঁকুড়ায় ৩৪টা লাক্ষার কল হইয়াছে। উক্ত জেলায় লাক্ষার ব্যবসায়ই প্রধান। বীরভূমে ইসলামবাজার নামক স্থানে এদেশীয়দিগের ৮টি লাক্ষার কারখানা আছে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐ একটি পদার্থ এদেশের প্রধান দ্রব্য। বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ধাতু পাত অধিকাংশ প্রস্তুত হয়, তাহাও বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮২।৮৩ অব্দে বর্ধমান জেলা হইতে আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকার কাঁসা বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ অব্দে হুগলি হইতে ছয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ও মেদিনীপুর হইতে আটাশ লক্ষ উনষাইট হাজার টাকার পিত্তল বিলাতে রপ্তানি হয়। বর্ধমান জেলার মধ্যে কাঞ্চননগর শিল্পের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তথায় ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রসকল অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রানীগঞ্জ ও বর্ধমানের কাটরা (কাটোয়া ?) বিভাগে কুম্ভকারের কার্যের কিছু কিছু উন্নতি আছে। বর্ধমানের মধ্যে রঘুনাথচক নামক স্থানে পোর্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা হইয়াছে। উহার বাণিজ্যে কিছু কিছু লাভ হইতেছে। রানীগঞ্জে উক্ত সিমেণ্ট করিবার জন্য একটি বৃহৎ কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। ইহার কার্য অদ্যাপি আরম্ভ হয় নাই। বালির কাগজের কার্য উত্তমরূপ চলিতেছে। ২৪-পরগণার মধ্যে ৩৪টি কল আছে। ঐ সকল কলে সাতাইশ হাজার লোক খাটিয়া থাকে। ঐ সকল কলে খোলে, কাপড়, সুতা, ইট, চাউল, তৈল, লাক্ষা প্রস্তুত হয়। কেরোসিন তৈলের আমদানি নিবন্ধন যেড়ি তৈলের আমদানি কলের কার্য মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বিভাগে মৃৎপাত্র লৌহ ও পিত্তল পাত্র, অস্ত্রাদি ও শৃঙ্গের কার্য বহুল পরিমাণে হইতেছে। শান্তিপুরের উৎকৃষ্ট বস্ত্র ব্যবসায় বিলাতি বস্ত্রের আমদানি নিবন্ধন ক্রমেই অবনতি হইতেছে। রেশম প্রস্তুত

করিবার প্রধান স্থান মুর্শিদাবাদ। এই ব্যবসারও ক্রমে লোপ হইবার সূচনা হইয়াছে। নদীয়াতে রেশমের একটি কুঠি আছে। বিলাতি সার্টিন ও অন্যান্য বস্ত্রের আমদানি হেতু এ ব্যবসায়টিও লোপ পাইতে বসিয়াছে। খুলনা জেলাতে মৃত্তিকাপাত্র পাটও অধিক জন্মে। কোন কোন স্থানে লবণও প্রস্তুত হইয়া থাকে।...রাজসাহী ও রঙ্গপুরের পিত্তলের বাসন বিদেশে অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে। দিনাজপুর বগুড়া জলপাইগুড়ি পাবনা প্রভৃতি জেলাতে নানাপ্রকার মাদুরের ব্যবসা আছে...ঢাকা বিভাগে শঙ্খের কাজ, নারিকেল তৈল, চিনি, পিত্তল পাত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্যাদি, মাদুর, সাবান, পনির ইত্যাদি অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন নৌকা নির্মাণ প্রভৃতি সূত্রধরের কার্য ও কুম্ভকারের কার্যও অধিক হয়।"

কারুশিল্পের এই বিবরণ পর্যাপ্ত ও বিস্তারিত নয়। বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজনও নেই এখানে। কি কারণে কারুশিল্পের অবনতি হয়েছে বাংলাদেশে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন 'সোমপ্রকাশ'। অনেক দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাইরে রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেশের মধ্যেও কিছু কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠাতে দেশীয় শিল্পের অবনতি হয়েছে। বিদেশের শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলেও দেশীয় কারুশিল্প লোপ পেয়েছে। 'সোমপ্রকাশ' কথিত এই কারণগুলি ছাড়াও দেশীয় শিল্পের অবনতির আর একটি বড় কারণ হল—ব্রিটিশ আমলে নাগরিক ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভোগ্যবস্তর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, বিদেশী দ্রব্যের চাকচিক্যের প্রতি অনুরাগ এবং সাধারণভাবে খানিকটা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পদ্ধতি-বদল।

দেশীয় শিল্প ও তৎসংক্রান্ত বাণিজ্যের ক্রমাবনতির ফলে বাংলাদেশে পুরাতন শিল্পনগরগুলিরও (সেন্সাসে এই নগরগুলিকে 'Country towns' এবং পরে 'Residential towns' বলা হয়েছে) অবনতি হয়েছে। এই সব নগরে লোকসংখ্যার ক্রমিক হ্রাস থেকে তা বোঝা যায়ঃ[৩৫]

পুরাতন শিল্পনগর : লোকসংখ্যা

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
বর্ধমান—কালনা	২৭,৩৩৬	১০,৪৬৩	৯,৬৮০	৮,১২১	৮,৬০৩	৮,৪২৪
দাঁইহাট	৭৫৬২	৫৭৮৯	৫১৪৪	×	×	৪৮৩০
বাঁকুড়া—সোনামুখী	১২,৭৬৫	৫,৫৯০	১৩,৪৬২	১৩,৪৪৮	১৩,২৭৫	১০,৬৪৪
মেদিনীপুর—খড়ার	×	×	১০,০৮৩	৯,৫০৮	৮,৮৩৯	৬,৫৮০
রামজীবনপুর	১১,১৬৬	১০,৯০৯	৯,৯৭৭	×	৮,৪৮১	৬,৭০৭

কৃষ্ণনগর ডাকবাংলো
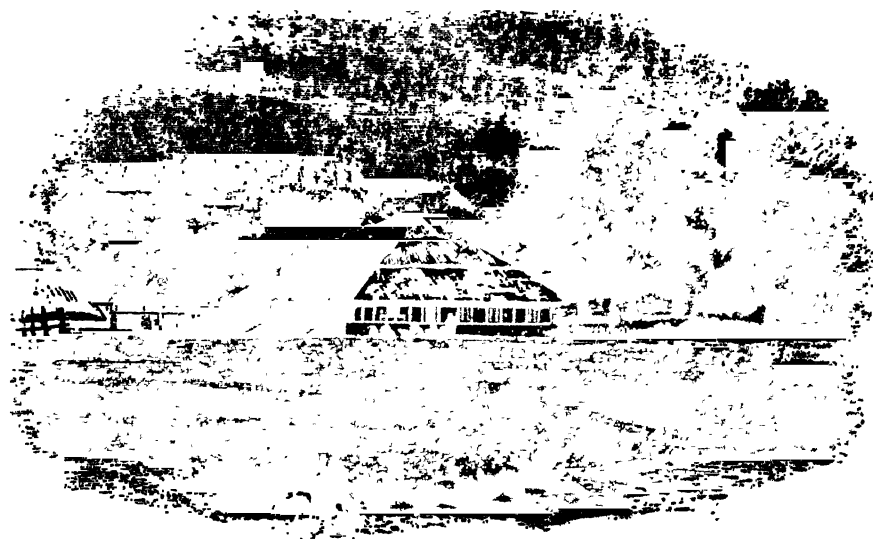
সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো—কৃষ্ণনগর

সুখসাগর আবাস—নদীয়া

একদা ইংরেজরা হাওয়া-বদল করতে যেতেন

হুগলি ইমামবাড়া

পুরাতন শিল্পনগর : লোকসংখ্যা

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা :	২১,৩১১	১২,২৫৭	১১,৩০৯	৯,৩০৯	৮,১২১	৬,৪৭০
ক্ষীরপাই :	৮০৪৬	৬২৯৫	৫৭০৮	৫০৪৫	৪,৬০৫	৩৭৫৬
হুগলি—আরামবাগ :	১৩,৪০৯	১০,৫০৭	৮৩২৬	৮২৮১	৮,০৪৮	৭৮৫৭
মুর্শিদাবাদ :	২৪,৫৩৪	২০,৮৪১	১৮৮৯৯	১৫১৬৮	১২৬৬৯	১০৬৬৯
জিয়াগঞ্জ :	২১,৬৪৮	১৮,৩৯০	১৬,৬৭৭	১৩,৩৮৫	১২৩২৭	১১২৩১
পুরাতন মালদা :	৫,২৬২	৪,৬৯৪	৪,১৭৮	৩,৭৪৩	×	৩,১৪৫
বীরভূম—সিউড়ী :	৯,০০১	৭,৮৪৮	৭,৪৮১	×	×	×
নদীয়া—কৃষ্ণনগর :	২৬,৭৫০	×	২৫,৫০০	২৪,৫৪৭	২৩,৪৭৫	২২৩০৯

প্রাচীন শিল্পনগর। এই নগরগুলির ক্রমিক অবনতির কারণ টমসন তাঁর ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে যা নির্দেশ করেছেন তা এই : (১) এই সব নগরে যাঁরা নতুন চাকরিজীবী ও বৃত্তিজীবী—শিক্ষক কেরানী উকিল-মোক্তার প্রভৃতি —তাঁরা শহরে সপরিবারে বাস করেন না। গ্রামে তাঁদের পরিবার থাকে, শহরে তাঁরা একলা থাকেন অর্থ রোজগারের ধান্ধায় ; (২) নতুন শাসনকেন্দ্র বা শিল্পকেন্দ্র যে সব নগরে স্থাপিত হয়নি, তাদের অবনতি হয়েছে ; (৩) যুবকরা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। এই কারণ-গুলিকে এককথায় টমসন সাহেব নাগরিক জীবনের প্রতি বাঙালীর বিরাগ— "unpopularity of town life among the people of Bengal"— বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু একথা যে সত্য নয় তা বাংলাদেশে কলকাতা শহর তো বটেই, বর্ধমান কৃষ্ণনগর বহরমপুর প্রভৃতি জেলাশহর, মহকুমাশহর ও নতুন শিল্পনগরের প্রসার ও লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ইতিহাস থেকে বোঝা যায়। বাঙালীর, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙালীর, মন গ্রামমুখী নয়, শহর-নগরমুখী।

পুরাতন শিল্পনগরের অবনতির প্রধান কারণ হল—দেশীয় শিল্পের পোষকতার অভাব, বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার পরাজয়, এবং নতুন কারখানাশিল্পের বিস্তার। দ্বিতীয় কারণ হল—নতুন রাজধানী-শহর (যেমন কলকাতা), নতুন জেলাশহর (যেমন বর্ধমান কৃষ্ণনগর বহরমপুর প্রভৃতি) ও নতুন শিল্পনগরের (যেমন টিটাগড় নৈহাটি ও অন্যান্য পাটকল-অঞ্চল, বা নতুন

শিল্পকেন্দ্র) লোকাকর্ষণ শক্তির ('pull') প্রাবল্য। পুরাতন কারুশিল্পীশ্রেণীর একটা বড় অংশ, আর্থিক কারণে, নতুন কারখানাশিল্পে মজুর হয়েছেন, অথবা শহরে-নগরে নতুন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন বংশগত বৃত্তি ছেড়ে, জীবনধারণের তাগিদে। পূর্বোদ্ধৃত 'সোমপ্রকাশ'-এর বিবরণের মধ্যে এই ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। তন্তুবায়, কর্মকার প্রভৃতি বৃত্তিজীবীদের মধ্যে একটা বড় অংশ তো বটেই, পটুয়াশিল্পী কথক প্রভৃতি চারুশিল্পীদের মধ্যেও অনেকে নতুন শহর-নগরে এসে বৃত্তিবদল করেছেন। যেমন বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াশিল্পীরা অনেকে কলকাতা শহরে, অথবা কোন জেলাশহরে, গৃহনির্মাণশিল্পী রাজমিস্ত্রী বা প্রতিমানির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।[৩৬] যেমন ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়াম কেরীর বাংলা টাইপ-কাস্টিং-এর কাজে পঞ্চানন কর্মকার নিযুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি অনেক বাঙালী কর্মকার হয়ত ছুরি-কাঁচি-বঁটি-কাটারি তৈরির পরিবর্তে নতুন মুদ্রণশিল্পের যুগে 'টাইপ-কাস্টার' বা অক্ষর-খোদাইশিল্পী হয়েছিলেন। এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু এর ভিতর থেকে সামাজিক গতির (social trend) দিক্‌নির্ণয় করাই হল আসল সমস্যা। আমরা দেখেছি ইংরেজ শাসকদের রাজস্বসংগ্রহনীতির নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছে, নতুন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, তাঁদের অধীন পত্তনিদার-দরপত্তনিদার প্রভৃতি অসংখ্য খুদে-জমিদারদের একই আইনসঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, অসহায় কৃষকদের দিকে সর্বগ্রাসী শোষণের শতসহস্র নখদন্ত প্রসারিত হয়েছে, বাণিজ্যফসল নীলচাষের ফলে গ্রামের পর গ্রাম প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে, গ্রাম্যসমাজের কারুশিল্পীশ্রেণীকে উৎখাত করা হয়েছে, চাকরাজ-লাখেরাজ প্রভৃতি সম্পত্তিভোগ থেকে ঘাটোয়াল-পাইক-চৌকিদার ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৩৭]

নতুন জমিদারশ্রেণীর স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুরাতন সমাজব্যবস্থা (ফিউডাল) বজায় রাখার চেষ্টা করলেন ব্রিটিশ শাসকরা, কিন্তু জমিদারদের কাছ থেকে সেকালের সামন্তযুগের একটা বড় ক্ষমতা অপহরণ করে নিলেন। গ্রাম্যসমাজ রক্ষা করার বা শাসন করার কোন অধিকার বা দায়িত্ব জমিদারদের রইল না, অথচ তাঁরা যাতে স্থায়ীভাবে নিরাপদে জমিদারী ভোগ করতে পারেন, এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেভাবে খুশি ইজারা দিতে পারেন, সে-ব্যবস্থাও

করা হল। এ নীতি স্ববিরোধী (contradictory)। একদিকে সেকালের সামন্তব্যবস্থা কায়েম করার ব্যবস্থা করা হল, আবার অন্যদিকে তার ভিত্‌টিও ভেঙে দেওয়া হল। ঠিক এইরকম আত্মবিরোধী নীতি অনুসরণ করেই আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসকরা, তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, একটা যুগান্তকারী সামাজিক পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। সেকালের সামন্তযুগের যথেষ্ট উচ্ছিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, এবং ব্রিটিশ শাসকদের ইচ্ছা, চিন্তা ও নীতির বিরুদ্ধেও তাঁরা যে বাংলার সেকালের গ্রাম্যসমাজের ভিত্‌টি ভেঙে দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বণিকসুলভ মনোভাব, বিনিময়প্রধান অর্থনীতি, অবাধ বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতার 'মার্কেট' বা বাজার, টাকার মানদণ্ডে জমিদারের প্রভাব-বিচার ও মর্যাদার তারতম্য—এতসব ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে বাংলার গ্রাম্যসমাজ নিষ্কৃতি পায়নি। সেকালের বাংলার গ্রাম্যসমাজের ভিত্ পর্যন্ত নাড়া দিয়ে তাঁরা যে সামাজিক পরিবর্তনের (social change) প্রেরণা (stimulus) সঞ্চার করেছিলেন তা মিথ্যা নয়। ঐতিহাসিক ঘটনার লৌহবর্ম ভেদ করে যদি অন্তরে প্রবেশ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ব্রিটিশ শাসকরা একটা বড়রকমের সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন এদেশে, অনেকটা তাঁদের অজ্ঞাতসারে।

গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের রূপ ও ধারা

সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ব্রিটিশ শাসন-শোষণনীতির ফলে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন, অতীতে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যত পরিবর্তনই হোক্ না কেন, সেই সুদূর অতীত থেকে প্রায় উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁত ও চরকা চিরকাল ভারতের অসংখ্য তাঁতি ও সুতাকাট্‌নির জীবিকা ছিল এবং ভারতের স্থিতিশীল সমাজের প্রধান স্তম্ভ ছিল কারুশিল্প। ভারতের সমাজ-জীবনে অনধিকার প্রবেশ করে ব্রিটিশ শাসকরা চরকা ও তাঁত ধ্বংস করেছেন—"It was the British intruder who broke up the Indian handloom and destroyed the spinning wheel." ভারতের গ্রাম্যসমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ। তাঁত চরকা ও কৃষিকাজ ছিল এই পরিবারনির্ভর সমাজের স্তম্ভ এবং

পরস্পরনির্ভর গৃহশিল্প ও কৃষিকাজ থেকে তার আর্থনীতিক প্রয়োজন মিটে যেত। এই সুস্থির সমাজ-জীবনে হস্তক্ষেপ করে ইংরেজরা হয় সুতাকাটুনিকে নিয়ে গেলেন ল্যাঙ্কাশায়ারে, আর তাঁতিকে রাখলেন বাংলাদেশে, না হয় তাঁতি ও কাটুনি উভয়কেই ধ্বংস করে ছোট ছোট স্বাবলম্বী সমাজকেন্দ্রগুলির আর্থ ভিত্ ভেঙে দিলেন। তারফলে এসিয়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ঘটল, সত্য কথা বলতে কি, তা এই প্রথম, পূর্বে কখনও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। মার্ক্স বলেছেন:

"Those family communities were based on domestic industry, in that peculiar combination of hand-weaving, hand-spinning and hand-tilling agriculture which gave them self-supporting power. English interference having placed the spinner in Lancashire and the weaver in Bengal, or sweeping away both Hindu spinner and weaver, dissolved these small···communities, by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth the *only social* revolution ever heard of in Asia."

একথা সত্য, মার্ক্স বলেছেন যে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা হিন্দুস্থানে এই সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেননি, বরং অত্যন্ত কুৎসিত মনোভাব ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করেছিলেন এবং তা কার্যকর করতে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্ন হল, মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি সুন্দর হতে পারে যদি এসিয়ায় এই ধরনের কোন মৌল সামাজিক বিপ্লব না ঘটে? হতে পারে না, এবং তা যদি না হয় তাহলে ইংলণ্ড যত অন্যায়-অপরাধই করুক না কেন, তার অজ্ঞাতসারেই সে এই বিপ্লব সংঘটনে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে—

"England, it is true, in causing a social revolution in Hindusthan was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crime of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution".[৩৮]

মার্ক্স-এর এই বিশ্লেষণের তাৎপর্য গভীর। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণনীতির

কঠোর সমালোচনা করা এক জিনিস, এবং সেই নীতির ফলে আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার স্বরূপ ও গতিধারা পর্যালোচনা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সামন্ততন্ত্র (Feudalism) থেকে ধনতন্ত্রের (Capitalism) স্তরে যাত্রাপথে সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তিতে একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটেছিল। গৃহশিল্প-কারুশিল্প থেকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পের পথে অগ্রগতি এই রূপান্তরের অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল—যাকে এক কথায় বলা যায় মানুষের মধ্যে টাকাসর্বস্ব মানসতার (money-oriented mentality) বিকাশ। এই মানসতার বিকাশ হয়েছিল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য। সেই পরিবর্তন হল, 'স্বাভাবিক অর্থনীতির' (natural economy) স্তর থেকে 'টাকার অর্থনীতি'র (money economy) স্তরে উত্তরণ। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা 'natural economy' ও 'money economy' কথা দু'টি আর বিশেষ ব্যবহার করেন না, তার পরিবর্তে 'use economy' ও 'exchange economy' কথা দু'টি ব্যবহার করেন। আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের স্বল্পপরিসর বাজারে কৃষক ও কারুশিল্পীরা পরস্পরের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের আদানপ্রদান করত। ব্যবসাবাণিজ্য হত বটে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন (surplus production) করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্রিটিশ আমলে নতুন স্বাধীন বাণিজ্যের ফলে, এবং বাজারে বিদেশী জিনিসের আমদানির জন্য, পুরাতন কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা কমতে থাকে। পুরাতন পরিবার-আবদ্ধ শ্রমবিভাগের (division of labour) সংকীর্ণতাও নতুন প্রসার্যমান প্রতিযোগিতার বাজারে (expanding competitive market) অচল হয়ে ওঠে। টাকা-পণ্য-বিনিময়প্রধান অর্থনীতির প্রভাবে সেকালের গ্রাম্যসমাজের প্রয়োজনমুখী অর্থনীতির ভিত্ ভেঙে যায়। এই হল প্রয়োজনপ্রধান অর্থনীতির উপর বিনিময়প্রধান অর্থনীতির সংঘাতের প্রথম ফল।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হল—টাকা বিনিময়-মাধ্যম (medium of exchange) হওয়ার ফলে উৎপাদনের প্রতি উৎপাদকদের মনোভাবের পরিবর্তন হল। স্থাবর সম্পত্তি ও বিনাশশীল দ্রব্যাদি স্তূপাকার করে ধনসঞ্চয় করার আর প্রয়োজন রইল না। চরমসীমা পর্যন্ত ধনসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান

টাকার দ্বারা পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হল। দৃশ্যমান জড়বস্তুর বদলে যখন অদৃশ্য টাকার পুঁজি পর্বতপ্রমাণ করার পথেও আর কোন বাধা রইল না, তখন মানুষের মনোভাবের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেল। কেবল যারা টাকা লেনদেনের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ল তারা নয়, সাধারণ লোক যারা খুব বেশি জড়িত হতে পারল না, তারাও এই টাকাপ্রধান অর্থনীতির যাদুস্পর্শ থেকে মুক্তি পেল না। সুতরাং শুধু নতুন যুগের বণিক-ব্যবসায়ীরা নয়, সেকালের রাজা-মহারাজা-জমিদাররাও টাকার দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করলেন। মার্ক্সীয় অর্থবিজ্ঞানী পল সুইজি (Paul M. Sweezy) সুন্দর করে এই বিষয়টি বুঝিয়েছেন ঃ[৩৯]

"...the very existence of exchange value as a massive economic fact tends to transform the attitude of producers. It now becomes possible to seek riches, not in the absurd form of a heap of perishable goods but in the very convenient and mobile form of money or claims to money. The possession of wealth soon becomes an end in itself in an exchange economy, and this psychological transformation affects not only those who are immediately involved but also...those who come into contact with the exchange economy. Hence not only merchants and traders but also members of the old feudal society acquire what we should call today a business-like attitude toward economic affairs."

এই প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হল, সমাজের বিত্তবান অভিজাত-শ্রেণীর ভোগবিলাসের রুচির পরিবর্তন। ঐতিহাসিক পিরেনি (Henri Pirenne) এ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ[৪০]

"... in every direction where commerce spread, it created the desire for the new articles of consumption, which it brought with it. As always happens, the aristocracy wished to surround themselves with the luxury, or at least the comfort befitting their social rank".

বাংলাদেশের নাগরিক ও গ্রাম্য অভিজাতশ্রেণীর ভোগবিলাস চরিতার্থতার দিক থেকে একথা যে কতখানি সত্য তা আমরা জানি।

বিনিময়-প্রধান অর্থনীতির আর একটি ঐতিহাসিক ফল হল, নতুন শহর-নগরের বিকাশ। গ্রাম্যজীবনের গড্ডলপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শত সহস্র বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ নতুন শহরে ও নগরে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চাইল। সুইজির ভাষায়—"the rise of the towns, which were the centers and breeders of exchange economy, opened up to the servile population of the countryside, the prospect of a freer and better life."[৪১]

কার্ল মার্ক্স তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে ভারতীয় সমাজে নতুন বিনিময়প্রধান অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> "The greater part of the products is destined for direct use by the community itself, and does not take the form of commodities. Hence production here is independent of that division of labour brought about, in Indian society as a whole, by means of the exchange of commodities."

মার্ক্স বলেছেন যে ভারতীয় সমাজে কুলানুগামী শ্রমবিভাগ অনেকটা প্রাকৃতিক বিধানের (law of Nature) মতো কার্যকর ছিল। কর্মকার সূত্রধর তন্তুবায় সকলে স্বাধীনভাবে, কিন্তু বংশগত ধারা অনুযায়ী, নিজেদের কাজকর্ম করত, অর্থাৎ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত। এই সহজ-সরল উৎপাদনরীতি এতদূর কুলানুবর্তী ছিল যে কোনদিন তা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। যদি দৈবাৎ কোনদিন ধ্বংস হত, তাহলে পুনরায় সেই একস্থানে, একই পদ্ধতিতে আবার তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত। কুলানুগামী উৎপাদনরীতির এই স্বাভাবিক সারল্যই, মার্ক্স বলেছেন, "supplies the key to the secret of the *unchangeableness* of Asiatic society" এবং রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও ভারতীয় সমাজের আর্থভিত্তি অচল-অটল ছিল এই কারণে—"The structure of the economic elements of society remains untouched by the storm-clouds of political sky."[৪২]

এসিয়ার তথা ভারতীয় ও বাংলার সমাজের এই অচলতা ও স্থিতিশীলতা ব্রিটিশ শাসন-শোষণনীতির ফলে ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংসস্তূপের উপর হয়ত নবযুগের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নতুন সমাজের ভিত্ সেখানে স্থাপিত হল না,

অথবা তার কোন নতুন কাঠাম বা 'structure' গড়ে উঠল না, ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিবন্ধকতার জন্য। বিনিময়প্রধান অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি হল যন্ত্র-শিল্পায়নের (industrialisation) দিকে, এবং একাধিক শিল্পনগরের (industrial towns) বিকাশের দিকে। এই গতিও ব্রিটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রতিরুদ্ধ হল। বাণিজ্য নীতিগতভাবে কুলবন্ধনমুক্ত হলেও, বিদেশী শাসকরা শতবন্ধনে তার স্বচ্ছন্দগতিতে বাধা সৃষ্টি করলেন। তার ফলে বাংলার গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তনের রূপ কালোপযোগী হল না এবং পরিবর্তনের গতিও ইতিহাস-নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হল না। কিন্তু তা না হলেও, ব্রিটিশ আমলের 'exchange economy'-র ঘাতপ্রতিঘাত থেকে বাংলার গ্রাম্যসমাজ ও গ্রাম্য মানুষ রক্ষা পেল না। তার বৈদ্যুতিক 'শক্' তার ভিত্ পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিল। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের পরিবর্তন হল। প্রাচীন সমাজের পিঞ্জর জীর্ণ অবস্থাতেই রইল, একেবারে ভাঙল না। তা সত্ত্বেও নতুন দৃষ্টি ও মন সেই জীর্ণ পিঞ্জরের বাইরে ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা দেখতে পেল। বাংলার গ্রাম্য জীবনে নতুন গতি সঞ্চারিত হল, এবং সেই গতির স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতা পদে পদে ব্যাহত হলেও, গতিটা মিথ্যা নয়।

গ্রাম্যসমাজের গতিশীলতা (social mobility) এমনিতেই নাগরিক সমাজের মতো বেশি সচল নয়, কিছুটা মন্থর। কারণ প্রাচীন ঐতিহ্য (tradition), প্রথা রীতিনীতি আচার (customs), বদ্ধমূল ধ্যানধারণা (mores)—যেমন আমাদের দেশে জাতিভেদ ও কুলবর্ণগত সংস্কার, ধর্ম ও শাস্ত্রগত সংস্কার—প্রভৃতির প্রভাব গ্রাম্যসমাজে অনেক বেশি গভীর। এগুলি সামাজিক অচলতা ও কূপমণ্ডূকতা সহজে ভাঙতে দেয় না এবং নতুন কোন গতির সচলতাও বৃদ্ধি করে না।[৪৩] তা সত্ত্বেও বাংলার গ্রামে সামাজিক গতিশীলতার একটা 'প্যাটার্ন' উনিশ শতকে দেখা যায়, যার রেখাচিত্র মোটামুটি এইরকম :

গ্রাম		শহর / শিল্পনগর				
১। কৃষক	→	দিনমজুর / গৃহভৃত্য	→	মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী / ব্যবসায়ী	→	উচ্চশ্রেণী
২। কারুশিল্পী	→	দক্ষ মজুর / কারখানার মজুর	→	ঐ	→	
৩। মধ্যস্বত্বভোগী	→		→		→	

কৃষক-ক্ষেতমজুররা অনেকে শহরে-নগরে গিয়ে জীবিকার তাগিদে দিন-মজুর বা গৃহভৃত্য হয়েছেন, কারুশিল্পীরা কারখানার মজুর ও দক্ষ শ্রমিক হয়েছেন এবং এই উভয়শ্রেণীর মধ্যে কেউ কেউ জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়ে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জমিদারীর মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের মধ্যে একটা অংশ শহরে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল, এই তিনশ্রেণীর মধ্যে যাঁরা শহরমুখী হয়েছেন, তাঁদের সম্পূর্ণ urbanisation সম্ভব হয়নি, অর্থাৎ তাঁরা পুরোপুরি শহুরে বা শহরবাসী হতে পারেননি। যেমন গ্রাম থেকে শহরে এসে যাঁরা মজুর হয়েছেন তাঁরা সম্পূর্ণ 'proletarianised' হননি, তেমনি গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী যাঁরা শহরমুখী হয়েছেন এবং শহুরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তশ্রেণীতে গৃহীত হয়েছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণরূপে 'urbanised' হননি। শহরমুখী প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের এক পা ছিল গ্রামে, এক পা ছিল শহরে। ১৯২১ সালের সেন্সাস অধিকর্তা টমসন সাহেব বাঙালীর নগরজীবনের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তা হল এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ-বৈশিষ্ট্যের কারণ হল আর্থনীতিক। গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শহুরে জীবন বা চাকরি-ব্যবসার জন্য তাঁদের জমিদারী বা তার উপস্বত্বের আয় ছাড়তে পারেননি, এবং নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা, বিলাসিতা, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গ্রাম্য আয়ের উপর (যার সবটুকুই প্রায় অনুপার্জিত আয়) নির্ভর করেছেন বেশি। আর কৃষক-কারুবর্গ যাঁরা শহরে দিনমজুর, গৃহভৃত্য, কারখানার মজুর, অথবা ছোট ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সপরিবারে সম্পূর্ণ শহরবাসী হওয়া আর্থিক কারণেই সম্ভব ছিল না। এইভাবে নাগরিক জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলার গ্রাম্যসমাজে। বাংলার জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী বিরাট খুদে-জমিদারগোষ্ঠী, বাংলার কৃষক ও কারুশিল্পী, শহরের বার্তা গ্রামে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। এমনকি গ্রামের দরিদ্র কৃষক-ক্ষেতমজুর যাঁরা শহরে এসে দিনমজুর বা গৃহভৃত্য হয়েছেন, তাঁরাও গ্রামে ফিরে গিয়ে শহুরে জীবনের কত রূপকথাই না গ্রামবাসীর কাছে বর্ণনা করেছেন![৪৪] শহরে সাহেবের খানসামা-খিদমৎগার, নাগরিক অভিজাত-পরিবারের ভৃত্য গ্রামে গেলে মনিবের প্রতিনিধির মতো ব্যবহার করে, গ্রাম্যসমাজে বিশেষ মর্যাদা পায়, গ্রামের লোক পুরনো রামায়ণগান ও কথকতার মতো নগর-জীবনের নতুন রূপকথা ও

কথকতা শোনে। শহরের জীবনযাত্রার হাওয়া নানাপথে, নানারকমের লোকের মুখে মুখে গ্রামে বয়ে যায়। শহরের মন গ্রামের মনের উপর ভর করে। বাংলার গ্রাম শহরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

বাংলার শহর-গ্রামের এই ঘাতপ্রতিঘাতের (urban-rural-interaction) ফলে গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (২০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫):[৪৫] "বিদ্যাদান কার্যের প্রাচুর্য, বাণিজ্যের উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই তিনটিই পল্লীগ্রামের অবস্থা পরিবর্তনের প্রধান কারণ"। দু'টি পরিবর্তনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল মাদকদ্রব্য। "মাদকদ্রব্য সেবনের সমধিক প্রাদুর্ভাব," আর একটি হল "অনেকে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে।" এখন আর গ্রামে "ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দন ও জপহোমাদি" প্রায় দেখা যায় না। "কোশাকুশি ও শালগ্রামশিলা অনেকের বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন।" একেও 'এক্‌সচেঞ্জ ইকনমি'র মাহাত্ম্য বলা চলে।

গ্রামের উপর শহরের প্রভাব নির্ভর করে শহর থেকে গ্রামের দূরত্বের উপর। উনিশ শতকে এই দূরত্বের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট, এমনকি রেলপথে বাষ্পীয় রেলগাড়ি চলাচলের পরেও। শহরের কাছাকাছি গ্রাম এবং শহর থেকে বহুদূরের গ্রামের মধ্যে নাগরিক প্রভাবের ও সামাজিক পরিবর্তন-গতির পার্থক্য ছিল। এই প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন : [৪৬]

> "সহরের নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবও ঘটিয়াছে। সমাজের প্রাচীন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুর্বে যখন গ্রামের মধ্যে দুইচারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক থাকিত এবং অপর সকলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে তাহাদের অধীন থাকিত তখন সমাজের একপ্রকার শৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত, উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক সময়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইত। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে, কেহ কাহারও অধীন বা বশবর্তী নয়। সুতরাং কেহ কাহারও শাসনানুগত নহে। এই কারণে সমাজের অনেক লোক রীতিনীতি সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের যে শাসন ছিল তাহাও ইংরাজী শিক্ষার গুণে ও সহরের বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ পাপ সকল সমাজ মধ্যে অবারিত হইতেছে। নিবারণের উপযুক্ত শাসনশক্তি কাহারও নাই।"

শহরের কাছাকাছি গ্রাম্যসমাজের ভিতরের শাসনশৃংখলার ভিত্‌ ভেঙে গিয়েছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত বা গুণীমানী ব্যক্তির শাসন কেউ আর মান্য

করেন না। অর্থাৎ নাগরিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ গ্রাম্যসমাজেও প্রবেশ করেছে এবং তার তীব্রতা বেড়েছে আর্থিক আত্মনির্ভরতার জন্য। 'সোমপ্রকাশ' দুঃখ করে বলেছেন যে যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা শহরের দোষের সঙ্গে গুণগুলিরও অংশীদার হন, কিন্তু যাঁরা শহরের কাছাকাছি গ্রামে থাকেন তাঁরা শহরের "গুণভাগ না পাইয়া দোষ ভাগই অধিক ভোগ" করে থাকেন। আরও একটি বিষয়ের প্রতি 'সোমপ্রকাশ' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে সমস্ত গ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে, সেখানকার শিক্ষিত বা শহরবাসী লোকরা যখন ছ'মাস-ন'মাস অন্তর একবার করে গ্রামে যান, তখন দীর্ঘকাল গ্রামে থাকেন এবং গ্রামের উন্নতির জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শহরের কাছাকাছি গ্রামের লোক "সপ্তাহের মধ্যে যে একদিন গ্রামে আগমন করেন তাহাও বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের জন্য।"

শহরের কাছাকাছি গ্রাম্যজীবনে আরও একটি নাগরিক প্রতিক্রিয়ার নির্দেশ করেছেন 'সোমপ্রকাশ'। "দূরস্থিত জনপদ সকলের লোকদিগের বিলাস বাসনা অল্প। সামান্য আহার, সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সুখে দিন যাপন করে। কিন্তু সহরের নিকটবর্তী স্থানে নিত্য নূতন নূতন বিলাস সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লোকের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে।" 'সোমপ্রকাশ'-এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। বক্তব্য হল, নাগরিক জীবনযাত্রার মান ও ধরন (consumption-pattern) শহরের কাছাকাছি গ্রামে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে নিত্যনূতন ভোগ্যবস্তুর প্রতি গ্রামের লোকের আকর্ষণ বেড়ে যায়। শহুরে জীবনের পরিবর্তনশীল ফ্যাশানের সঙ্গে গ্রামের লোকও তাল দিয়ে চলতে চায়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় ব্যয়বৃদ্ধি। এই দৃষ্টান্তটিকেও গ্রাম্যসমাজে 'এক্সচেঞ্জ ইকনমি'-র সংঘাতের ফলাফলরূপে উল্লেখ করা যায়।

ইতিহাসের দূত হয়ে, মার্ক্স-এর ভাষায়, ইংরেজরা তাঁদের অজ্ঞাতসারে হিন্দুস্থানের তথা বাংলার সমাজে যে যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তার আভাস 'সোমপ্রকাশ'-এর এই গ্রাম্যজীবনের পরিবর্তন-গতির বিশ্লেষণ থেকে অনেকটা পাওয়া যায়। সামাজিক বিপ্লবের ইন্ধন ইংরেজরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোগাতে বাধ্য হয়েছিলেন, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য। বিপ্লবের ঐতিহাসিক পরিণতির—অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে

ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের উপযোগী বাস্তব আর্থভিত্তি স্থাপন ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু তার এমন কয়েকটি অনুপ্রাণনশক্তি শহরে-নগরে এবং শহর-নগর থেকে গ্রামে তাঁরা সঞ্চারিত করেছিলেন যাতে গ্রামের ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের মূল গড়নটাই বদলে গিয়েছিল। গ্রামের গতানুগতিক জীবনযাত্রাও পরিবর্তনমুখী হয়েছিল। গ্রাম্যসমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের লোকের জীবনযাত্রার নীতি ও আদর্শ, কাজকর্মের রীতি ও পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার আগের মতো আর ছিল না। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছেন (শ্রাবণ ১৭৭৮ শক) :[৪৭]

> "বঙ্গসমাজে দিন দিন যত ইংরাজ জাতির আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রবিষ্ট হইতেছে, ততই আরও দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা ইংরাজ প্রভৃতি সভ্যজাতির নিকট হইতে যত নানাপ্রকার অভিনব সভ্যতার শিক্ষা পাইতেছে, ততই নানাপ্রকারে ইহাদিগের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা আর সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, সামান্য প্রকার বেশভূষায় তুষ্ট হয় না এবং সামান্যরূপ গৃহাদিতে বাস করিয়াও সুখী হয় না, অথচ অতি সামান্য অবস্থায় কাল যাপন করিয়া জীবনধারণ করিবারও ইহাদিগের কোন সাধ্য নাই। জলশূন্য মরুদেশীয় লোকের জলতৃষ্ণা অধিক হইলে যে প্রকার অবস্থা হয়, এক্ষণে এদেশীয় লোকেরও অবিকল তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে।"

এখানেও গ্রাম্যসমাজের উপর টাকার বিনিময়প্রধান অর্থনীতি ও শহরের প্রভাবপ্রতিক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। একথা 'সোমপ্রকাশ'ও বলেছেন। গ্রামের সাধারণ লোকের যখন মের মধ্যে তৃষ্ণার্তের মতো অবস্থা, তখন গ্রামের জমিদাররা কি করেছেন? কালীপ্রসন্ন সিংহ জমিদারদের কলকাতা শহরে বসবাস প্রসঙ্গে লিখেছেন :[৪৮]

> "পাড়াগেঁয়ে দুই-একজন জমিদার প্রায় বারোমাস এখানেই কাটান। হুকুরব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জনদশ বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখ্‌লেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্তিমান মা! বিসর্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত, মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার, পালপার্ব্বণ বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন।

"পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, দুই একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাজীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়ন্তা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোনাগাজীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগল বেশে জ্যাঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেণ্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গি উপস্থিত হয়—পেড়াপিড়ি হলে দেশে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য।"

পল্লীগ্রাম জমিদারদের রামরাজ্য, এবং শহর ঠিক রামরাজ্য না হলেও কতকটা অ্যালিসের আজবপুরীর মতো। গ্রাম্য জমিদারদের শহুরে জীবন-যাত্রার এই বর্ণনায় কিছুটা শ্লেষ-ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা থাকলেও, এর অনেকটাই সত্য। এই জমিদাররা তাঁদের গ্রাম্য রামরাজ্যে নাগরিক প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে বড় 'এজেন্ট' হয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তাঁদের নিজেদেরও শ্রেণীগত চরিত্রের যে কতদূর পরিবর্তন হয়েছিল তা পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ধনতান্ত্রিক জীবনাদর্শের প্রভাব এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

সেকালের গ্রাম্যসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন চারিত্রিক গুণের জন্য। লোভ হিংসা অহংকার মিথ্যাচরণ তাঁদের চরিত্র দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও স্পর্শ করতে পারেনি। নতুন সামাজিক পরিবেশে এই ব্রাহ্মণদের চরিত্রের কি পরিবর্তন হল? 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছেন (১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক):[৪৯]

"ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্য লজ্জার বিষয় যে যে শূদ্রেরা পূর্বে তাঁহারদিগের আজ্ঞাকারি দাস ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্তি হইয়াছেন—ধনসেবার জন্য তাঁহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত অনাদৃত তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনিদিগের উপাসনা আন্তরিক ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছে।...এবম্প্রকার অযোগ্য আচরণ প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহারা সংসারে অধোগামি হইতেছেন, তদ্বিপরীতে অনেক শূদ্র জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা উচ্চপদে আরোহণ করিতেছেন।"

ব্রাহ্মণদের দুর্ভেদ্য দুর্গ পর্যন্ত টাকাসর্বস্ব মানসতার অভিযান এবং অভিযানের ফলে সেই দুর্গের পতনের এই দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যায়, গ্রাম্য-

সমাজের পরিবর্তনের রূপ কি এবং তার গতি কোনদিকে! গ্রাম ও শহর যে সমাজের দু'টি স্বতন্ত্র, পরস্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপ, বাংলার সমাজ সম্বন্ধে এ ধারণা উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসননীতির সংঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা অবশ্য গ্রাম-ও-শহর সম্বন্ধে এই দ্বি-খণ্ডিত দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন প্রত্যয় (dichotomous concept) সমর্থন করেন না, বরং প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উভয়ের মধ্যে প্রবহমান প্রভাবের কথা (rural-urban continuum) বেশি সত্য বলে স্বীকার করেন।[৫০] একথা শুধু ইউরোপীয় সমাজে সত্য নয়, এসিয়ার সমাজেও সত্য—"clearly···the notion that there is an 'urban-rural dichotomy' in Asian countries was hardly tenable···both for the process and the analysis of the developement.'[৫১] বাংলার গ্রাম্যসমাজের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন গ্রাম যে নেই তা নয়, বিশেষ করে উনিশ শতকের যানবাহন-যোগাযোগের (রেলওয়ের পরেও) স্বল্পতার দিনে নিশ্চয় ছিল। আসলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে মেরু-ব্যবধান রচনা না করে একথা বলা যায় যে উভয়ের মধ্যে দৈশিক দূরত্বের উপর নির্ভরশীল প্রভাব-প্রবাহের তারতম্য থাকলেও, কালিক সহাবস্থানের জন্য একেবারে নাগরিক প্রভাববর্জিত গ্রামের কথা প্রায় ভাবা যায় না, এবং ভাবলেও সমাজ-জীবনের দিক দিয়ে তা অবাস্তব বলে মনে হয়। বস্তুতঃ টাকা-বিনিময়প্রধান অর্থনীতির বৈদ্যুতিক প্রবাহ, উনিশ শতকেও, বাংলাদেশের সুদূর পল্লীগ্রামের মানুষের মর্মস্থল পর্যন্ত যে, আঘাত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাস্তবিক ব্রিটিশ শাসকরা অজ্ঞাতসারে বাংলার সমাজ-জীবনে বৈপ্লবিক দূতের কাজ করেছিলেন। প্রাচীন বনেদী জমিদারশ্রেণীর ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে—City capitalist, দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতিকে নতুন চিরস্থায়ী স্বত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদারশ্রেণীতে পরিণত করে—মধ্যস্বত্বভোগীদেরও নতুন জমিদারদের মতো কৃষকদের শোষণ ও পীড়নের অধিকার দিয়ে—ভূমিরাজস্বকে বাণিজ্যের পণ্যের মতো 'স্পেকুলেশন' ও মুনাফার বস্তুতে পরিণত করে—পণ্যফসল নীলের আবাদে যথেচ্ছাচারী নীলকরদের উৎসাহিত করে—

বিনিময়ের বাজারে বিদেশী ব্রিটিশ পণ্যের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় স্বদেশী শিল্প ও কারুবর্গকে উৎখাত ও বৃত্তিচ্যুত করে—নবযুগের নতুন বিনিময়-মাধ্যম টাকার আর্থনীতিক একাধিপত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে, গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে, প্রতিষ্ঠিত করে—বিদ্যা, বাণিজ্য, সামাজিক ক্ষমতা ও মর্যাদা, সমস্তকিছু নতুন টাকার মানদণ্ডে পরিমাপ করার আদর্শ প্রচার করে, ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার পল্লী-সমাজের অস্থিমজ্জায় যে প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়ায় সেকালের জীবনধারার গতির অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছিল। এরকম বহুমুখী নির্বিচার আঘাতের ফলে যদি পরিবর্তন না হয়, বা না হত, তাহলে বুঝতে হবে যে ইংরেজদের আগমনের আগে বাংলার জনসমাজের কোন জীবন্ত অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না, শুধু সেটা একটা মৃতের কঙ্কালের মতো ছিল। কিন্তু তা মনে করার যখন কোন যুক্তি নেই, তখন ব্রিটিশ শাসনের আঘাতে তার পরিবর্তনমুখী গতির কথা ভাবতেও কোন বাধা নেই। সেই গতির রূপ ও দিক নির্ণয় করার চেষ্টা আমরা কিছুটা করেছি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে সামাজিক গতিশীলতার (social mobility) উত্থান-পতন, জোয়ার-ভাঁটা আছে, এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলার গ্রাম্য সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল গতির মধ্যেও এই উত্থান-পতনের তরঙ্গায়িত রূপ দেখা যায়।

নির্দেশিকা

প্রথমে পৃষ্ঠাসংখ্যা, পরে বন্ধনীর মধ্যে সূচকসংখ্যা

১২ (১) J. H. Harington : *An Elementary Analysis of Laws and Regulations,* Calcutta 1814-15, III, 398-400.

১২ (২) Harington, *op. cit,* Ibid.

১৩ (৩) *The Zemindary Settlement of Bengal,* (Z. S. B), Calcutta 1879, I, 64.

১৩ (৪) "The land revenue system taken over by the English was in its main features the creation of Murshid Quli Khan, and it was continued in a more refined but more rigid form under Cornwallis's Permanent Settlement."

—*History of Bengal* (H. B) (Dacca Univ.), II, Ch XXI, 397.

১৪ (৫) H. B, II, 409.

১৫ (৬) H. B, II, 414-15.

Firminger : Fifth Report, *Introduction.*

১৫ (৭) John Shore : Minute of April 1788 in Harington's *Analysis,* II, 233-34

১৫ (৮) James Grant : *Analysis of the Finances of Bengal,* Fifth Report 1812

১৬ (৯) "He thus created a new landed aristocracy in Bengal whose position was confirmed and made hereditary by Lord Cornwallis".—H. B, II. 409-10

১৮ (১০) *Memoir of the Life and Correspondence of John Lord Teignmouth*, I 25-26 (London 1843)

১৮ (১১) W. W. Hunter : *The Annals of Rural Bengal* (Third ed, London 1868), 56-57 "Before the commencement of 1771, one-third of a generation of peasants had been swept from the face of the earth and a whole generation of once rich families had been reduced to indigence."

"From the year 1770 the ruin of two-thirds of the old aristocracy of Lower Bengal dates."—56-57.

১৯ (১২) *Second Report of Select Committee*, 1808-12, app IX, 103

১৯ (১৩) দ্বারকানাথ প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য।

২০ (১৪) W. W. Hunter : *Bengal M. S. Records, 1782-1807* (London 1894, I, 24-25.

২০ (১৫) Karl Marx : *Notes on Indian History* (Moscow, n. d.) 101.

২১ (১৬) Z. S. B : app. IV

২২ (১৭) বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য়, ১১৭

২৪ (১৮) বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৫ (১৯) Z. S. B., I, 60.

২৫ (২০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, ৮৪-৮৫, ৭৭, ১৩৫

২৫ (২১) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ, ১০৯-১১২, ৮৫-৮৮

২৬ (২২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য়, ১১৩-১৪

২৭ (২৩) "The tenures known by the name of Putnee talooks,.. shall be deemed to be valid tenures in perpetuity according to the terms of engagements under which they are held. They are heritable by their conditions; and it is hereby further declared that they are capable of being transferred by sale, gift, or otherwise, at the discretion of the holder..."

"Putnee talookdars are hereby declared to possess the right of letting out the lands composing their talooks in any manner they may deem most conducive to their interests..."

"If the holder of a Putnee talook shall have underlet in such manner as to have conveyed a similar interest to that enjoyed by himself...the holder of such a tenure shall be deemed to have acquired all the rights and immunities declared in the preceding section to attach to Putnee talooks...the same construction shall also apply in the case of Putnee talooks of the third or fourth degree".

২৮ (২৪) *Bengal Administration Report*, 1872-73, 73

২৮ (২৫) H. Beverley : *Census Report* 1871-72,

২৮ (২৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, ১০৮-১৩২
৩০ (২৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ ; ২১৭-১৮
৩০ (২৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম, ১০২
৩২ (২৯) John Phipps : *A Series of the Principal Products of Bengal :*
No. 1. Indigo : Calcutta 1832, Ch. II, Table XXIV, 59 .
নীল চাষের ও নীল ব্যবসায়ের গোড়ার ইতিহাস এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
৩৩ (৩০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।
৩৭ (৩১) Rural Life in Bengal, London 1866, Letter VIII, 114-136
৩৭ (৩২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য়, ১২৫-১৩২
৩৭ (৩৩) Indigo Papers, Bengal Government Records.
৩৮ (৩৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ, ১৬৮-৭০
৪০ (৩৫) W. H. Thomson : *Census Report of Bengal 1921.*
A. Mitra : *Census Report 1951,* Vol V, Part IA—Report, 412-14.
৪২ (৩৬) বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৫৭
Bonoy Ghose : Traditional Arts. etc (UNESCO Seminar. monograph, R- K. Mission Cnlt. Inst.)
৪২ (৩৭) D. J. McNeile : *Report on The Village Watch of The Lower Provinces of Bengal :* Calcutta 1866, 13
এই রিপোর্টে ম্যাকনীল সাহেব সেকালের ঘাটোয়াল পাইক প্রভৃতি নানারকমের গ্রামরক্ষীদের নিষ্কর ভূসম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের ফলে এবং তার পরিবর্তে নতুন পুলিশ-শাসন প্রবর্তনের ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজে যে বিপর্যয় ঘটেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।
৪৪ (৩৮) Karl Marx : 'British Rule in India'—*New York Daily Tribune*, June 25, 1853- মার্ক্স-এর উদ্ধৃতিগুলি এই প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।
৪৬ (৩৯) Maurice Dobb-এর *Studies in the Development of Capitalism* গ্রন্থের Paul M. Sweezy কর্তৃক আলোচনা : *Science and Society :* New York, Spring 1950.
৪৬ (৪০) Henri Pirenni : *Economic and Social History of Medieval Europe* (N. Y. 1937), 82.
৪৭ (৪১) Paul M. Sweezy : পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ।
Maurice Dobb : *Studies in the Development of Capitalism.* : London 1947
৪৭ (৪২) Karl Marx : *Selected Writings in Sociology and Social Philosophy* : ed. by T. B. Bottomore and M. Rubel, London 1961. 110-12 : উদ্ধৃতিগুলি Capital, Vol I থেকে গৃহীত, Moore & Aveling অনূদিত (১৮৮৭)।
৪৮ (৪৩) P. Sorokin and C.C, Zimmerman : *Principles of Rural-Urban Sociology* (N-Y 1929), 41-48.
৪৯ (৪৪) J. J. Hecht : *The Domestic Servant Class in Eighteenth-Century England* (Lond 1956).
৫০ (৪৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ৪র্থ, ২১৩

৫০ (৪৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ৪র্থ, ২৯৭-৯৯

৫১ (৪৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ২য়, ১৮৪

৫২ (৪৮) কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্শা : কলিকাতা ১৩৪৪, ১১-১২

৫৩ (৪৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ২য়, ৯৮

৫৪ (৫০) John L. Haer : 'Conservatism, Radicalism and the Rural-Urban Continuum' in *Cities and Society*, ed. Hatt and Reiss (N. Y. 1963) 692-97

P. H. Landis : *Rural Life in Process* (N. Y 1948) 127-28.

৫৪ (৫১) Urban-Rural Differences in Southern Asia : UNESCO Research Centre, Delhi, 1964, 24-27.

২

নাগরিক সমাজের রূপায়ণ

আধুনিক সমাজের অন্যতম ঐতিহাসিক গতি হল নগর-রূপায়ণের (urbanisation) দিকে। ইংরেজ আমলের উষাকালে গঙ্গাতীরের কয়েকটি গ্রামে বাংলা দেশে এই নাগরিক রূপায়ণ ও জনকুণ্ডলায়ণের (urban agglomeration) সূচনা হয়। গ্রামগুলির নাম—কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সূতানুটি। পরে অবশ্য আরও অনেক গ্রাম এই তিনটি গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের বৃহৎ মেট্রোপলিস কলকাতার একদা উৎপত্তিকেন্দ্র ছিল এই তিনটি গ্রাম।[১]

জোব চার্নক নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী ১৬৫৫-৫৬ সালে ভারতবর্ষে আসেন। এই জোব চার্নক ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রথম শাসনকেন্দ্র ও রাজধানী কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু চার্নক আজও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কাছে একজন অজ্ঞাতকুলশীল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম ভিত্-স্থাপয়িতা যিনি তাঁর বংশবৃত্তান্ত আজও অজ্ঞাত। কর্নেল ইউল বলেছেন যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে জোব চার্নক "memorable figure", কিন্তু তা সত্ত্বেও "he figures as yet in no Biographical Dictionary, nor have I been able to ascertain anything regarding his origin."[২] ১৬৫৭ সালের ১২।১৩ জানুয়ারি তারিখের Court Book-এ জোব চার্নক নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তারিখের কোম্পানির খাতায় সেকালের হস্তাক্ষরে লেখা আছে—

Job Charnock, Fourth, (Salary) 20£.

বাংলাদেশে কাশিমবাজার কুঠির জুনিয়ার কর্মী ছিলেন চার্নক। পরে পাটনা-কুঠির 'চীফ' নিযুক্ত হন। ১৬৮১ সালে বাংলাদেশ যখন মাদ্রাজ-কুঠির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়, তখন চার্নক ভেবেছিলেন তিনি-ই প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হবেন, কিন্তু তা হননি, হেজেস হয়েছিলেন। চার্নক কাশিমবাজার থেকে হুগলির 'চীফ এজেন্ট' নিযুক্ত হন এবং সেখানে নবাবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ

ও সংঘর্ষ বাঁধে। নবাবের শত্রুতায় বাধ্য হয়ে তাঁকে হুগলি ছাড়তে হয় এবং গঙ্গাতীরে কুঠি স্থাপনের জন্য নতুন একটি নিরাপদ স্থানও সন্ধান করতে হয়। উলুবেড়িয়া-হিজলি-চট্টগ্রাম—এর মধ্যে যে-কোন একটি স্থান চার্নকের স্থাপনের জন্য নির্বাচিত হতে পারত, কিন্তু তা হয় নি। সুতানুটিতে চার্নক দু'বার ঘাঁটি করেছেন, দু'বারই ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অবশেষে ২৪ আগস্ট ১৬৯০ সালে চার্নক তৃতীয়বার সুতানুটির ঘাটে অবতরণ করেন এবং সামরিক ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সুতানুটিতেই তিনি কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের স্থির সিদ্ধান্ত করেন। চার্নকের সিদ্ধান্তের ফলে এই ঐতিহাসিক দিনেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের, এবং কলকাতা শহরের, ভিত্ স্থাপিত হয়।

উইলসন বলেছেন—"The fact remains that Charnock, and Charnock alone, founded Calcutta"[৩] কথাটা ব্রিটিশ ইতিহাসের দিক থেকে অনেকটা সত্য, কিন্তু চার্নক যদি প্রধানত তাঁর কুঠির সামরিক নিরাপত্তার কথা, অথবা শুধু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করতেন, তাহলে হয়ত চট্টগ্রামের ইাতহাস হত কলকাতা শহরের ইতিহাস। উলুবেড়িয়া বা হিজলিতে কুঠি স্থাপিত হলেও কোন অসুবিধা হত না, কিন্তু তা হয় নি বা চার্নক তা করেননি। ভেবেচিন্তেই করেননি। সামরিক আত্মরক্ষা ও বাণিজ্যিক সুযোগ—দু'দিকের কথা চিন্তা করেই গঙ্গার পূর্বতীরে সুতানুটি চার্নক আদর্শ স্থান মনে করেছিলেন। ফার্মিঙ্গার বলেছেন: "In selecting Sutanuti as the place for the chief settlement in Bengal, Job Charnock made his choice deliberately and well."[৪] ভাগীরথীর পশ্চিমে সপ্তগ্রাম ছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বন্দর, পূর্ববঙ্গে ছিল চট্টগ্রাম। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি সরস্বতী নদীর দান। ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ থেকে সরস্বতী নদী দ্রুত মজে যেতে থাকে এবং তার উপর দিয়ে বাণিজ্যপোত চলাচলের অসুবিধা হয়। তার আগে পর্তুগীজ বণিকরা গঙ্গার পশ্চিমতীরে বেতোড়ে (বর্তমানে ব্যাঁটরা) বাণিজ্যের বেশ বড় একটি বাজার গড়ে তুলেছিল। গোয়া থেকে যখন তারা বাণিজ্যের পণ্য কেনাকাটা করতে আসত তখন সাময়িকভাবে বাজার বসত বটে, যেমন গ্রামের হাট-বাজার বসে, কিন্তু সেটা বেশ বড় বাজার এবং বাড়ন্ত বাজার।[৫] সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার ফলে যখন সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি হতে থাকে, তখন বাঙালা বণিকদের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গার পশ্চিমদিক থেকে

পূবদিকে এসে নতুন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই বণিকদের মধ্যে প্রধান হলেন বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ ও বসাকরা। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল বর্তমানে অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হলেও বাঙালী শেঠ-বসাকরাই বাণিজ্যকেন্দ্র বড়বাজারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এবং একদা তাঁদের প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে যথেষ্ট ছিল। তার ঐতিহাসিক নিদর্শনস্বরূপ আজও বড়বাজারে শেঠ-বসাকদের পূর্বপুরুষদের ঘর-বাড়ি ও তাঁদের নামে কিছু রাস্তা-ঘাট দেখা যায়।[৬]

ষোড়শ শতকে কোন সময় শেঠ-বসাকদের পূর্বপুরুষরা গঙ্গার পূর্বতীরে এসে নতুন বসতি স্থাপন করেন। এই নতুন বসতির নাম গোবিন্দপুর। ময়দানের যে অঞ্চলে ফোর্ট উইলিয়ম অবস্থিত, সেখানে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। শেঠ-বসাকদের পারিবারিক গৃহদেবতার নাম 'গোবিন্দ', তাঁর নামে গোবিন্দপুর। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বাঙালী শেঠরাই—জনার্দন শেঠ, বারাণসী শেঠ, বৈষ্ণবদাস শেঠ, শ্যামসুন্দর শেঠ—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সব চেয়ে বড় দাদ্‌নি-বণিক ছিলেন। তাঁতবস্ত্র ছিল কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যের পণ্য এবং তাঁতিদের টাকা দাদন দিয়ে এই বস্ত্র সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব বহন করতেন শেঠরা। বাংলাদেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিদের উপর তাঁদের যে কতখানি প্রভাব ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রভাব ও সম্মানের কারণ আছে। চার্নকের আগেই পূর্বতীরের উত্তরভাগে তাঁরা সূতীবস্ত্রের কেনাবেচার জন্য একটি বড় বাজার স্থাপন করে ছিলেন। এই সূতার হাট বা বাজারের জন্য কলকাতার গঙ্গাতীরের উত্তরাঞ্চলের নাম হয়েছিল সূতানুটি। শেঠদের একটি বাগানও ছিল এই অঞ্চলে, নাম শেঠবাগান। এই বাগান প্রসঙ্গে সরকারী নথিপত্রে (১৭০৭) উল্লেখ করা হয়েছে—"আমরা এই টাউন অধিকার করার আগে থেকেই তাঁরা (অর্থাৎ শেঠরা) এই জমির মালিক ছিলেন।"[৭] এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইংরেজরা আসার আগে কলকাতার এই অঞ্চলে বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা বসতি ও সূতাবস্ত্রের বাজার স্থাপন করেছিলেন। তন্তুবায় সমাজে তাঁদের প্রতিপত্তির জন্য তাঁরা কোম্পানির দাদনি-বণিক হয়েছেন। কলকাতার তাঁতবস্ত্রের বাজারে ১৭৪১ সালের পর থেকে প্রায় শেঠদের বংশানুক্রমিক আধিপত্য একাধিক কারণে কমে যেতে থাকে।[৮] কিন্তু কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠার আদিপর্বে বাঙালী শেঠ-

বসাকদের কীর্তিকথা তাতে লোপ পায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের দিক থেকে জোব চার্নকই অবশ্য কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাসের দিক থেকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার গৌরব শেঠ-বসাকদেরও খানিকটা প্রাপ্য।

১০ জানুয়ারি ১৬৯৩ চার্নকের মৃত্যু হয়। তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অভিযোগ করেছেন। সূতানুটিতে আসার পর প্রায় আড়াই বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্যকুঠির প্রসারের জন্য বিশেষ কিছু কাজ করেননি। এদেশের লোকজনদের সঙ্গে মিশে তিনি নাকি প্রায় আধা-বাঙালী আধা-ইংরেজ হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতা শহরের উৎপত্তিকেন্দ্র, চার্নকের আমলে, কয়েকটি মাটির কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ধর্ম বলেও তাঁরা বিশেষ কিছু মানতেন না। অধিকাংশ ইংরেজ 'মার্চেন্ট' ও 'ফ্যাক্টর' 'black wives' বিবাহ করে মনের আনন্দে জীবন কাটাতেন।[৯] ১৬৯৬ সালে শোভা সিং ও রহিম খাঁর বিদ্রোহের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান-হুগলি অঞ্চলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে নবাব (ইব্রাহিম খাঁ) ইংরেজ ফরাসী ও ডাচদের কলকাতা চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় সামরিক বাহিনী ও দুর্গ গঠন করে আত্মরক্ষার অনুমতি দেন। ১৬৯৮ সালে জুলাই মাসে মাত্র ১৬,০০০ টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা কলকাতা-গোবিন্দপুর-সূতানুটির জমিদারী উপস্বত্ব লাভের অধিকার পান। এই অধিকার পাওয়ার পর স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের রামচাঁদ রায়, মনোহর রায় প্রভৃতির কাছ থেকে সামান্য ১৩০০ টাকা নজর দিয়ে ইংরেজরা কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সূতানুটির জমিদারী-উপস্বত্ব হস্তান্তরিত করে নেন।[১০]

কলকাতার নগর-রূপায়ণ এইভাবে আরম্ভ হয়। সূতানুটির গঙ্গাতীরের কয়েকটি মাটির কুঁড়েঘর কলকাতার প্রথম নাগরিক কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ইংরেজদের কলকাতার জমিদারীলাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ফার্মিঙ্গারের ভাষায়—"By this acquisition the Company obtained for the first time a legal position within the Mughal Empire"—এবং মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে মাত্র তিনটি গ্রামের আইনসঙ্গত জমিদারী অধিকার লাভের পর, ধীরে ধীরে ২৪-পরগণার জমিদারী (১৭৫৭), চট্টগ্রাম (১৭৬০), বর্ধমান ও মেদিনীপুর এবং অবশেষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ

(১৭৬৫) খুব স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত পরিণতি বলা চলে ('final logical completion'—Firminger)।[১১] শুধু যে বণিকের মানদণ্ড, কবির ভাষায়, রাত পোহালে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল তা নয়, মধ্যে বেশ কিছুদিন ইংরেজরা এদেশের জমিদারদের সামন্তদণ্ডও ধারণ করেছিলেন। ইংরেজদের জমিদারী-কালেই কলকাতার আদিপর্বের (অষ্টাদশ শতক) নাগরিক রূপায়ণ হয়েছে বললে ভুল হয় না। যথোচিত পদমর্যাদা ও ক্ষমতাসহ কোম্পানির কর্তারা নতুন একটি অফিস সৃষ্টি করলেন, 'Jimmidar'-এর (জমিদার) পদ। এই জমিদারই হলেন কলকাতার 'কলেক্টর'। ১৭০০ সালে র‍্যালফ শেল্‌ডন কলকাতার কলেক্টর নিযুক্ত হন। হলওয়েলও কলকাতার জমিদার ছিলেন। আজ পর্যন্ত কলকাতা শহরে এই কলেক্টরের পদটি লোপ পায়নি। প্রায় ২৬৮ বছরের ঐতিহ্য কলকাতার কলেক্টর বহন করছেন, এবং একদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে কলকাতার সুদীর্ঘ নাগরিক রূপায়ণের সবচেয়ে প্রবীণ ঐতিহাসিক সাক্ষী বলা যায়।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের আগে, এমন কি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগেও, কলকাতার নগর-রূপের বেশ খানিকটা বিকাশ হয়েছিল। ১৭০৬ সালে কলকাতার কৌন্‌সিল কোম্পানির ডিরেক্টরদের লিখে জানান: "Revenues especially the Rent to the Towns increase yearly, people flocking there to make the Neighbouring Jemindars envy them."[১২] কৌনসিলের এই রিপোর্টের মধ্যে কলকাতা প্রসঙ্গে 'people flocking there' উক্তিটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতা শহরের (যদিও শহর তখনও হয়নি) প্রতি লোকের টান এত বেশি যে স্থানীয় দেশীয় জমিদাররা প্রত্যেকে নতুন ইংরেজ জমিদারকে হিংসা করতে আরম্ভ করেছেন। ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি ও জমিদারীর কেন্দ্রস্থল কলকাতা অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই যে চারিদিকের গ্রাম্যসমাজের উপর তার আকর্ষণশক্তি বিস্তার করেছিল তা কৌন্‌সিল ও ডিরেক্টরদের বিবৃতির আদানপ্রদান থেকে বোঝা যায়।[১৩]

কলকাতার নাগরিক গতি

কলকাতার এই আকর্ষণশক্তির কারণ কি? নগরের ক্রমবিকাশ ও নাগরিক রূপায়ণের জন্য আর্থনীতিক কর্মজীবনেরও বিস্তার ও বিকাশ প্রয়োজন।

কিন্তু কলকাতার মতো বিদেশী আর্থস্বার্থের অধীন ঔপনিবেশিক শহরে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের বিস্তার বা বিকাশ সম্ভব হয়নি। তাই ইউরোপের স্বাধীন শিল্পপ্রধান শহর-নগরের মতো কলকাতার নগর-রূপায়ণের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক গতি লক্ষ্য করা যায় না। কলকাতার মতো ঔপনিবেশিক শহরের রূপায়ণ যতটা আধুনিক যন্ত্রশিল্পভিত্তিক নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক নানাবিধ কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতামত এই :

> "In many cases, the cities in less developed areas were established in a colonial period as centres of administrative control and of export of raw materials···Such cities have always attracted a number of rural residents···looking for jobs (in trades, construction, services and administration) for small amounts of cash, city goods, excitement, or independence from their families; or more generally pursuing the hope of changing their status in life."[১৪]

ইংরেজদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার প্রলোভনে চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে লোকজন কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করতে আরম্ভ করেছিল। এই প্রলোভন তখনকার দিনে কিছুটা অদম্য হওয়াই স্বাভাবিক। কাজকর্মের মধ্যে, অষ্টাদশ শতকে, প্রধান ছিল এইগুলি :

(ক) নির্মাণ ও গঠন (Construction)
(খ) চাকরি (Service)
(গ) ব্যবসাবাণিজ্য (Trade and Commerce)

এই তিন ধরনের কাজেরই সুযোগ ছিল কলকাতা শহরে বেশি, একেবারে অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে ব্রিটিশ আমলের শেষ বিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত। গঠন-নির্মাণের কাজের মধ্যে পুরনো ও নতুন কেল্লা তৈরির কাজ, জঙ্গল বাগান ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজ, রাস্তাঘাট তৈরির কাজ—এইগুলি ছিল প্রধান। অর্থাৎ নগরনির্মাণের আদিপর্বে কুলিমজুরের কাজের চাহিদা ছিল অত্যধিক, দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে ইংরেজের অধীন শহর কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হবার একটা বড় কারণ। আর কিছু না হোক, কলকাতায় এলে কুলিমজুরের একটা কাজ পাওয়া যেত। কলকাতায় ইংরেজদের কর্মকেন্দ্র ও
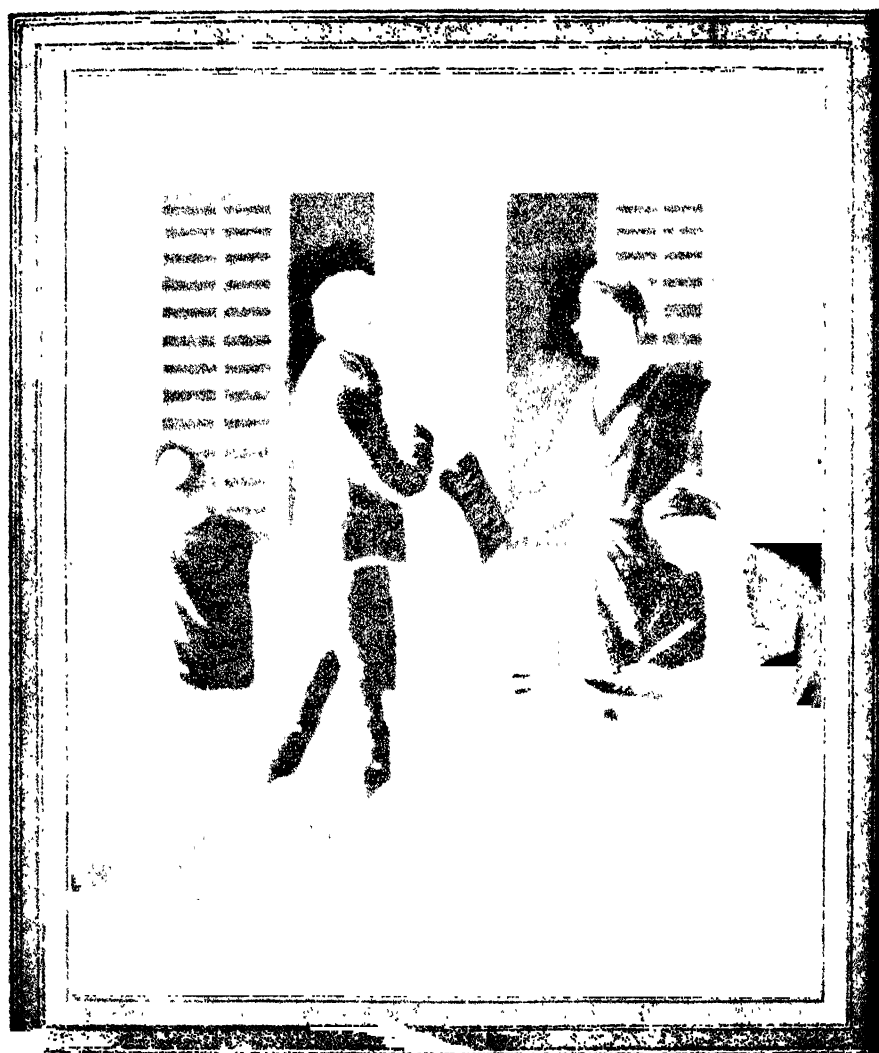
এদেশীয় কেরানি (ডয়লি অঙ্কিত

বসতিকেন্দ্র ক্রমে যত প্রসারিত হতে থাকে, তত আশপাশের গ্রামের জলাজঙ্গল পুকুর প্রভৃতি পরিষ্কার করার সমস্যা দেখা দেয়। একাজ গ্রাম্য চাষী ও মজুরদের পক্ষেই ভাল করে করা সম্ভব। তাই গ্রাম থেকে চাষী ও মজুররা শহরে এসে কুলিমজুরের কাজ করেছে। নির্মাণের কাজে সর্দার সরকার ঠিকাদার প্রভৃতির কাজও একস্তরের মধ্যবিত্তকে শহরের দিকে আকর্ষণ করেছে। নানা রকমের ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগসুবিধাও বর্ধিষ্ণু কলকাতা নগরের বড় আকর্ষণ ছিল। ইংরেজদের অধীনে কেরানী সরকার মুচ্ছুদ্দি বেনিয়ান দালাল গোমস্তা দেওয়ান মুনশী দোভাষী প্রভৃতির কাজ, বহুরকমের গৃহভৃত্যের কাজ, গ্রামাঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষীদের নগরাভিমুখে আকর্ষণের আরও একটি বড় কারণ। বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, গ্রাম থেকে কলকাতামুখী জনপ্রবাহের কারণ শিল্পায়ন (industrialisation) নয়, নানারকমের চাকরি, বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা ও হঠাৎ-লভ্য টাকার প্রলোভন। নগদ টাকা (cash), শহরের নতুন নতুন ভোগ্য-সামগ্রী আমোদ-প্রমোদ-উত্তেজনা, বেশ খানিকটা ব্যক্তিস্বাধীনতা, জীবনের একটা নতুন মর্যাদাবোধ ও অস্তিত্ববোধ—এইগুলি ছিল কলকাতার অদম্য আকর্ষণ। অবশ্য সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল টাকার।

কলকাতা শহরের সবচেয়ে বড় টান ছিল নগদ টাকার টান। সামান্য নগদ টাকার লোভে গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতা শহরে এসে অনেকে অজস্র টাকার মালিক হয়েছেন এবং নতুন শহরে নতুন অভিজাতশ্রেণীতে (new urban aristocracy) পরিণত হয়েছেন। তাঁদের কথা আমরা পরে বলব। কিন্তু ঔপনিবেশিক শহর কলকাতায় কুলি-মজুর-ভৃত্যের কাজের যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল বলে দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামের লোকও শহরে এসে আশ্রয় খুঁজেছে। এই গতিকে "the transfer, through migration, of rural poverty to the cities" বলা যায়, এবং এই কারণেই দেখা যায় যে—"The overflow of rural distress into urban districts is an outstanding characteristic of economically underdeveloped countries."[১৫] অষ্টাদশ শতকে শিল্পায়নের প্রশ্ন অবশ্য প্রধান ছিল না এবং পরাধীন শহরে অন্যান্য কাজ-কর্ম যা আকর্ষণীয় হতে পারে তা ইংরেজের জমিদারী ও বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি দেখে এই আকর্ষণ যে অন্তত স্থায়ী ছিল তা কিছুটা অনুমান করা যায়—

১৭১০ (হ্যামিল্টন)	১২,০০০
১৭৫২ (উইলসন)	২০৯৭২০
(হলওয়েল)	৪০৯০৫৬ (বেশি মনে হয়)
১৭৯৬ (মার্টিন)	৫০০০০০
১৮০২ (পুলিশ কমিটি)	৬০০০০০
১৮১৪ (জাস্টিস হাইড)	৭০০০০০

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতার লোকসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। একাধিক ঐতিহাসিক কারণে এই লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। তিনটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(ক) অষ্টাদশ শতকের চল্লিশ থেকে (১৭৪২-৪৪) মারাঠাদের আক্রমণ।

(খ) এই সময় (১৭৪৫) আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তাফা খাঁর বিদ্রোহ এবং রঘুজী ভোঁসলের পুনর্বার বাংলাদেশ আক্রমণ, মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত (২১ ডিসেম্বর ১৭৪৫)।

(গ) ১৭৫৬-৫৭ সালে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ এবং পলাশীর যুদ্ধ।

এই তিনটি ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের ফলে গঙ্গার পশ্চিমতীর ও চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে এদেশীয় বণিক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা অনেকে ইংরেজদের অধীনে নিরাপদে বসবাস ও কাজকর্ম করার জন্য পূর্বতীরে নতুন কলকাতা শহরে চলে আসেন। "Stories about the security and protection of life and property afforded by the English factory at Calcutta were on all men's lips. The fair dealings of the English traders with Hindu merchants, and the latter's faithfulness to the Company became the talk of the day."[১৬] বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ এই সময় দিল্লীতে জানিয়েছিলেন যে গঙ্গার পশ্চিমতীরে প্রত্যেকটি জেলায় বর্গীর হাঙ্গামার ফলে এমন ক্ষতি হয়েছে যে একটি কড়িও কারও কাছ থেকে আদায় করার উপায় নেই।[১৭] ইংরেজদের কলকাতা কুঠির সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার কথা লোকের মুখে তখন চারিদিকে রটে গিয়েছিল। হিন্দু বণিকদের প্রতি ইংরেজদের উদার ব্যবহারের কথাও লোকমুখে প্রচারিত হয়েছিল। এই সব যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপর্যয়কে 'push factor' বলা যায়, যেমন শহরের নিজস্ব আকর্ষণশক্তিকে 'pull factor' বলা হয়। গ্রামাঞ্চল থেকে এই সমস্ত বিপর্যয়ের সঙ্গে আরও একটি বড় বিতাড়নশক্তি

(push factor) যুক্ত হয়েছিল—সেটি হল ইজারাদারী পদ্ধতিতে (farming) ইংরেজদের রাজস্ব-সংগ্রহের নানারকমের পরীক্ষা ও অবশেষে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। তার ফল হয়েছে রাজস্বের ইজারাদারীর সুবিস্তৃত স্তর-বিন্যাস, মধ্যস্বত্বভোগীর বিস্তার, কৃষকদের চরম লাঞ্ছনা ও দুর্দশা এবং গ্রাম্যসমাজের দ্রুতগতি অবনতি। তারপর থেকে শহরমুখী গ্রাম্য জনপ্রবাহ, সাময়িক স্থিতি-নিরাপত্তাসন্ধানী গ্রাম্য দুঃখকষ্টের প্রবাহে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক, এবং সত্যই তাই হয়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা শহরে এই "overflow of rural distress" একই ধারায় চলে এসেছে দেখা যায়। আজ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ পর্বে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে কলকাতা শহরের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী, হেস্টিংসের চেষ্টায়, কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। হেস্টিংসের আগে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্মকেন্দ্র। হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় বিচারালয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করে কলকাতাকে ব্রিটিশ আমলের প্রথম রাজধানী-শহরে পরিণত হবার ঐতিহাসিক সুযোগ করে দেন। কলকাতার সিদ্ধান্ত জানিয়ে হেস্টিংস ডিরেক্টরদের লেখেন :[১৮]

> "Another good consequence will be the great increase of inhabitants and of wealth in Calcutta, which will not only add to the consumption of our most valuable manufactures imported from home, but will be the means of conveying to the natives a a more intimate knowledge of our customs and manners and of conciliating them to our policy and government."

রাজস্ববিভাগ ও বিচারবিভাগ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হলে ফলাফল ভালই হবে। কলকাতার জনসংখ্যা ও সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং ইংলণ্ডের শিল্পজাত মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের ভোগেচ্ছাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, হেস্টিংস পরিষ্কার ইঙ্গিত করেছেন যে কলকাতা শহর রাজধানী হলে এদেশীয় লোকদের ইউরোপীয় রীতিনীতি ও আচারব্যবহার শিক্ষা দিতে এবং ব্রিটিশ শাসননীতির পক্ষপাতী করে গড়ে তুলতে অনেক সুবিধা হবে।

অর্থাৎ হেস্টিংসের ইচ্ছা ছিল কলকাতা শহরকে পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি ও ভাবধারার একটি মিলনতীর্থে পরিণত করা। হেস্টিংসের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল। ফার্মিঙ্গার ঠিকই বলেছেন যে "If Job Charnock is to be considered the founder of Calcutta as a seat of trade, Hastings may be regarded as the founder of Calcutta as the political capital of the British Empire."[১৯]

হেস্টিংসের আমলে কলকাতার শাসনবিভাগ ও বিচারালয় স্থাপিত হবার পর প্রকৃত ইংরেজী শিক্ষা না হলেও, ইংরেজী ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়। দেওয়ান রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী-বাংলা অভিধানে লিখেছেন: "In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary." রামকমল সেন সুপ্রিমকোর্টের প্রতিষ্ঠাকালে এ দেশের লোকদের ইংরেজী ভাষাচর্চার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। তখন ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের সাহেব অ্যাটর্নি ও অ্যাডভোকেটদের বাঙালী কেরানীরা। তাঁরা ইংরেজীতে আবেদনপত্রাদি লিখতে পারতেন, এবং কাজকর্ম চালানোর মতো yes-no-verywell প্রভৃতি কিছু ইংরেজী শব্দের স্টকিস্টও ছিলেন। এই বাঙালী কেরানীবাবুরা একটি নোটখাতার মধ্যে ইংরেজী শব্দ লিখে লিখে 'স্টক' করে রাখতেন। যাঁর যত বেশি স্টক থাকত তিনি তত বড় ইংরেজী পণ্ডিত বলে খাতির পেতেন। কয়েকজনের নামও রামকমল এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রামরাম মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ, রামকমলের ভাষায়, "was the first who made any considerable progress in the English language." অনেক বাঙালাবাবু তখন তাঁর ছাত্র ছিলেন। রামরামের পর রামনারায়ণ মিত্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু এবং আরও পরে ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত ও আরও দু'একজন "were celebrated as complete English scholars." ইংরেজীর এই 'complete scholar'-দের বিদ্যা তখন একখানি spelling book ও word bookএর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এঁরা নিজেরা স্কুল করে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন এবং বাঙালী ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক বেতন নিতেন ৪৲ টাকা থেকে ১৬৲ টাকা পর্যন্ত।

সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে রামকমলের এই ইংরেজী শিক্ষার বিবরণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমপাদে ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন ইংরেজী শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি রামকমল অল্পকথায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নবযুগের বাংলার নতুন নগরকেন্দ্রিক বিদ্বৎসমাজে সামাজিক রূপের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তখনকার দিনে মাসিক ৪৲টাকা থেকে ১৬৲ টাকা বেতন দিয়ে কাঁরা তাদের ছেলেদের শিবু দত্ত, ভবানী দত্ত, রামলোচন নাপিত অথবা তাঁদের সমসাময়িক ফিরিঙ্গি আরাতুন পিত্রুশ, শেরবোর্ন, ড্রামণ্ড, হুটেমান প্রভৃতির স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য পাঠাতেন? কলকাতা শহরের নতুন অভিজাত সমাজের লোকরা। হেস্টিংসের ভাবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হয়েছিল তা এদেশীয়দের ইংরেজীচর্চার এই কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি ও ভাবধারার অন্যতম ঘাত-প্রতিঘাতের কেন্দ্র হবে কলকাতা শহর, এই ছিল হেস্টিংসের আশা। সে আশা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। হেস্টিংস নিজে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। সংস্কৃত ও ফারসী চর্চায় তাঁর শাসনকালে চার্লস উইলকিনস, উইলিয়াম জোন্‌স, কোলব্রুক-এর মতো ইংরেজী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহী হয়েছিলেন। ১৭৮৪ সালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুসন্ধান ও বিদ্যানুশীলনের জন্য বাংলাদেশে কলকাতা শহরে ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’ স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই কলকাতা শহর বাংলাদেশের তো বটেই, ভারতের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হেস্টিংসের দ্বিতীয় ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকেনি, বিদেশী ব্রিটিশ পণ্য আমদানিরও সবচেয়ে বড় বন্দর ও বাজার হয়ে উঠেছিল কলকাতা। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকেই হয়েছিল। বিদেশী জাহাজের ভীড় দেখে তা বোঝা যায়।[২০]

সাল	জাহাজ	মোটপণ্য (টন)
১৭৭০	৯৫	২৩,৮৩১
১৭৭১	৮১	২৫,০৭০
১৭৭২	১১৫	২৬,১৮৪
১৭৭৩	১৬১	৩৭,০৩৭
১৭৭৪	১৪৭	৪৩,৯৩৫

অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উভয়েরই প্রাণকেন্দ্র হল কলকাতা। অষ্টাদশ শতকের

মধ্যেই প্রধানত ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতার নাগরিক রূপায়ণের পথ প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করে দিয়েছিলেন।

মধ্যযুগীয় নগরবিন্যাস

অষ্টাদশ শতকে কলকাতা শহরের নাগরিক রূপায়ণে মধ্যযুগীয় নগরবিন্যাসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডেও শহরের আধুনিক যুগোপযোগী রূপায়ণ সম্ভব হয়নি, লণ্ডন শহরও তখন অনেকটা মধ্যযুগের শহরের মতোই ছিল। জনসনের যুগের ইংরেজ যাঁরা কোম্পানির চাকরি নিয়ে অথবা ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে আসতেন, তাঁরা অধিকাংশই শিক্ষাদীক্ষা বা সুরুচির দিক থেকে নিম্নস্তরের লোক ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। জোব চার্নক থেকে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত এইধরনের ইংরেজই এ দেশে বেশি এসেছেন। হেস্টিংসের আমল থেকে এই ধারার কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেটা খুব সামান্য পরিবর্তন। উনিশ শতকে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালের (১৮২৮-৩৫) আগে পর্যন্ত এই ধারার উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং ইংরেজ শাসকদের দিক থেকেও বলা যায় যে অষ্টাদশ শতকে অন্তত তাঁরা মধ্যযুগ বা সামন্তযুগের প্রতিনিধি হয়ে এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের সেই সামন্তযুগের মনোভাবই কলকাতার নাগরিক রূপায়ণে আঠারো শতকে প্রতিফলিত হয়েছে।

কোম্পানির ডিরেক্টররা ১৭৫৫ সালে এবং ১৭৫৮ সালে কলকাতার কর্মকর্তাদের জানান যে তাঁদের একমাত্র স্বার্থ হল দেশীয় তাঁতীদের যতরকম উপায়ে সম্ভব উৎসাহ দিয়ে কলকাতা শহরের সীমানার মধ্যে বসবাসের জন্য নিয়ে আসা এবং তাঁদেরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখা। তা করতে পারলে কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টে লাভ হবে যথেষ্ট এবং তাঁতিদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে বস্ত্র উৎপাদন করাতে পারলে মধ্যবর্তী দালাল বা দাদনি-বণিকদের উপর নির্ভর করতে হবে না—

> "As it is evidently for our interest therefore to encourage not only all the weavers in our bounds, but likewise to draw as many others as possible from all countries to reside under our protection, we shall depend on your utmost efforts to accomplish the same···wherein we shall find a great share of your investment made under your own eyes"[২১]

কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টের* প্রধান বস্তু ছিল বস্ত্র, তাই তাঁতিদের নতুন কলকাতা শহরে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কিন্তু বাঁধা চাকরির মতো ইংরেজদের অধীনে কাজ করার সুবিধা হবে মনে করে তন্তু-বণিকরা কলকাতা শহরে এসে বসবাস করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁতিরা না হলেও অন্যান্য কারুশিল্পীরা অষ্টাদশ শতকে কলকাতা শহরে এসে বসবাস করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের বছরে, ১৭৫৭ সালে, কোম্পানির কর্মকর্তারা কলকাতার একটি নগর-পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয় যে তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, দরজী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কলকাতার এক-একটি অঞ্চলে ('district') বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রত্যেক বৃত্তিজীবীগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভিতর থেকে একজন করে 'headman' বা 'চৌধুরী' নির্বাচন করবে এবং এই চৌধুরী হবে সেই গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া অভাব-অভিযোগ নিবেদনের প্রতিনিধি। টাউনের আঞ্চলিক মণ্ডলরা তাঁদের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলের বৃত্তিজীবীদের কাজকর্মের একটি করে মাসিক হিসেব কলকাতার জমিদারের কাছে দাখিল করবেন। কার কি রকম মজুরী হবে না-হবে তা জমিদার ঠিক করবেন এবং প্রত্যেক বৃত্তিজীবীকে তার কাজের (trade) জন্য লাইসেন্স নিতে হবে, লাইসেন্সের অর্থমূল্য হবে মাসিক মজুরীর একচতুর্থাংশ।[২২]

এ হল পুরোপুরি মধ্যযুগের নগরবিন্যাস। তখনকার কলকাতার ইংরেজ জমিদারের মস্তিষ্কপ্রসূত নগরপরিকল্পনা আধুনিকতার পথে এর চেয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে কাল্পনিক গুজরাট নগর পত্তনে জাতিবিন্যাসের কথা মনে হয়—

> তেলি বৈসে শত জনা কার ঘানী কার ঘনা
> কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
> কামার পাতিয়া শাল কোদালী কুঠার ফাল
> গড়ে টাঙ্গী অঙ্গবেধী শেল ॥…
> কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পেটে
> মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।
> শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
> ভুনী ধুতি খাদি বুনে গড়া ॥ ‥

* ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি আমাদের দেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যা কেনাকাটা করতেন তাকে 'investment' বলা হত।

'গুজরাট' কথার বদলে 'কলিকাতা' বসালে অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ জমিদারদের নগরপত্তনের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের নামের মধ্যে আজও সেই অষ্টাদশ শতকের বৃত্তিভিত্তিক বসতিবিন্যাসের রূপটি লুকিয়ে আছে। যেমন :

কুমোরটুলি	কুম্ভকারপ্রধান অঞ্চল
কলুটোলা	কলুপ্রধান অঞ্চল
জেলিয়াটোলা (পাড়া)	জেলিয়াপ্রধান অঞ্চল
ডোমটুলি	ডোমপ্রধান অঞ্চল
গোয়ালটুলি	গোয়ালাপ্রধান অঞ্চল
আহিরীটোলা	বিহারী গোয়ালাপ্রধান অঞ্চল
কসাইটোলা	কসাইপ্রধান অঞ্চল
পটুয়াটোলা	পটুয়াপ্রধান অঞ্চল
শাখারীটোলা	শাখারীপ্রধান অঞ্চল
কাঁসারীপাড়া	কাঁসারীপ্রধান অঞ্চল
কামারপাড়া	কামারপ্রধান অঞ্চল ইত্যাদি

এই আঞ্চলিক বৃত্তিকেন্দ্রিক বসতিবিন্যাস ছিল অষ্টাদশ শতকে ইংরেজের জমিদারী কলকাতার নাগরিক রূপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেশ বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অন্তত কলকাতার নাগরিক সমাজের অনুভূমিক গতি (horizontal mobility) যাই থাকুক না কেন, ঊর্ধ্বাধ গতি (vertical mobility) বিশেষ ছিল না। গ্রাম্যসমাজের মতো কুলবৃত্তিকেন্দ্রিক (caste-occupational) সমাজের রূপ কলকাতার দৈহিক গড়নের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। এই কুলবৃত্তিগত সংস্কার যে কতদূর গভীর ছিল তা শেঠ-বসাকদের ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। আগেই বলেছি, বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা কলকাতার প্রাচীনতম বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় তাঁরা কোম্পানির দাদনি-বণিক ছিলেন। ১৭৪৮ সালের নথিপত্রে উল্লেখ আছে :[২৩]

"The Sets being all present at the Board inform us that last year they dissented to the employing of Fittick Chund, Gosserain, Occore and Otteram, they being of a different caste and conseqneutly they could not do business with them, upon which

account they refused Dadney, and having the same objection to make this year, they propose taking their shares of the Dadney if we should think proper to consent therto."

'Fittick Chund' (ফটিকচাঁদ ?), 'Gosserain' (গোঁসাই ?), 'Occore' (অক্রূর ?) ও 'Otteram' (আত্মারাম ?) নামে চারজন লোককে দাদন দেওয়ার বিরোধী ছিলেন শেঠরা, কারণ তাঁরা জাতিতে তন্তুবণিক নন। যাঁরা তাঁদের স্বজাতি নন তাঁদের সঙ্গে কোন বাণিজ্য করতে তাঁরা রাজী ছিলেন না। শেঠদের এই মনোভাবের জন্যই কলকাতা শহরে তন্তুবণিকদের নিয়ে এসে বসবাস করানো ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ বস্ত্র-দাদনের ব্যবসাটা শেঠরা ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে করতে সম্মত ছিলেন না। সেইজন্য দেখা যায়, শেঠদের আধিপত্য ও প্রভাব কমে যাওয়ার পর (১৭৫০-৫২) ইংরেজরা তন্তুবণিকদের কলকাতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনাও যে বিশেষ সার্থক হয়নি, তার প্রমাণ কলকাতায় অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের স্বতন্ত্র 'টোলা' 'টুলি' ও 'পাড়া' গড়ে উঠলেও 'তাঁতিপাড়া' বা 'তাঁতিটোলা' বলে কিছু ছিল না। অথচ বাংলাদেশের গ্রামে 'তাঁতিপাড়া'র অভাব নেই। বাংলার সকল শ্রেণীর কারু-জীবীদের মধ্যে তন্তুবণিকদের সঙ্গেই ইংরেজ বণিকদের স্বার্থসংঘাত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি এবং তার জন্য বাঙালী তন্তুবণিকদের ক্ষতিও যা হয়েছিল তা অন্য কোন বৃত্তিজীবীর হয়নি। কলকাতার আদিপর্বে কুলবৃত্তিগত আঞ্চলিক রূপায়ণে তাই তন্তুবণিকদের কোথাও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দেখতে পাওয়া যায় না, অন্তত আঞ্চলিক নামের মধ্যে তার চিহ্ন নেই।

উনিশ শতকের কলকাতা

কলকাতার নাগরিক রূপের বহিরাঙ্গিক বিন্যাস উনিশ শতকের গোড়া থেকে আরম্ভ হয়। ওয়েলেসলি তার সূত্রপাত করেন। নগর উন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাবে ওয়েলেস্‌লি বলেন (১৬ জুন ১৮০৩):

"The increasing extent and population of Calcutta, the capital of the British Empire in India and the seat of the Supreme authority, require the serious attention of Government. It is now become absolutely necessary to provide permanent means of promoting the health, the comfort, and convenience of the numerous inhabitants of this great Town."

এই প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়েলেসলি ৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি একটি উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করেন, কিন্তু তা বিশেষ কার্যকর করতে পারেননি। ১৮১৪ সালে এই কমিটি লোপ পেয়ে যায় এবং ১৮১৭ সালে গভর্নমেণ্ট নতুন লটারি কমিটি নিয়োগ করেন। আগেকার কমিটি লটারির টাকায় কলকাতার টাউন হল, বেলেঘাটা খাল, এলিয়ট রোড ও ট্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি হয়। কমিটি আর কি করেন তা সঠিক জানা যায় না, কারণ তাঁদের কার্যবিবরণ কিছু পাওয়া যায়নি। কলকাতার নাগরিক উন্নয়নের কাজ নতুন লটারি কমিটি উৎসাহ নিয়ে আরম্ভ করেন। এই কমিটির উদ্‌যোগে ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও স্কয়ার, হেস্টিংস ও হেয়ার স্ট্রীট, ম্যাংগো লেন ও কসাইতলা, ক্রীক রো, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, উত্তরদিকে কলেজ স্কয়ার, দক্ষিণদিকে পার্ক স্ট্রীট প্রভৃতি নতুন করে তৈরি হয় ও চওড়া করা হয়। ১৮১৭ থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত লটারি কমিটির হাতেলেখা যে কার্যবিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায়, কলকাতা শহরের মধ্যভাগ, পূর্বভাগ ও উত্তরভাগে উন্নয়নের কাজ বেশি হয়, দক্ষিণভাগে চৌরঙ্গি অঞ্চলের খানিকটা উন্নতি হলেও তার বাইরে বেশিদূর পর্যন্ত বিশেষ কিছু করা হয়নি। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কলেজ স্ট্রীট, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, এই নামের ট্যাঙ্ক ও স্কয়ার, আমহার্স্ট স্ট্রীট ও মির্জাপুর স্ট্রীট, নিমতলা থেকে হেস্টিংস পর্যন্ত স্ট্র্যাণ্ড রোড প্রভৃতি পথঘাট তৈরি করা হয়। ১৮৩৬ সালে অকল্যাণ্ডের 'ফিভার হসপিটাল কমিটি' ও 'মিউনিসিপাল ইন্‌কোয়ারি কমিটি'র বিশাল রিপোর্টে কলকাতার পথঘাট উন্নয়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা পাওয়া যায়। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল, উত্তর ও মধ্য কলকাতায় বড় বড় রাস্তাগুলিকে প্রসারিত করে, এবং সংযোগকারী মাঝারি ও ছোট ছোট রাস্তা তৈরি করে সংযুক্ত করে দেওয়া। এত পরিকল্পনার পরেও দেখা যায় যে ১৮৮৮ সালে কলকাতার প্রায় ১৮২ মাইল মোট পাকা রাস্তার মধ্যে ৩৫ মাইল আন্দাজ সংকীর্ণ অলিগলি ছিল, যা খোলা নালা-নর্দমা বুজিয়ে করা হয়েছে। বর্তমান দক্ষিণ কলকাতা তখন শহরতলি অঞ্চল ছিল। ১৮৮৮-সালের পর কলকাতার এই দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকাংশ বড় বড় রাস্তা তৈরি হয়—যেমন ল্যান্সডাউন রোড, হরিশ মুখার্জী রোড, হাজরা রোড, চেতলা রোড, স্টার্নডেল রোড, জজকোর্ট রোড, গোপালনগর রোড, কালীমন্দির রোড, উডবার্ন রোড ইত্যাদি, উত্তরে গ্যাস স্ট্রীট ও আপার সারকিউলার রোডও এই সময়ে তৈরি হয়।

১৮৩৪-৩৫ সাল থেকে কলকাতায় পাথর বাধানো (stone-metalling) রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ সালে দেখা যায় যে প্রায় ১৩২ মাইল বাঁধানো রাস্তার মধ্যে ৮২ মাইল পাথর এবং ৫০ মাইল ইট দিয়ে বাঁধানো। 'ম্যাকাডামাইজড' (tar-macadam) রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয় বিশ শতকে—১৯১৩-১৪ সাল থেকে।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত কলকাতা শহরে শুধু তেলের আলো জ্বলত। চৌরঙ্গির রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলে ১৮৫৭ সালে ৬ই জুলাই তারিখে। সেই গ্যাসের আলোর শিখাও খুব উজ্জ্বল ছিল না। সাদা আলোর বার্নার (incandescent burner) কলকাতার গ্যাসের আলোয় জ্বলতে থাকে বিশ শতকের গোড়া থেকে ১৯০১ সালে। রাস্তার আলোর এই কাহিনীটুকু থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় গ্রামের মতো কলকাতা শহর সন্ধ্যার পরে ঘুমিয়ে না পড়লেও, কর্মব্যস্ততা বিশেষ কিছু তার থাকত না। তেলের মিটমিটে আলোয় রাতের নাগরিক জীবন স্ফুরিত হয় না। তারপর যে গ্যাসের আলো জ্বলল তাও উজ্জ্বল নয়, তাতে জীবনের পথে পর্যাপ্ত আলোকসম্পাত হয় না। তা না হলেও একথা ঠিক যে উনিশ শতকের মধ্যে, পথঘাট-ট্যাঙ্কস্কয়ার-ড্রেন-আলো প্রভৃতির বহিরাঙ্গিক বিন্যাসে, কলকাতা শহর একটা বিশিষ্ট নাগরিক রূপ ধারণ করেছিল।

কলকাতার নাগরিক উন্নয়ন সম্পর্কে লটারি কমিটির যে অপ্রকাশিত হাতেলেখা কার্যবিবরণ (১৮১৭ থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত) আছে, তা পাঠ করলে কলকাতার মতো পরাধীন ঔপনিবেশিক শহরের (এবং খানিকটা অন্যান্য শহরেরও) ক্রমবিকাশের আদিস্তরের কতকগুলি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে।[২৪] লোকজনের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারের ফলে শহরের সীমানা প্রসারিত হতে থাকে পাশাপাশি গ্রামগুলিকে একটি পর একটি গ্রাস করে এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে। কলকাতার প্রধান প্রশাসনিক-বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থল (administrative-commercial core) ছিল পুরাতন 'কুঠি' ও 'ফোর্ট' অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গাতীর থেকে ট্যাঙ্ক স্কয়ার, হেস্টিংস স্ট্রীট, ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চল। এইটাই ছিল কলকাতার 'ডাউন-টাউন এরিয়া'—"The hub of the city is the down-town area of maximum land rent, where···the basic functions of finance and government are carried on."[২৫] এই অঞ্চল থেকে উত্তরে, দক্ষিণে ও পুবে কলকাতার ধীরে

ধীরে প্রসার হতে থাকে উনিশ শতকে। লটারি কমিটির রিপোর্টে (১৮১৭-২১) শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের জমির মূল্য থেকে এই প্রসারের গতির আভাস খানিকটা পাওয়া যায় :

অঞ্চল	জমির মূল্য	
হেস্টিংস স্ট্রীট, ম্যাঙ্গো লেন	১০০০৲/১২০০/১৫০০/ টাকা	ডাউন-টাউন অঞ্চল
ট্যাঙ্ক স্কয়ার, ব্যাঙ্কশাল	৬০০৲/৮০০৲ টাকা	ডাউন-টাউন অঞ্চল
ধর্মতলা	৩০০৲ টাকা	
জানবাজার	২৫০৲ টাকা	
বৌবাজার	২০০৲ টাকা	
ফ্রি স্কুল স্ট্রীট	২০০৲ টাকা	
সিমলা	১৫০৲ টাকা	
মির্জাপুর	১৫০৲ টাকা	
এনটালি	১২৫৲ টাকা	
ক্যামাক স্ট্রীট	৫০৲ টাকা	

এই জমির মূল্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কলকাতা শহরের 'ডাউন-টাউন' অঞ্চল কোন্‌টি। তারপর ধর্মতলা-জানবাজার-বৌবাজার-ফ্রিস্কুল স্ট্রীট অঞ্চল বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এই অঞ্চলের জমির মূল্য (৩০০ থেকে ২০০ টাকা কাঠা) লটারি কমিটির পথঘাটের উন্নয়নের পর প্রায় তিন-চার গুণ বেড়েছে। ১৮২০ সালের একটি 'মিনিটে' বলা হয়েছে—"The value of ground in Calcutta generally rises in proportion to its contiguity to a great thoroughfare..."[২৬] বড় রাস্তার কাছাকাছি জমির দাম কলকাতা শহরে বেশি। উন্নয়নের পর সাধারণত ১০০ টাকা কাঠার জমি ৩০০ টাকায় বিক্রি হয় এবং তাতে কমিটির প্রতি কাঠায় ১০০ টাকা লাভ থাকে, অর্থাৎ কাঠা প্রতি ১০০ টাকা উন্নয়নের জন্য খরচ হয়। ধর্মতলা-বৌবাজার অঞ্চলের উন্নয়নের পর জমির দাম গড়ে তিন-চার গুণ বেড়ে যায় অর্থাৎ ২০০/২৫০ থেকে ৬০০/৮০০/১০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। ওয়েলিংটন স্কয়ার তৈরি হয় এই সময়ে—"... that you will be pleased to designate the new Square in the Dhurumtollah under the name of Wellington

Square."[২৭] চৌরঙ্গি অঞ্চল তখন পুরোপুরি গ্রাম্য ছিল। চৌরঙ্গির উন্নয়নের জন্য কমিটি এই অঞ্চলের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

"The greatest part of the tract in question is covered with ranges of small huts situated nearly in close contiguity to one another, and occupied by the very lowest descriptions of the natives···The native huts are as numerous and as fully occupied as in any other portion of the city···With respect of Europeans lying in its vicinity, the Board observe, that however offensive the effluvia from the tanks and privies must occasionally prove to them, the houses are never from these cause left unoccupied···the total destruction of huts and the appropriation of the ground now occupied by them for large buildings would unquestionably add considerably to the comfort and agreeableness of the neighbourhood and to the beauty of the city".[২৮]

বেশ ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল চৌরঙ্গি। তবু কলকাতায় ইউরোপীয়ানদের বসতিকেন্দ্র এই সময় ক্রমে যে চৌরঙ্গি অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছিল তা বোঝা যায়। গ্রামবাসীদের নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে, তাদের কুঁড়েঘর বাগানপুকুর সমস্ত ধ্বংস করে, চৌরঙ্গির গ্রামাঞ্চলের জমি সাহেবদের বসবাসের জন্য দখল করা উচিত, একথা পরিষ্কার করে লটারি কমিটি বলেছেন। চৌরঙ্গি থেকে দক্ষিণে চক্রবেড়ে পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের জমিদারী বেশির ভাগ ইংরেজরাই ভোগ করতেন। ক্যামাক সাহেবের (যাঁর নামে ক্যামাক স্ট্রীট) অনেক ভূসম্পত্তি ছিল এই অঞ্চলে। প্রায় ২৫০ বিঘা জমি ১৮২০ সালে, ১০০০৲ বিঘা হিসাবে, ক্যামাক সাহেবের কাছ থেকে কেনার প্রস্তাব করেন লটারি কমিটি। ভবিষ্যতে এই অঞ্চল কলকাতায় ইউরোপীয়ানদের বসতিকেন্দ্র হবে বলে এই প্রস্তাব করা হয়।[২৯] কলকাতা শহরের বহিরাঙ্গিক প্রসার কি উপায়ে হয়েছে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। সাধারণত দেখা যায়, উনিশ শতকে পথঘাটের উন্নয়নের পর কলকাতায় জমির মূল্য তিন-চারগুণ বেড়েছে। বর্তমানে কলকাতার মেট্রোপলিটন প্রসারের যুগে প্রধানত জমির 'স্পেকুলেটাররা' এই উপায়ই অবলম্বন করেছেন, তবে উন্নয়নের পর সাধারণত প্রতি বিঘার মূল্য প্রতি কাঠায় ধার্য করে তাঁরা অন্তত বিশগুণ মুনাফা করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তার

চেয়েও বেশি মুনাফা করতে দেখা যায়। তার কারণ, উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, বসতজমির চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হার বর্তমানের তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল, তাই জমির মালিকদের মুনাফার লালসা বর্তমানের মতো বীভৎস সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে নি। অবশ্য তখনকার টাকার বাজার-মূল্য বিচার করলে জমির মালিকরা, কলকাতা শহরের প্রসারের সুযোগ নিয়ে যে খুব কম মুনাফা করেছিলেন তা বলা যায় না।

কমিটির কার্যবিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কলকাতা শহরের উন্নয়নের কাজে প্রচুর সংখ্যায় কুলিমজুরের প্রয়োজন হয়েছে। কলকাতার রাস্তা তখন খোয়া দিয়ে তৈরি হত, এবং খোয়া তৈরি করা হত ইট ভেঙে। হাতে ভাঙা হত, কোন যন্ত্র ছিল না। খোয়া ভাঙার মজুরী ছিল প্রতি ৩৬০০ ইটের জন্য দু' টাকা করে, এক লক্ষ ইটের জন্য মজুরী লাগত ৫৫৷/০।[৩০] এর থেকে অনুমান করা যায়, কত হাজার হাজার কুলিমজুর প্রয়োজন হয়েছে কলকাতার খোয়াবাঁধানো রাস্তা তৈরির জন্য। কলকাতার নাগরিক বিস্তারের জন্য যারা উৎখাত হয়েছে তারা এবং কলকাতার কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষিজীবী ও কারুশিল্পীরা তখন নতুন শহর কলকাতায় এসেছে এই দিনমজুরের কাজের জন্য। শুধু খোয়াভাঙা কাজ নয়, কলকাতায় তখন মজুরের কাজের অভাব ছিল না। অধিকাংশই নগর পত্তনের কাজ। খোয়াভাঙা, বনজঙ্গল পরিষ্কার করা, শত শত এঁদো পুকুর, খাল-নালা মাটি কেটে ভর্তি করা, আবাদের নিচু জমি মাটি ফেলে বসতজমি করা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা—এরকম আরও অনেক কাজ ছিল কুলিমজুরের। মাটি কেটে খাল-নালা ভর্তি করার জন্য কুলিদের মজুরী দেওয়া হত মাসিক ৩৷০ করে অর্থাৎ দৈনিক মজুরী দু'আনার কিছু কম। 'ডিঙাভাঙা খাল' বুজিয়ে রাস্তা তৈরি করার সময় (বর্তমান ক্রীক রো) ২২০ জন কুলি নিয়োগ করা হয়েছিল, তার জন্য প্রতিমাসে তাদের মজুরী দিতে হত ৭৫০ টাকা।[৩১] লটারি কমিটির এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে উনিশ শতকে কলকাতার নাগরিক উন্নয়নের কাজের জন্য 'non-productive proletariat' কুলিমজুরের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিল্প কারখানার মজুরের তুলনায় এই দিনমজুরের সংখ্যা ছিল কলকাতায় অনেক বেশি। ঔপনিবেশিক শহরের বিদেশমুখী অর্থনীতির এই পরিণতি স্বাভাবিক।

লটারি কমিটির বিবরণ থেকে আরও অনেক টুকরো খবর পাওয়া যায় যা কলকাতার ইতিহাসের দিক থেকে 'ইণ্টারেস্টিং'। যেমন নবাব মীরজাফর বর্তমান ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে গঙ্গাতীরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাসাদে বাস করতেন। নবাবের এই প্রাসাদ ও সংলগ্ন সমস্ত জমি লটারি কমিটি এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দখল করেন। এই সময় নবাবের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করা হয়।[৩২] বর্তমান ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট অঞ্চলে শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ারের বাড়ি ও অনেক জমি ছিল। তখনকার শহরের অন্যতম ধনী রামদুলাল দে এই অঞ্চলে অনেক জমির মালিক ছিলেন। জমির লেনদেন সম্পর্কে রামদুলাল দে ও ডেভিড হেয়ারের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদানও হয়েছিল। এই অঞ্চলের উন্নয়নের সময় ডেভিড হেয়ার অনেক জমি কিনেছিলেন— তার মোট মূল্য ধার্য হয়েছিল ৩৮,৯৩৭ ||৶২। কমিটির সেক্রেটারি ট্রটার সাব-ট্রেজারারকে একটি চিঠিতে লেখেন (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২১) :[৩৩] "I am directed by the Lottery Committee to transmit to you the accompanying sum of sicca Rupees Thirtyeight thousand nine hundred and thirty seven, eleven annas and two pies, received from Mr. David Hare in payment of ground sold to him in the vicinity of Bankshall and to request that you will carry the sum to the credit of the Lottery Committee in their account with the General Treasury". এছাড়া ৬১০০০৲ টাকা দিয়ে ডেভিড হেয়ার এই অঞ্চলে আরও তিনখণ্ড জমি লটারি কমিটির কাছ থেকে কিনেছিলেন।[৩৪] শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার যে বিরাট ধনীব্যক্তি ছিলেন এবং কলকাতা শহরে তাঁর প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল তা লটারি কমিটির এরকম কয়েকটি টুকরো খবর থেকে জানা যায়।

আঠারো শতকের গোড়া থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরের দৈনিক ক্রমবিকাশের ধারা, লোকসংখ্যা ঘরবাড়ি, পথঘাট প্রভৃতির বৃদ্ধির হার দেখে কিছুটা বোঝা যায়। টাউন কলকাতায় ১৭১০ সালে লোকসংখ্যা ছিল ১২০০০, ১৯০১ সালে হয় ৫৭৭, ০৬৬। ১৮৫০ সালে কলকাতা শহরে একতলা পাকাবাড়ির সংখ্যা ছিল ৫৯৫০, দোতলা ৬৪৩৮, তিনতলা ৭২১, চারতলা ১০, পাঁচতলা ১। ১৯০১ সালে বাড়ির সংখ্যা হয় যথাক্রমে ২২১৭৫,

১২৯৭৬, ৩১০৪, ২৯৮, ২১। হিন্দুদের সংখ্যা ১৭১০ সালে ৮০০০ থেকে ১৯০১ সালে ৩৮৬৫০২ হয়, মুসলমানদের সংখ্যা হয় ২১৫০ (১৭১০) থেকে ১৫২, ২০০ (১৯০১), ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা হয় ২৫০ (১৭১০) থেকে ৯৫৬৭ (১৯০১)। উনিশ শতকের শেষ পাদে রাস্তাঘাট, আলো ও গাড়িঘোড়ার সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় মোট ৮২ মাইল পাথর বাঁধানো ও ৫০ মাইল খোয়া বাঁধানো রাস্তা ছিল, ১৯০১ সালে এই বাঁধানো রাস্তা যথাক্রমে ১০৩ মাইল ও ১৬৫ মাইল হয়। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় গ্যাসের আলো ও তেলের আলো ছিল ৯৮৬ ও ৭০৪, ১৮৭৬ সালে হয় ২৭২০ ও ৭১৭, ১৯০১ সালে হয় ৬৮১১ ও ২২৯৫। ১৯০১ সালে ১০৬৬৯ ঠেলাগাড়ি ও গরুগাড়ি এবং ৮৭৯৬ ঘোড়াগাড়ির সংখ্যা হয়, এর মধ্যে ৫২৪ গাড়ি 'প্রাইভেট'। ১৮৭৬ সালে গাড়ির সংখ্যা এর অর্ধেকেরও কম ছিল।[৩৫] প্রায় দু'শো বছরের কলকাতা শহরে পাঁচলক্ষ লোকের আগমন, এবং রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি গাড়িঘোড়া আলো ইত্যাদির প্রসারণের এই গতি বর্তমানের গতির তুলনায় অনেক মন্থর মনে হয় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাল ও কলকাতার আকর্ষণের কথা বিচার করলে আঠার-উনিশ শতকের নাগরিক রূপায়ণের এই গতি একেবারে মন্দগতি বলে মনে হয় না।

সেকালের সাময়িকপত্র থেকে কলকাতার এই আঙ্গিক অগ্রগতি ও তার সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৭ বৈশাখ ১২৫৭) ঘোড়াগাড়ি ও ঘোড়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন :

দুই অশ্বে যোজিত চারি চাকার গাড়ী	৬৭৬
এক অশ্বে যোজিত	১৬৮৯
ছেকড়া ও অন্যান্য গাড়ী	১৩৯১
দুই চাকার গাড়ী	৮৬৪
সোয়ারি পনি ঘোড়া	৪২৬
গাড়ীটানা বড় ঘোড়া	২৮৫০
গাড়ীটানা টাট্টু ঘোড়া	২০০৩

কলকাতার জনপথে 'Commit no nuisance' বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে লোকজনের উপর পুলিশের যে উৎপাত আরম্ভ হয়, 'সংবাদ প্রভাকর' সে সম্বন্ধে লিখেছেন (১২ চৈত্র ১২৫৮) : "নগরের মধ্যে কি উৎপাত হইল, এক মূত্র সূত্র

ধনিকগৃহে আমন্ত্রিত সাহেবদের আপ্যায়নে বাইজীনৃত্য

(ডয়িলি অঙ্কিত)

লইয়া পুলিসের কর্তারা কি ফ্যাসাৎ করিয়া তুলিলেন, যেখানে যেখানে শুনা যাইতেছে অমুক ব্যক্তি নরদমার ধারে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছিল তাহাকে চৌকিদার ও সারজন আসিয়া ধৃত করিল, অনেকেই বলেন এই প্রস্রাবে অমুকের অপমান, অমুকের জরিমানা, অমুকের ঘোড়দৌড়, অমুক ব্যক্তির কানমলা প্রভৃতি প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছে, গত দিবস আমারদিগের পল্লীতে বিদ্যালয়ের দুইটি বালক হেদুয়ার পূর্বদক্ষিণ ধারের নর্দমায় মূত্র ত্যাগ করিতেছিল, তদ্দৃষ্টে রাজদূতেরা অনায়াসেই তাহারদিগে তেরিমেরি বাক্যে অপমানকরত হস্তধারণ পূর্বক রাস্তা দিয়া লইয়া গেল···।" পরে এ বিষয়ে 'প্রভাকর' আরও লিখেছেন (১৭ শ্রাবণ ১২৫৯): "চৌর্য্যাদি দূষণাবহ ব্যাপার দমনে দশের নিকট যশের ভাজন হইতে না পারিয়া পুলিস মূত্রক্ষান্তি কার্য্যে যত্নারূঢ় হইয়া বুঝি প্রতিপত্তি লাভের সূত্রপাত করিতেছেন।···আমারদের এই এক ভারি আশঙ্কা হইতেছে, যদি বিশেষ কারণবশতঃ ইংরাজীটোলায় যাইয়া ঐ মহাপাপ কর্মেতে আসক্ত হইতে একান্তই বাধ্য হই তবে আমারদের কি দুর্দশা ঘটিবেক।" রাস্তার ধারে গাড়ি-ঘোড়া রাখা নিয়েও কলকাতার লোকের উপর পুলিশ অনেক অত্যাচার করেছে। 'প্রভাকর' লিখেছেন (২৩ আশ্বিন ১২৫৯): "ভদ্রলোকেরা শকটারোহণে কোন স্থানে গমন করিয়া যদ্যপি রাস্তার ধারে শকট রাখিয়া যান, তবে ভেড়িওয়ালা মেড়ুয়াবাদী চৌকিদারেরা কোচম্যান অথবা সহীসকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সেই গাড়ি লইয়া যাইতে বলে, তাহাতে কোন আপত্তি করিলে চৌকিদার মারিতে উদ্যত হয়, গাড়ি ধরিয়া স্টেসিয়ানে লইয়া যায়, এই নিয়ম প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়াছে।" শহরের ট্যাক্স বাড়ছে, কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছে না, লোকের দুঃখকষ্ট বাড়ছে। 'প্রভাকর' লিখেছেন (৩০ বৈশাখ ১২৬০): "ধূলার নিমিত্ত রাজপথে গমনাগমন করা যায় না, নরদমার পচা গন্ধে বিবিধ প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, এদিকে টেক্সের দায়ে প্রতি দিবস দুঃখি লোকদিগের হাঁড়ি, কলসি, ঝ্যাঁটা, কুলা পর্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইতেছে···।" পাশাপাশি গ্রামগুলি গ্রাস করে কলকাতা শহরের সীমানা কিভাবে প্রসারিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে 'প্রভাকর' লিখেছেন (৫ কার্তিক ১২৬০): "ভবানীপুর, কালাঘাট, চক্রবেড়ে, শিবাদহ, ইটালি, বৈঠকখানা, বরাহনগর, কাশীপুর, চিৎপুর, পাকপাড়া প্রভৃতি গ্রামসকল নগরভুক্ত হইবেক।"[৩৬]

শহরের গাড়িঘোড়ার উপর ট্যাক্স ধার্য হবে বলে গরুর গাড়ির

গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করে এবং তাদের সঙ্গে মুটেরাও যোগ দেয় (১৮৪৯)। 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছেন (২৬ জুন ১৮৪৯): "কলিকাতা নগরীয় গাড়িঘোড়া প্রভৃতির টাক্স হইবে, ইহাতে গোশকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে···মুটেরাও গাড়োয়ান দিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়োয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি গবর্নর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি এই টাক্স ক্ষমা হয়··।" কলকাতা শহরের লোকসংখ্যা ও গাড়িঘোড়া বৃদ্ধির ফলাফল প্রসঙ্গে 'ভাস্কর' লিখেছেন (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬):[৩৭]

> "কলিকাতা নগরে পূর্বাপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাণিজ্য কার্য্যেরও উন্নতি হইতেছে তাহাতে গো-গাড়ির ভাগ অধিক হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালিরা ইংরাজী রীতি ব্যবহারের অনুগত হইয়াছেন তদ্ধেতুক অনেকে পাল্কী ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া গাড়ি ব্যবহার করিতেছেন, প্রতিদিন গাড়িতে গাড়িতে নগরীর পথ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নগর মধ্যগত বড় রাস্তা ও গলী পথ সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তাহা প্রায় গাড়িতেই পুরিয়া যায়, পথিকেরা চলিতে পথ পায় না, যাহারদিগের গাড়িতে সবল ঘোটক যোজিত থাকে তাঁহারাও সম্পূর্ণ বেগে ঘোটক চালাইতে ক্রটি করেন না, সেই বেগে অনেক পথিক মারা পড়ে, বহু লোকের হস্তপদাদি ভঙ্গ হইয়া যায়,···সারথিরা পথে স্থান থাকিতেও পথিকদিগের গাত্রোপরি গাড়িঘোড়া চালাইয়া দেয়, নগরবাসী লোকেরা সর্বদা সন্তর্পণে গমন করেন, পল্লিগ্রামস্থ লোকসকল যাহারা পূর্বে কখনও কলিকাতায় আইসে নাই তাহারাই অগ্রে গাড়ি চাপা পড়ে···।"

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার এই বিবরণ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরের বাস্তবচিত্র বলা যেতে পারে। নাগরিক বাস্তবতার কুশ্রী দিকের আভাস এই বিবরণের ভিতর থেকে খানিকটা পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নয়। বস্তি-জীবন কলকাতার নাগরিক সমাজের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে। মনে হয় অষ্টাদশ শতক থেকেই এই বস্তির উৎপত্তি হয় এবং উনিশ শতকে কলকাতার দেহের উপর ক্ষতস্থানের মতো অনেক বস্তি গজিয়ে ওঠে। লুইস মামফোর্ড বলেছেন: "Slum housing for a large part of the population, not simply for beggars, thieves, casual labourers and other outcasts, became the characteristic mode of the growing seventeenth century city."[৩৮] সপ্তদশ শতকে পাশ্চাত্ত্য শহরে যে কারণে

বস্তির বিকাশ হয়েছিল, ঠিক সেই কারণে কলকাতা শহরে হয়নি। পরে উনিশ শতকে ইউরোপে কারখানাশিল্প ও শিল্পনগরের প্রতিষ্ঠার ফলে নগরজীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে যে কারখানা ও বস্তির বিকাশ হয়েছিল—"The two main elements in the urban complex were the factory and the slum." (Mumford)[৩৯]—বাংলাদেশে কলকাতা শহরে তাও হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতা শহরের প্রান্তে বা আশেপাশে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা যে হয়নি তা নয়, এবং কারখানা ও বস্তি মিলিয়ে নতুন 'urban complex' যে সেইসব শিল্পকেন্দ্রে গড়ে ওঠেনি তাও নয়, তবে কলকাতার ভিতরের বস্তির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিশেষ নেই। কলকাতার বস্তি একদিকে শহরের ইংরেজ জমিদার ও অন্যান্য বাঙালী জমিদারদের জমিদারী এবং অন্যদিকে শহরের বিপুল ভৃত্যশ্রেণী (domestic servants) ও কুলিমজুরশ্রেণীর 'agglomeration'-এর ফল। গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে কলকাতা শহরের সীমানা যখন প্রসারিত হয়েছে, তখন সেইসব গ্রামের উৎখাত দরিদ্র চাষীমজুররা হয়ত কেউ কেউ গ্রামান্তরে চলে গিয়েছে, সকলে যায়নি। যারা যায়নি তারা সহজেই শহরের উন্নয়নপর্বে ও দৈনন্দিন কাজকর্মে কুলিমজুরশ্রেণীভুক্ত হয়ে গিয়েছে। বাইরের গ্রামাঞ্চল থেকেও গৃহভৃত্য ও কুলিমজুরের কাজের জন্য অনেক লোক শহরবাসী হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই লটারি কমিটির কার্যবিবরণে আমরা দেখেছি, নাগরিক উন্নয়নের কাজে শতকরা প্রায় ৯৫ জন শুধু কুলি-মজুরেরই প্রয়োজন হয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যক কুলিমজুরদের ও ভৃত্যদের শহরের বসবাসের কেন্দ্র হয়েছিল বস্তি।

গ্রামে জমিদারদের যেমন জমিদারী থাকে ও প্রজা থাকে, শহরের বস্তিও তেমনি একশ্রেণীর শহুরে জমিদারের জমিদারীতে এবং বস্তিবাসীরা প্রজায় পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকে কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত বস্তির দৃষ্টান্ত দিলে তা বোঝা যাবে। ক্যামাক সাহেবের বিরাট জমিদারী, বর্তমান ক্যামাক স্ট্রীট থেকে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত, লটারি কমিটি উন্নয়নের জন্য কিনেছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। এই জমিদারীতে প্রজা বিলি করে বস্তিরই পত্তন করা হয়েছিল। এখানেই ছিল 'দক্ষিণ বস্তি'—প্রায় ৯বিঘা ৫কাঠা অঞ্চল জুড়ে—উত্তরে পার্ক স্ট্রীট, পূবে উড স্ট্রীট, পশ্চিমে ক্যামাক স্ট্রীট। ১৮৫৮ সালে কলকাতার কমিশনাররা ৪৫,০০০ টাকা দিয়ে এই বস্তি কিনে নেন উন্নয়নের জন্য। এই

বস্তিতে বাস করত কারা? "It was crowded by huts occupied chiefly by domestic servants and native livery stables and was a great nuisance to the residents within its immediate vicinity."[৪০] বামুন-বস্তি ও মনি-বস্তিও বিখ্যাত বস্তি ছিল। বামুন-বস্তির উত্তরে থিয়েটার রোড ও পুবে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট, পশ্চিমে ক্যামাক স্ট্রীট ও দক্ষিণে সারকিউলার রোড। বস্তির মালিক ছিলেন ব্যারিস্টার পিটারসন। এই বামুন-বস্তির অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে সাহেব জমিদারকে যথেষ্ট টাকা দিয়ে, কলকাতার কমিশনাররা ইংরেজদের বসতিকেন্দ্র তৈরি করেন। মনি-বস্তির মালিক ছিলেন মনিসাহেব (J.W.B. Money)। মনি-বস্তির দক্ষিণে থিয়েটার রোড, পুবে লাউডন স্ট্রীট, পশ্চিমে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট, উত্তরে একটি ট্যাঙ্ক। এই বস্তিও ইউরোপীয়দের বসবাসের জন্য কমিশনাররা দখল করে উন্নয়ন করেন। এই কয়েকটি বস্তির বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে কলকাতা শহরে ইংরেজ ও বাঙালীদের জমিদারী থেকেই বস্তি গড়ে উঠেছে এবং সেই বস্তিতে প্রধানত শহরবাসী ভৃত্য ও মজুররা অতিদীনদরিদ্র প্রজাদের মতো, অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে জীবন যাপন করেছে। চৌরঙ্গি যখন'white town' হয়ে উঠেছে, তখন চৌরঙ্গি অঞ্চলের বস্তিবাসীরা 'black town' অঞ্চলে গিয়ে নতুন বস্তি গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ শহরের বাঙালী রাজা-মহারাজারা ও ধনীরা বস্তি স্থাপন করে কলকাতা শহরেই এক নয়া-জমিদারীর পত্তন করেছেন। "Slum, semi-slum, and super-slum—to this has come the evolution of cities."[৪১] বিখ্যাত নগরবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেস-এর এই উক্তি উনিশ শতকের 'কলোনিয়াল' কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও সত্য হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকে কলকাতা শহরে ইংরেজদের বসতিকেন্দ্র ক্রমে যত চৌরঙ্গির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তত সাদা-কালো, ইউরোপীয়-নেটিভ জাতিবৈষম্যবোধ প্রবল হতে থাকে। আঠার শতকে সাদা-কালোর জাতিগত বর্ণচেতনা তেমন প্রখর ছিল না। আঠার শতকে জনসনের যুগে ইংলণ্ডে প্রধানত দু-রকমের লোক দেখা যেত, একরকম robust ও boorish, আর একরকম thin ও quizzical ধরনের। এই রোবাস্ট ও বুরিশ টাইপ ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানির আমলে রাইটার-ফ্যাক্টর হয়ে যাঁরা এদেশে

আসেন, তাঁদের মধ্যে রাজকীয় ঔদ্ধত্য যত না ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা। তখন যে সমস্ত বাঙালী 'fortune-hunter' কলকাতা শহরে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাঁরাও মোটামুটি রোবাস্ট ও ব্যুরিশ টাইপ ছিলেন। চারিত্রিক সাদৃশ্যের জন্য তখন কোন বর্ণ-বৈষম্যবোধ উভয়ের মধ্যে সচেতন সামাজিক ব্যবধান রচনা করতে পারেনি। তখন বড় বড় বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানবাবুরা নানাবিধ কাজকর্মে সহজেই ইংরেজদের সান্নিধ্য লাভ করতেন এবং দোল-দুর্গোৎসবে নিজেদের গৃহে খানাপিনা ও নৃত্যগীতের আসরে ইংরেজদের সাদরে আপ্যায়ন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। প্রায় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল পর্যন্ত দেখা যায়, ইংরেজ-ভারতীয়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ববোধ প্রখর ছিল না। কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে কেবল যে আমাদের দেশে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক নতুন এক হঠাৎ-অভিজাত জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, এদেশের লোককে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে শাসক-শাসিতের মধ্যে সামাজিক দূরত্ববোধও জাগিয়ে তুলেছিলেন।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজ-ভারতীয়ের এই সম্পর্কের দ্রুত পরিবর্তন হতে আরম্ভ হল। ওয়েলেসলি এলেন খাঁটী রাজকীয় মেজাজ নিয়ে এবং তাঁর চালচলনে হাঁকডাকে ও জাঁকজমকে তার উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেল। লাটভবনে এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা তিনি অনেক কমিয়ে দিলেন। তারপর থেকে উভয় পক্ষের মেলামেশার মধ্যেও সামাজিক সম্পর্কের একটা ভিন্নরূপ ক্রমে প্রকট হতে থাকল। পারস্পরিক সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হল না, তা হতেও পারে না, কিন্তু সেটা নিতান্ত শাসক-শাসিতের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কে পরিণত হল। বিদেশিনী শ্রীমতী গ্রাহাম ১৮১০ সালে কলকাতা শহরে এসে ইংরেজ ও এদেশীয়দের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: "The distance kept up between the Europeans and the natives....is such that I have not been able to get acquainted with any native family....every Briton appears to pride himself on being outrageously a John Bull."[৪২]

শাসক-শাসিতের এই মনোভাব ও বর্ণবৈষম্যবোধ স্বভাবতঃই কলকাতা

শহরের বসতিবিন্যাসে প্রতিফলিত হল। 'নেটিভ টাউন' 'ব্ল্যাক টাউন' এবং 'ইংলিশ টাউন' 'হোয়াইট টাউন' শহরে গড়ে উঠল। ভৌগোলিক ব্যবধানের মধ্যে জাতিগত ও মনোগত ব্যবধান বাস্তব রূপ ধারণ করল। এই সাদা ও কালো টাউনের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অর্থনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ মূলধন, উদ্যম ও কর্মকুশলতা যেমন এদেশে স্বাভাবিক কারণে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ রচনা করেছিল, পরিপার্শ্বের দেশীয় অর্থনীতির সঙ্গে যেমন তার কোন সংযোগ ছিল না, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইংরেজসমাজ ও বাঙালীসমাজের সঙ্গে মনের ও জীবনের কোন যোগাযোগ ছিল না। ইংরেজরা যখন থেকে এদেশে সপরিবারে আসতে আরম্ভ করেন এবং অধিক সংখ্যায় যখন ব্রিটিশ সৈন্যের আমদানি হতে থাকে, তখন থেকে (উনিশ শতক) ইংরেজরা এদেশের সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে দ্বীপান্তরিত জীবন যাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে করতে থাকেন। 'ইংলিশ টাউন' কলকাতা শহরের মধ্যে একটা দ্বীপে পরিণত হয়। চৌরঙ্গি হয় কলকাতা শহরে নতুন ইউরোপীয় কালচারের 'আইল্যাণ্ড'। চৌরঙ্গির পথঘাটের আঙ্গিক বিন্যাস 'নেটিভ' টাউনের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত হল। দুই টাউনের বাস্তব নাগরিক পরিবেশের মধ্যেও পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠল। কলকাতার বাঙালী পাড়া সম্বন্ধে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছেন (১২ মার্চ ১৮৪৯):[৪৩]

> "এইক্ষণে সর্বসাধারণ লোকেরা দৃষ্টি করুন, বাঙ্গালী পাড়ার প্রতি পথের পার্শ্বে পার্শ্বে নর্দমার কত ময়লা উদ্ধৃত হইয়াছে, এক এক পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে পর্বতাকার এমত ময়লা রহিয়াছে পথিকেরা এরূপ কখন দেখেন নাই, গলি পথের কথা দূরে থাকুক, শিমলার প্রশস্ত পথ যাহা শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীর গেটের সম্মুখ দিয়া পূর্ব মুখে গিয়াছে, তাহাতেও দুইখানি গাড়ি সম্মুখাসম্মুখি হইলে আরোহিরা জ্ঞান করিয়াছেন ঘোর বিপদে পড়িলেন, শিমলার পরিসর পথের উভয় পার্শ্বেই যখন নর্দমার ময়লায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল তখন গলিপথের দশা সহসাই বোধগম্য হইবে··"

কলকাতার বাঙালীপাড়ার সঙ্গে ইংরেজপাড়ার তুলনা করে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন (২৪ ভাদ্র ১২৬১):[৪৪]

> "ইংরাজ পল্লীতে গবর্নর জেনরল ও বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্মচারিরা বাস করেন, এ কারণে ভয়ে ভয়ে কমিস্তনরগণ তথাকার রাস্তাদিতে নিয়তই খোয়া ও সুর্কি দিয়া পরিষ্কার রাখিয়াছেন, রজনীযোগে তথাকার সকল রাস্তাই আলোকিত হয়, বিশেষতঃ গলি পথের ভিতরেই অধিক আলো, নর্দমাদিতে দুর্গন্ধের লেশও নাই, কিন্তু বাঙ্গালি

পল্লীর অধিকাংশই কর্দমে পরিপূর্ণ, খোয়া ও সুর্কির অভাবে অনেক রাস্তার পঞ্জর বাহির হইয়াছে···গলি পথে একটিও আলো নাই, নর্দমার দুর্গন্ধে প্রজাদিগের নানা প্রকার পীড়া হইতেছে···"

এ বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' পরে লিখেছেন (১৪ শ্রাবণ ১২৬৫) :[৪৫]

"আমরা বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি পল্লীর রাস্তাসকল নিয়তই ভগ্নাবস্থায় কালযাপন করে···তবে একবার জিজ্ঞাসা করি যে আমারদিগের সদ্বিদ্বান ইংরাজ রাজপুরুষেরা কেন আমারদিগের বাঙ্গালিগণের প্রতি ঈদৃশ হীনস্তা প্রকাশ করেন? যাহা হউক অতঃপর বিনীতভাবে রাজপুরুষগণকে নিবেদন করি তাঁহারা না হয় আমারদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিস্তার করতঃ একবার দিব্যজ্ঞান-বাহনেই বাঙ্গালি পল্লীতে আসিয়া স্ব স্ব চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া রাস্তা সকলের প্রতি সমুচিত সম্ভাব প্রদান করিবেন। বাঙ্গালি পল্লীর সকল রাস্তাই অতি কদর্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, ফলতঃ চীৎপুর রোড ও তাহার শাখা পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থলের কতকগুলীন গলী যেমত দুস্থগ্রস্ত তাহা বলিবার নহে।"

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস ১৮২২ সালে কলকাতা শহরে ইংরেজপাড়া চৌরঙ্গি অঞ্চল দেখে লিখেছেন—"that part called Chowringhee, filled with beautiful detatched houses, surrounded by gardens."[৪৬] ইংরেজ-পাড়া বলে চৌরঙ্গি অঞ্চলের বাড়িভাড়াও খুব বেশি ছিল, ১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস লিখেছেন, মাসিক ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। বাঙালীপাড়ার বড়লোকের বাড়ির সমান স্থানের (space) ভাড়া এর চারভাগের একভাগও ছিল না। আরও পনের-কুড়ি বছর পরে একজন বিদেশী পর্যটক বাঙালীপাড়া দেখে লিখেছেন :[৪৭]

"There is behold a countless number of flat-roofed houses with or without balustrades, so close do these roofs appear to be one another, that he who inclines, may apparently walk and jump over them from one end of the native town to the other without interruption from streets, lanes, squares and compounds. In other parts of the native town the houses are covered with tiles...closer to one another than the flat-roofed ones, and have not a pleasing appearance···and the most of the chunamed houses in the north-east part of it are dingy ··"

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক কলকাতা শহরে ইংরেজপাড়া ও বাঙালীপাড়ার নাগরিক

রূপের বৈসাদৃশ্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কলকাতার দেহ ও মন প্রথম খণ্ডিত করে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের জাতিবৈষম্যবোধ। তারপর কলকাতা শহর ক্রমে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলেও ভাগ হয়ে গিয়েছে। জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যের রেখার সঙ্গে ধনী-নির্ধনের শ্রেণীগত বিভেদরেখাও কলকাতা শহরের বহিরঙ্গে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। সামাজিক বিভেদ-বৈষম্যের বিপরীতমুখী রেখা কলকাতা শহরকে খণ্ড খণ্ড করে তার নাগরিক রূপ বিকৃত করেছে। শহর যে সমাজবিজ্ঞানী সরোকিনের (Sorokin) ভাষায় 'a real *coincidentia oppositorum*, or the place of coexistence of the greatest contrasts and contact of people of most opposite social status, standards, capacities, occupations, religions, mores, manners and what not."[৪৮]—তা কলকাতার ক্রমবিকাশের ধারা থেকে উনিশ শতকের মধ্যেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কলকাতার সামাজিক গতিশীলতা

সাধারণত গ্রামের তুলনায় শহরের সমাজ ও জীবন অনেক বেশি গতিশীল। নাগরিক সমাজে গতিশীলতার (social mobility) ধারা অনেক বেশি প্রবল। যে-কোন সমাজের গড়ন স্তরবিন্যস্ত। কালভেদে, দেশভেদে এবং ঐতিহাসিক প্রতিবেশভেদে এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের (social stratification) রূপ সর্বত্র একরকমের হয় না, এবং তা হয় না বলেই স্তর থেকে স্তরান্তরে আরোহণ ও অবরোহণের গতির মধ্যেও পার্থক্য থাকে যথেষ্ট। সামাজিক গতি প্রধানত দুরকমের—নিচে থেকে উপরে অথবা উপর থেকে নিচে ঊর্ধ্বাধগতি (vertical mobility) এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে অনুভূমিক গতি (horizontal mobility)। নগরকেন্দ্র থেকে যখন কোন ভাবধারা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি বা সমাজ-সংস্কারের আদর্শ বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনাগমন ও বসবাসের পথে কোন বাধা থাকে না, তখন এগুলিকে আমরা অনুভূমিক গতিশীলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যখন এক পেশা ও বৃত্তি ছেড়ে মানুষ স্বচ্ছন্দে অন্য পেশা ও বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, পুরোহিত ব্যবসায়ী হতে পারে, স্বর্ণকার কর্মকার হতে পারে, কেরানী অধ্যাপনা করতে পারে, নির্ধন ধনী হতে পারে, তখন এগুলিকে আমরা ঊর্ধ্বাধগতির দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যোগাযোগ ও চলাচলের

ব্যবস্থা শহরে অনেক বেশি বলে স্বভাবতঃই নাগরিক সমাজের অনুভূমিক গতিবেগ গ্রামের তুলনায় বেশি। সামাজিক স্তর থেকে স্তরান্তরে ওঠানামার গতির নিয়ন্ত্রকগুলিকে 'social elevators' বলা হয়। টাকাকড়ি, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি, বিচারালয় ও মন্ত্রণালয়, সামরিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হল শহর এবং আধুনিক সমাজে এগুলি হল 'এলিভেটার।' আধুনিক সমাজের যাবতীয় গতিনিয়ন্ত্রকের মহাকেন্দ্র হল মহানগর। সরোকিন বলেছেন: "All the institutions which serve as channels of vertical circulation (social promotion and demotion) of individuals in a society···and other 'social elevators' are located in cities···"[৪৯]

গ্রাম্যসমাজে বৃত্তিগত গতিশীলতা (occupational mobility) নেই বললেই হয়। সেখানে যে যার বংশগত বৃত্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেকটা ধর্মশাস্ত্রীয় কর্তব্য মনে করে পালন করে। চাষী চাষ করে, কারুজীবীরা যে-যার কারুকর্ম করে, পুরোহিত পৌরোহিত্য করে, পণ্ডিত অধ্যাপনা করে। ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের জন্য কারও কোন আগ্রহ নেই এবং বাস্তব জীবন থেকে তার জন্য কোন প্রেরণাও সেখানে সঞ্চারিত হয় না। ধীর মন্থর গতিতে, গতানুগতিক মাত্রা-বৃত্ত ছন্দে একটানা জীবনের স্রোত তাই গ্রাম্যসমাজে বইতে থাকে। আধুনিক নাগরিক সমাজে বৃত্তিগত স্বাধীনতা (occupational freedom) মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম নিদর্শন। এই বৃত্তিগত ব্যক্তিস্বাধীনতা নাগরিক সমাজের অজ্ঞাতকুলশীলতার মধ্যে প্রকাশ করার যে সুযোগ আছে, গ্রাম্যসমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও আত্মীয়বন্ধনের মধ্যে সে সুযোগ নেই। নাগরিক সমাজে তাই কুলবৃত্তিগত বন্ধন শিথিল হবার সম্ভাবনা বেশি এবং সেখানে বৃত্তিগত ও বংশগত বা পুরুষানুক্রমিক গতিশীলতা (inter-generational mobility) গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। শহরে পিতা-পুত্র-প্রপৌত্রের মধ্যে বৃত্তিগত ও বিত্তগত স্তরের বিরাট পার্থক্য ঘটাও আশ্চর্য নয়। সামান্য দরিদ্র রাঁধুনির পুত্র হয়ত শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনিক হতে পারেন, যেমন কলকাতার রামদুলাল দে হয়েছিলেন। তার জন্য শহুরে সমাজে ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিস্ময়কর ভাঙাগড়া ও উত্থানপতন দেখা যায়। একই পরিবারে বিভিন্ন পুরুষে (generation) সামাজিক মর্যাদার বিরাট

পার্থক্যও এই কারণে শহরে ঘটে থাকে। গ্রামে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এই ঊর্ধ্বাধ গতিশীলতা প্রায় দেখাই যায় না বলা চলে। সেখানে ধনিক জমিদারের বংশধর দরিদ্র হয়ে গেলেও পূর্বপুরুষের সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন না। সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধনবানই হন, আর দরিদ্রই হন, তার জন্য তাঁর সামাজিক মর্যাদার কোন তারতম্য হয় না। এইজন্য গ্রাম্যসমাজে ঊর্ধ্বাধ গতিশীলতা অত্যন্ত দুর্বল, এবং নাগরিক সমাজে স্বভাবতঃই প্রবল।[৫০]

উনিশ শতক শেষ হতে দেখা যায়, কলকাতা শহরের আঞ্চলিক রূপায়ণ খানিকটা বৃত্তিপ্রধান রূপ (dominant occupational zones) ধারণ করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার শতকরা কতটা অংশ কোন্ বৃত্তিজীবী তার পরিচয় থেকে এই আঞ্চলিক রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে :[৫১]

বৃত্তি : শিল্পজীবী (industrial)

শহর-অঞ্চল	মোট শিল্পজীবী	মোট লোকসংখ্যার শতকরা অংশ
বেনিয়াপুকুর	১৪,৫৯৩	৫১.৭
এণ্টালি	১৫,৩৭০	৩৯.৭
কলুটোলা	২৭,০৫২	৩৯.৭
মুচিপাড়া	১৯,৬৮৩	৩৭.৫
জোড়াসাঁকো	১৮,৮২৬	৩৫.৫
শহরতলি		
গার্ডেনরীচ	১৮,১৪১	৬৪.৬
কাশীপুর-চিৎপুর	২১,৩০১	৫২.২
মাণিকতলা	১৫,৭৬৭	৪৮.৬

বৃত্তি : বাণিজ্য

শহর-অঞ্চল	মোট বাণিজ্যজীবী	মোট লোকসংখ্যার শতকরা অংশ
বড়বাজার	৮২১৯	২৫.৯
জোড়াবাগান	১০,১৪৩	২০.৭
জোড়াসাঁকো	৮০৪৪	১৫.১
কলুটোলা	৬১৩৬	৯.৭
মুচিপাড়া	৬০৭০	১১.৬
পদ্মপুকুর (এণ্টালি)	৫০২৩	১৭.৮
বড়তলা	৫৮৩৭	১৬.১

বৃত্তি : উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি

শহর-অঞ্চল	মোট বৃত্তিজীবী	মোট লোকসংখ্যার শতকরা অংশ
ভবানীপুর	৫৪০৯	১০ ৮
মুচিপাড়া	৪৭১২	৯.০
বড়তলা	৫৩৯২	১১.৯
শ্যামপুকুর	৩৭৫২	৯ ৭
জোড়াসাঁকো	৩৩৯৫	৬.৪
জোড়াবাগান	৩১৭৭	৬.৪
কলুটোলা	৩০৩১	৪.৮

ভবানীপুরকে বলা হয়েছে "the chief seat of the Indian lawyers in Calcutta"—এবং এরকম কলুটোলা—জোড়াসাঁকো—বড়বাজার—মুচিপাড়া (বৌবাজার) অঞ্চলগুলিকে প্রধানত শিল্পজীবী ও বাণিজ্যজীবীদের বসবাসকেন্দ্র বলা যায়। মিশ্র-অঞ্চলও কলকাতায় কয়েকটি গড়ে উঠেছিল—যেমন জোড়াসাঁকো কলুটোলা অঞ্চল—যেখানে পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর বাস ছিল যথেষ্ট।

বৃত্তিকেন্দ্রিক আঞ্চলিক রূপায়ণ শহরে হয় খানিকটা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র গড়ে ওঠার ফলে, কিন্তু তার সঙ্গে গ্রাম্যসমাজের কুলবৃত্তি-কেন্দ্রিক বসতিবিন্যাসের কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নেই। যেমন কলুটোলা হয়ত উৎপত্তিকালে কুলবৃত্তিজীবী কলুদের জন্যই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু কলকাতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্বে সেখানে নানা রকমের ব্যবসায়ীর সমাগম হয়েছে এবং তাঁরা সকলেই যে কুলানুগামী ব্যবসায়ী তাও নয়। প্রশ্ন হল, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা কলকাতার নাগরিক সমাজে, ব্রিটিশ আমলে, কুলবৃত্তির বন্ধন কতটুকু শিথিল করতে পেরেছিল? খানিকটা নিশ্চয় পেরেছিল এবং তার ফলে স্তরবিন্যস্ত সমাজে কিছুটা উত্থান-পতনের গতিও সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে কলকাতার হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বর্ণের লোকের কুলবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বনের পরিচয় থেকে এ বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়:[৫২]

ব্রাহ্মণ

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
৪৪,২৫৩	১০,৭৯৮	ব্যবসায়ী—৩৪৬৯
		মার্চেন্ট অফিসের কেরানী—৩৪২৩
		ভৃত্য—৫৭১৩
		স্টেশন মাস্টার—১০

কায়স্থ

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
৩৩,২৮৩	১০,১২৫ (কেরানী)	ব্যবসায়ী—৪৩৬৮
		জমিদার—২৪২৬
		দক্ষ মজুর—১৮৫৪
		দিন মজুর—২৪২৬
		ভৃত্য—৪৬০৯
		সম্পাদক—৪
		স্টেশন মাস্টার—১১

কৈবর্ত

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
২৫,৫১৪	৬৯২	ব্যবসায়ী—২০৮২
		দক্ষ মজুর—৩৫২৪
		কুলি-দিনমজুর—২৯১৩
		ভৃত্য—৫২৫৬

চামার

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
১৬,৯১৭	৬৬২৬	ভৃত্য—৩৮২৯
		কুলি—২৩৬৩
		রাঁধুনি—৩১৭

গোপ

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
১৬,৯১২	৩১৪৮	ব্যবসায়ী—১১৯৩
		কুলি—২৭১৪
		ভৃত্য—৫৮৬৫

তন্তুবায়

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
১১,৮১০	৭৩৫	ব্যবসায়ী—১০১০
		দক্ষ মজুর—১১৮৫
		ভৃত্য—১৯৯৯
		অন্যান্য—২২১১

সুবর্ণবণিক

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
১০,৭১০	২০৯৫	—১৩২৪

তেলি

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
৯১৯৪	৯১৬	ব্যবসায়ী—২৭০৭
		ভৃত্য—১৬২৫
		কুলি-দিনমজুর—১০৪০

সদ্গোপ

মোট কর্মরতের সংখ্যা	কুলগত বৃত্তিজীবী	অন্যান্য বৃত্তিজীবী
৭৪৫৯	২৬৬	ব্যবসায়ী—১১৯২
		ভৃত্য—১৯৩৫

সংখ্যাগুলি কলকাতা 'টাউন' এলাকার। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরে কুলগত বৃত্তিবন্ধন একেবারে ছিন্ন না হলেও, অন্তত খানিকটা যে শিথিল হয়েছিল তা বিভিন্ন বর্ণের এই বৃত্তিপরিচয় থেকে কিছুটা বোঝা যায়। পরাধীন নাগরিক সমাজে বিদেশী শাসকের স্বার্থে স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে স্বাধীন বৃত্তি বা উপজীবিকার ক্ষেত্র যে কত সংকীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন হতে পারে তাও এই সেন্সাস থেকে জানা যায়। কলকাতার মতো ঔপনিবেশিক শহরে, আগে বলেছি, স্বাধীন উপজীবিকার বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি হয় ছোট ছোট ব্যবসাবাণিজ্যে, সরকারী ও বেসরকারী চাকরিতে এবং সংগতিপন্ন নাগরিক পারিবারে গৃহভৃত্যের কাজে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ কৈবর্ত চামার গোপ তন্তুবায় সুবর্ণবণিক তেলি সদ্গোপ প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে দেখা যায় ভৃত্যের সংখ্যা যথেষ্ট, কুলি দিনমজুর ও ছোট ব্যবসায়ীর সংখ্যাও কম নয়। কুলগত বৃত্তির বন্ধন শিথিল হলেও, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তার প্রভাব কলকাতার নাগরিক সমাজে একেবারে নগণ্য ছিল না। কলকাতা টাউনে বংশগত বৃত্তিজীবী তন্তুবায়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ার কারণ সেন্সাসে উল্লেখ করা হয়েছে "a clear proof of the influence of Manchester" বলে।[৫৩] কলকাতার সমাজে উপজীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত হলেও, সেই প্রসারের একটা নির্দিষ্ট সীমানা ছিল বোঝা যায়। বৃত্তিপ্রবাহ প্রবল ছিল না, বিচিত্রগামী ও বহুমুখীও ছিল না। কাজেই যে ওঠানামার

গতি কলকাতার নাগরিক সমাজে ব্রিটিশ আমলে সঞ্চারিত হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া কলকাতার বাইরের সমাজে খুব সামান্যই দেখা দিয়েছে, এমন কি কলকাতার সমাজেও তা দুর্বল ও সীমাবদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক শহরের সামাজিক গতির বিশেষত্ব কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের এই ধারার মধ্যে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধারার উল্লেখ্য পরিবর্তন বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত, কলকাতার সমাজজীবনে ঘটেনি।

নির্দেশিকা

প্রথমে পৃষ্ঠাসংখ্যা, পরে বন্ধনীর মধ্যে সূচকসংখ্যা

৫৯ (১) "...historically, the English Capital of India has grown up out of the union of a cluster of riverside places. The three hitherto recognised members of this cluster are Calcutta, Sutanuti, and Govindpur..."
C. R. Wilson : *Early Annals of the English in Bengal*, London 1895, Vol I, 129.

৫৯ (২) Col Yule : *Diary of William Hedges*, Vol II, pt. II.

৬০ (৩) Wilson : op. cit, I, 142.

৬০ (৪) Firminger : *Fifth Report*, intro (Cambray 1917) *LXIV*

৬০ (৫) J. J. A. Campos : *Hi.tory of the Portuguese in Bengal*, (Calcutta 1919), Ch. III-V

৬১ (৬) মদনমোহন হালদার : বহুক কলকাতা ১৮৯৫, পৃ ১২৯—১৭৫। নগেন্দ্রনাথ শেঠ : কলিকাতার তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস (কলকাতা ১৩৫৭)

৬১ (৭) Consultations, September 11, 1707

৬১ (৮) Bengal : Past and Present, Vol, LXXIX. Pt. I, No. 147, January-June, 1960 : Benoy Ghose : Some old family-founders in 18th Century Calcutta : The Setts of Sutanuti, p. 42-55.

৬২ (৯) Wilson : Early Annals, I, p. 143-44 Hedges' Diary, II, p. 92-94

৬২ (১০) Census of India, 1901, Vol VII, Pt. I : A. K. Ray : *A Short Histoy of Calcutta.*

রায় মহাশয় নিজে সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারভুক্ত। এই পরিবারের বংশধররা এখনও কলকাতার দক্ষিণে বড়িশায় ও চব্বিশ-পরগণার হালিশহর অঞ্চলে জীবিত আছেন। 'লক্ষ্মীকান্ত' নামে একখানি ইংরেজি বইতে এই বংশের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বইখানি সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারে অনুসন্ধান করে আমি পেয়েছিলাম। এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা

লক্ষ্মীকান্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ এবং বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়ানন্দের সমসাময়িক।
কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির বায়নামা (deed of purchase), সাং ৯ নভেম্বর ১৬৯৮, ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে (Addt. Mss. No. 24039)। W. Irvine-কৃত এই বায়নামার একটি ইংরেজী অনুবাদ উইলসন তাঁর *Old Fort William in Bengal*, I, ৪০-৪৮ পৃষ্ঠাতে প্রকাশ করেছেন।

৬৩ (১১) Firminger : Fifth Report, Introduction, Ch. IV, VI, VII, VIII.

৬৩ (১২) Home Department Miscellaneous Records, 31 December, 1706

৬৩ (১৩) Wilson : *Old Fort William in Bengal* (Indian Records Series) Vols I & II.

৬৪ (১৪) Report on the World Social Situation, including Studies of Urbanization in under-developed Areas (U. N. O.) N. Y. 1957 : Pt. II, Chapter VII—'Social problems of urbanization in Economically under developed areas'. 124, 111—143.

৬৫ (১৫) Report on the World Social Situation, p 112.

৬৬ (১৬) A. K. Ray, op. cit, p 19.
Hedges Diary III, 17.

৬৬ (১৭) History of Bengal, II, 463.

৬৭ (১৮) Firminger : Fifth Report, intro : CCXXXI

৬৮ (১৯) Firminger : op. cit, CCXXX

৬৯ (২০) Proceedings of Council, 22 April 1775
Firminger : op. cit, CCXXXI, fn (1)

৭০ (২১) Court's letter ; Jan. 31, 1755 & March 3, 1758

৭১ (২২) Home Dept Public Proceedings, No. 834, 2 May 1757

৭২ (২৩) Consultations, 23 May, 1748

৭৫ (২৪) বড় বড় তিনটি খণ্ডে বাঁধানো লটারি কমিটির Mannscript Proceedings বর্তমানে 'ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল হলে' আছে। ১৮৭৬ সালের কলকাতার সেন্সাস রিপোর্টে বেভারলে সাহেব লিখেছেন : "A full account of the works effected by the Lottery Committee would form one of the most interesting chapters in the history of the Town.... Three large manuscript volumes, containing their proceedings from the date of the Committee's appointment in 1817 to the close of 1821, are still in existence in the Municipal Office..."—(H. Beverley —Report on the Census of the Town of Calcutta—1876) Part III, p. 48.
মনে হয় পরে এই তিন খণ্ড কার্যবিবরণ (কার্জনের আমলে) 'ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল হলে' স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানেই এই কার্যবিবরণ পাঠ করার সুযোগ আমি পেয়েছি এবং তার জন্ত কিউরেটর ও ট্রাস্টিদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।—বি. ঘো.

৭৫ (২৫) Arnold W. Green : *An Analysis of Life in Modern Society*, 4thed N. Y. 1964, pp. 287-90.

৭৬ (২৬) L. C. MS proceedings, Gordon's Minute dt. 3 February 1820.

৭৭ (২৭) L. C. MS proceedings, Trotter to Bepareetollah, Sub. Committee dt 9 Nov. 1820.

৭৭ (২৮) L. C. MS proceedings, dt. 20 July 1820.

৭৭ (২৯) L C. MS proceedings, letter to Trotter, dt. 4 May 1820.

৭৮ (৩০) L. C. MS proceedings Memorandum dt. 2 May 1820.

৭৮ (৩১) L. C. MS proceedings, July 1820.

৭৯ (৩২) L. C. MS proceedings, Letter to Russell, acting Agent to G.G. at Murshidabad, from Prinsep, Persian Secretary to Government, dt. Fort William 15 September 1821.

৭৯ (৩৩) L. C. MS. proceedings, dt. 27 September 1821.

৭৯ (৩৪) L. C. MS. proceedings, dt 5 July 1821

৮০ (৩৫) A. K. Ray : Census 1901, VOL VII Part I A Short Cistory of Halcutta, p. 66 Appendix, p 80.

৮১ (৩৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, ১৭৫, ১৮৫, ১৮৭-৮৮, ১৮৯, ১৯৫-৯৬, ১৯৭-১৯৮।

৮২ (৩৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ২৮৫-৮৬, ৪৬২-৬৩।

৮২ (৩৮) Lewis Mumford : *The Culture of Cities*, 3rd Ed. London 1944, 85-86.

৮৩ (৩৯) Op. cit, 161.

৮৪ (৪০) S. W. Goode : *Municipal Calcutta*, Edin. 1916, p. 265

৮৪ (৪১) Lewis Mumford : op. cit, p 168.

৮৫ (৪২) Percival Spear : *The Nabobs* ; London 1963, p 139.

৮৬ (৪৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ২৭৭

৮৬ (৪৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, ২১০

৮৭ (৪৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, ২৪০-৪১

৮৭ (৪৬) Fanny Parkes : *Wanderings of a Pilgrim* etc. London 1850, Vol I, Chapter 3, p 20.

৮৭ (৪৭) A Griffin : *Sketches of Calcutta*, or Notes of a Late Sojourn in the City of Palaces, Glasgow 1843, pp 119-43

৮৮ (৪৮) Pitrim Sorokin & Carle. C. Zimmerman : *Principles of Rural-Urban Sociolagy*, N. Y. 1929, p. 48.

৮৯ (৪৯) Sorokin & Zimmerman : Op. cit, p. 41.

৯০ (৫০) Sorokin & Zimmerman : Op. cit., 43-44 Sorokin : *Social Mobility*, Chsp VIII & IX

৯০ (৫১) J. R. Blackwood : Census of India 1901, Vol VII, Calcutta : Town and Suburbs, Part IV, Chapter XI.

৯১ (৫২) Blackwood, Op. cit, Chapter XII.

৯৩ (৫৩) Blackwood, Op. cit., p. 116,

৩

বাঙালীর শিল্পোত্তম

আধুনিক কারখানাশিল্পের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশে যে ব্রিটিশ আমলে হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ ইংরেজদের অন্যতম বাণিজ্যিক কর্মকেন্দ্র, এবং কলকাতা শহর ইংরেজদের প্রথম রাজধানী ও অন্যতম বন্দর ছিল বলে শিল্পবাণিজ্যের উৎসাহ ও সুযোগ বাঙালীদের বেশি পাওয়াও স্বাভাবিক। খনিজ ও অন্যান্য শিল্পসম্পদের দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে শিল্পায়নের বাস্তব অবস্থা যথেষ্ট অনুকূলও বলা যায়। উনিশ শতকে একশ্রেণীর ধনিক বাঙালীর হাতে পর্যাপ্ত মূলধনও ছিল। এই ধনিক বাঙালীরা ইংরেজদের সংস্পর্শে নানাবিধ কাজকর্ম করে আঠার শতকের মধ্যেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছিলেন। এরকম বাস্তব ঐতিহাসিক পরিবেশ অন্তত কিছুটা রচিত হওয়া সত্ত্বেও কেন বাঙালীদের মধ্যে স্বাধীন শিল্পোত্তমের আশানুরূপ প্রকাশ হয়নি তা ভাববার বিষয় বলে মনে হয়।

বাঙালীর শিল্পোত্তম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাতে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়নি, বহুকথিত এ-যুক্তি অভ্রান্ত হলেও, তার স্বপূর্ণতা কতখানি তা বিচার করা উচিত। আঠার শতকে, এবং উনিশ শতকেও খানিকটা, দেওয়ানী বেনিয়ানী ও নানারকমের ইজারাদারী করে একশ্রেণীর বাঙালী অর্থান্বেষী একপুরুষেই যে বিপুল ধনসঞ্চয় করেছিলেন, তা স্বাধীন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার পথে ব্রিটিশ শিল্পনীতি কতখানি অনতিক্রম্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই শিল্পক্ষেত্রের সীমানাই বা কতদূর বিস্তৃত? অথবা এ ছাড়া আরও অন্যান্য অনার্থনীতিক (non-economic) কারণও ছিল? একপুরুষের অর্জিত ও সঞ্চিত ধন দু'তিন পুরুষের মধ্যে ক্ষয় হয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল কেন? ব্রিটিশ আমলে স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্র যেটুকু প্রস্তুত হয়েছিল, তার মধ্যে কি বাঙালীর মূলধন যাবতীয় বাধাবিপত্তি ঠেলে, সর্বক্ষেত্রে না হলেও, কোন-কোন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারত না? বাঙালীর জাতীয়

চরিত্রের, অথবা বাঙালী সমাজের কোন বৈশিষ্ট্য কি বাঙালীর আর্থনীতিক জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি? বাংলার সামাজিক গড়ন, সংস্কার-প্রথা-রীতিনীতি কতদূর বাঙালীর কর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তা গভীরভাবে ভাববার বিষয়। বিদ্যাবুদ্ধি ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাঙালীর দুঃসাহসিক অভিযান অর্থনীতিক্ষেত্রে কেন প্রতিফলিত হয়নি, অথবা অর্থনীতি-ক্ষেত্রের রক্ষণশীলতা কেন বাঙালীর মননশীলতার প্রতিবন্ধক হয়নি, তাও বিচার করে দেখা কর্তব্য।

আধুনিক যন্ত্রপাতি, শিল্পবাণিজ্য, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর মনোভাব কোনদিনই বিরূপ ছিল বলে মনে হয় না। অন্তত উনিশ শতকের সাময়িকপত্রে বাঙালীর যন্ত্রবিদ্বেষের, অথবা কারখানাশিল্পের প্রতি বীতরাগের কোন নজির বিশেষ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায়, সামাজিক ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল পত্রিকাও (যেমন 'সংবাদপ্রভাকর') যন্ত্র, কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যবিদ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে আধুনিক যুগোপযোগী প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সামান্য ধানভানা কল, গমপেষাই কল বা সেলাইয়ের কলের মতো ছোট ছোট কলও যখন এদেশে এসেছে, তখন বাংলা পত্রিকায় সানন্দে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং তার উপযোগিতা সাধারণের কাছে সোৎসাহে প্রচার করা হয়েছে। বহুবাজার-মলঙ্গা নিবাসী রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হৌসে যখন আমেরিকা থেকে সেলাইয়ের কল আসে (বাংলা ১২৬০ সাল), তখন 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন:[১]

"বধূবাজার নিবাসি ধনরাশি শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হৌসে আমেরিকা হইতে ছয়টা অত্যাশ্চর্য নূতন কল আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে জামা, চাপকান, ইজার, পেন্টলন প্রভৃতি নানাপ্রকার পোশাক ও গণিচটের থলে পর্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রগত সূচের এমত দ্রুতগতি ও চমৎকার কার্যস্থিরতা যে তাহা একভাবে গমন করিয়া এমত সেলাই করে যে বড় বড় দর্জিরাও সেইরূপ করিতে পারে না, ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ জাতিরা অসামান্য বুদ্ধির দ্বারা যদিও অনেকপ্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাচ তাঁহারা এ প্রকার প্রয়োজনীয় আশ্চর্য যন্ত্র নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে পারে নাই, যে ব্যক্তির বুদ্ধির প্রাখর্য দ্বারা আশ্চর্য যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে, তিনি কিরূপ অদ্বিতীয় লোক বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। এই যন্ত্র সাধারণের পক্ষে সামান্য প্রয়োজনীয় নহে, এক দিবসে এককালে ৬০০০ থলিয়া সেলাই হইয়া থাকে,

অতএব ঐ কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের কত উপকার হইবেক তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, ঐ যন্ত্র দর্শনার্থ অনেকেই গমন করিতেছেন, আমারদিগের কোন বন্ধু তদ্বারা কাপড় সেলাই করিয়া লইয়া সেলাই দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছেন।"

এরকম ধানভানা গমপেষা কলের কথাও সানন্দে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সমাচার দর্পণ' (৮ আগস্ট ১৮২৯) এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে কলকাতার গঙ্গাতীরে এমন একটি নতুন কল বসেছে যা কলকাতার লোকদের সুজি যোগাতে আরম্ভ করেছে। "এই কলের দ্বারা গমপেষা যাইবে ও ধানভানা যাইবে ও মর্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্যে ত্রিশ অশ্বের বলধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন।" দর্পণ-সম্পাদক তাঁর বন্ধুদের পরামর্শ দিয়েছেন, যে অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'হাজার মণ গম পিষতে পারে, তা প্রত্যেকের উচিত একবার স্বচক্ষে দেখা।[২]

শিল্পবিপ্লবের পর ইংলণ্ডে 'মেকানিক্স্ ইনস্টিটিউটে'র প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হতে থাকে। প্রধানত ইংলণ্ডের সুদক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়াররা বৈজ্ঞানিক শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য এই ইনস্টিটিউট স্থাপনে উৎসাহী হন। এঁদের শিল্পবিপ্লব-কালের 'এলিট'-শ্রেণী বলা হয়—"The men who made and mended the machines were the elite of the Industrial Revolution"—(Trevelyan)। ইংলণ্ডে বয়স্কদের শিক্ষার আন্দোলনও আরম্ভ হয় শিল্পবিপ্লবের পর থেকে, কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যাশিক্ষার চাহিদা থেকে।[৩] বাংলাদেশে ১৮৩৯ সালে 'মেকানিক্স্ ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হয় কলকাতা শহরে।[৪] বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে এদেশে কিভাবে কারিগরিবিদ্যা ও শ্রমশিল্পের উন্নতি করা যায়, তারই উপায় নির্ধারণ করার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এদেশে শিল্পবিপ্লব ঘটেনি এবং সমাজে ইঞ্জিনিয়ার-কারিগরদের আবির্ভাবও হয়নি, তাই নব্য-ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই 'মেকানিকস্ ইনস্টিটিউট'-এর উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বভাবতঃই অল্পদিনের মধ্যে মধ্যবিত্তদের এই উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' তার জন্য দুঃখ করে লিখেছেন :[৫]

"এই নগর মধ্যে শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদানার্থ মিকানিক ইনষ্টিটিউশন নামক এক সভা হইয়াছিল, অনেকানেক সম্রান্ত বিজ্ঞব্যক্তি তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, ও প্রধান২

বিদ্বান ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত হইয়া বিনাবেতনে সাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেন, কিছুদিন পরে ঐ মহৎ সভা সাধারণের অনুরাগ বিরহে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কি আশ্চর্য পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতি যে বিদ্যার দ্বারা অসাধ্য সাধনায় কৃতকার্য হইতেছেন কলিকাতাস্থ লোকেরা কি কারণ সেই মহাবিদ্যা প্রকাশিকা সভার প্রতি অনুরাগশূন্য হইলেন আমরা বুদ্ধির দ্বারা তাহার মর্মোদ্ধারণে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি…।"

কেবল ক্ষোভ প্রকাশ করেই প্রভাকর ক্ষান্ত হননি, বাঙালী চরিত্রের কিঞ্চিৎ সমালোচনাও করেছেন। লিখেছেন: "অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের এই এক চমৎকার স্বভাব যে তাঁহারা অল্প অর্থের মুখ দেখিতে পাইলেই বাবু হইয়া পড়েন এবং সর্বদা গোলবালিসে ঠেস দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন, তাঁহারা যদি অর্থ পাইলে পরিশ্রমের কার্যে অনুরাগি হন তবে এই দেশ পৃথিবী মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও প্রধান হইতে পারে…তাঁহারা শিল্পবিদ্যায় লিপ্ত হওয়া অপমানবোধ করেন, কি আশ্চর্য, যে বিদ্যার জন্য মনুষ্য সাংসারিক কার্যের পরমোপকারক হন, তাঁহারা সেই বিদ্যার অনুশীলনকে অপমানের কর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন …।" এদেশের সামাজিক ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর', কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছিলেন পাশ্চাত্ত্যপন্থী। সামাজিক প্রগতিবাদীদের মধ্যে মধ্যে বেশ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন প্রভাকর, কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের প্রতি ইংরেজদের মতো অনুরাগী না-হওয়ার জন্যই বাঙালীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রভাকরের মতামত বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, তার সামাজিক দৃষ্টির সঙ্গে আর্থনীতিক দৃষ্টির সামঞ্জস্য ছিল না। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রভাকরের আধুনিকতা বাস্তবিক বিস্ময়কর। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালীর উৎসাহের অভাব অন্তত উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে ছিল না। এমন কথা কেউ বলেননি যে সেকালের গ্রাম্যসমাজ ও কুটিরশিল্পই ভাল ছিল, আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজন নেই, অথবা তাতে সমাজের অকল্যাণ হবার কোন সম্ভাবনা আছে। তা সত্ত্বেও স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বিত্তশালী বাঙালীদের অনুরাগ কেন ব্যাপক ও গভীর হল না, তার কারণগুলি অনুসন্ধান করার একটা গুরুদায়িত্ব থেকে যায়।

ব্রিটিশ শিল্পনীতির অন্তরায়

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শিল্পনীতি রূপায়িত হয়েছে মূলতঃ ব্রিটিশ স্বার্থে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপনিবেশের শিল্পায়ন-নীতি কখনও উপনিবেশের স্বার্থে পরিচালিত হতে পারে না। শাসকের স্বার্থে যতটুকু শিল্পায়ন সম্ভব হয় সেইটুকুই উপনিবেশের লাভ। পরাধীনদেশের শিল্পোদ্‌যোগী ধনিকশ্রেণীরও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগসুবিধা বিদেশী শাসকের স্বার্থসিদ্ধির এই রন্ধ্রপথে অনুসন্ধান করতে হয়। ভারতে ব্রিটিশ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে মাইকেল কিড্রন বলেছেন : ৬

"From the 1850's public works were financed out of current revenues—sparingly ; requests for subsidies for heavy industry were repeatedly denied ; several attempts to set up investment banks were blocked and the field left clear for orthodox British banking which was then, as now, totally unsuited for the purpose. Railways converged on the ports with little regard for internal economic logic and none for uniformity of gauges and rates Railway building had little 'spread effect' : permission to buy government stores in India came only in 1928 and preference for local manufactures in 1931. Recommendations of the Famine Enquiry Commission, 1880, to encourage industry and sponsor technical training officially were ignored for nearly forty years."

খুব অল্পকথায় কিড্রন এখানে ব্রিটিশ শিল্পনীতির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। সার কথাটুকু তিনি বলেছেন এবং তার ভিতর থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ শিল্পনীতি কতদূর ভারতীয় শিল্পায়নের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে কিছু কিছু হয়েছে, বাংলাদেশেও হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে শ্রীরামপুরে (হুগলি) প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। ১৮২০ সালে রানীগঞ্জে (বর্ধমান) প্রথম কয়লাখনি খোঁড়ার পর প্রায় কুড়ি বছরের মধ্যে আর কোন নতুন খনি খোঁড়া হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে রেলপথ নির্মাণের সময় থেকে কয়লাখনির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭৯-৮০ সালের মধ্যে রানীগঞ্জ ও তার পাশাপাশি অঞ্চলে প্রায়

৫৬টি কয়লাখনিতে কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যে কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়, তারমধ্যে ১৮টি বোম্বাই প্রদেশে এবং ২টি বাংলাদেশে। পাটচাষ ও পাটকল প্রধানত বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৮৫৪ সালে অক্‌ল্যাণ্ড প্রথম পাটকল শ্রীরামপুরে স্থাপন করেন। ১৮৮২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ২০টি পাটকল স্থাপিত হয়, তারমধ্যে ১৮টি বাংলাদেশে এবং এই ১৮টির মধ্যে ১৭টি কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে।[৭]

লোহা-ইস্পাতশিল্পের ইতিহাস থেকে ব্রিটিশ শিল্পনীতির স্বরূপ আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। জনৈক হীদ সাহেব মাদ্রাজে (Porto Novo) উনিশ শতকের তিরিশে (১৮৩০) লোহা-ইস্পাত উৎপাদনে প্রয়াসী হন, কিন্তু ভাল জ্বালানী, কাঁচামাল ও পরিচালনার অভাবে তিনি ভাল করে লোহাই উৎপাদন করতে পারেননি, ইস্পাত তো দূরের কথা। মাদ্রাজ সরকারের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ১৮৭৪ সালে হীদের লোহাকারখানা উঠে যায়। বাংলাদেশে বরাকরে একটি লোহার কারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৯ সালে 'বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি' তার পরিচালক হন। উনিশ শতকের মধ্যে এই কোম্পানি শুধু লোহা তৈরি করেছিল, তাও অল্প পরিমাণে, ইস্পাত তৈরি করতে পারেনি। লোভাট ফ্রেজার (Lovat Fraser) বলেছেন যে উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে ভারতের শিল্পায়নের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের বিরাগ আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার ফলে ভারতের শিল্পপ্রসার যথেষ্ট ব্যাহত হয়।[৮] আশ্চর্য হল, রেলপথ স্থাপিত হবার পরে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ইস্পাতের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভারতে কোন ইস্পাত তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়নি। জামসেদজী টাটা ১৮৮০ সালে মধ্যপ্রদেশে লোহা-ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত-সরকারের কাছে রেলওয়ের কিছু সুযোগ-সুবিধা চেয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের চীফ্‌ কমিশনার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।[৯] বিশ শতকের গোড়ায়, কার্জনের শাসনকালে, লোহা-ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় এবং ইস্পাত তৈরিও এই সময় থেকে আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে আধুনিক কারখানায় প্রথম ইস্পাত তৈরি হয় ১৯১৩ সালে।[১০]

প্রশ্ন হল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের লোহা-ইস্পাতশিল্পের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের যে প্রতিকূল মনোভাব ছিল, বিশ শতকের গোড়ায় তা অনুকূল হবার কারণ কি? অর্থাৎ প্রথমে কেন প্রতিকূল ছিল, পরে কেন অনুকূল হল?

প্রথমে প্রতিকুল ছিল কারণ ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠার পর লোহা-ইস্পাতের যে বিপুল চাহিদা হয়েছিল তা ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের দেশের ইস্পাতশিল্পের প্রসারের জন্য ইংলণ্ড থেকে আমদানি লোহা-ইস্পাত দিয়ে মেটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ইংলণ্ডের লোহা-ইস্পাত শিল্পের প্রসারে সাহায্য করেছে। পরে বিশ শতকের গোড়ায় এই মনোভাব পরিবর্তনের কারণ হল উনিশ শতকের শেষ দশকের দিকে ভারতের লোহা-ইস্পাতের বাজারে ইংলণ্ডের একচেটিয়া প্রতিপত্তি 'চ্যালেঞ্জ' করে বেলজিয়াম অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই নানাদিক বিচার করে ব্রিটিশ সরকার এইসময় ভারতে লোহা-ইস্পাত তৈরির কিছু সুযোগ-সুবিধা ভারতীয় পুঁজিপতিদের দিয়েছিলেন। 'টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি' ১৯০৭ সালে স্থাপিত হয়, ১৯০৮ সালে টাটার কারখানা নির্মাণ আরম্ভ হয়, ১৯১১ সালে প্রথম লোহা তৈরি হয় এই কারখানায় এবং ১৯১৩ সালে হয় ইস্পাত।[১১] দেশীয় লোহাশিল্প সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন ঃ[১২]

"এতদ্দেশে বিস্তর লৌহের আকর আছে। সেই আকরোত্তলিত লৌহের যথোপযুক্ত ব্যবহার হইলে ভারতবর্ষে আর বৈদেশিক লৌহের আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না। পূর্বে আমাদের মহামান্য ষ্টেট সেক্রেটরি মহোদয় এদেশে শিল্পবিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে লৌহের কারখানা খুলাইবার প্রস্তাব করেন, পরে লোকহিতৈষী মহাত্মা লার্ড রিপন সেই প্রস্তাবের কার্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে শীঘ্র নানাস্থানে লৌহের কারখানা স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন··· এক্ষণে যে সমস্ত স্থানে লৌহের আকর আছে, তত্তৎস্থলে এক একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সমস্ত কারখানা রেলওয়ের লৌহময় দ্রব্যসামগ্রীর আঞ্জাম করিবেন, ফলতঃ এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনেকটা আনুকূল্য করিতে সম্মত হইয়াছেন, আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় ধনবান ব্যক্তিরা যেন বিলাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, অবশ্য আমরা স্বীকার করি এই বৃহৎ কার্যে বিস্তর ধন আবশ্যক, কিন্তু ঐ মূলধন যে এদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে পারিবে না তাহার কোন কারণ নাই···গবর্ণমেণ্ট লৌহের ব্যবসায়ে কিছু আনুকূল্য করিবেন শুনিয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন ছিদ্রান্বেষী ইংলিসম্যান দুশ্চিন্তায় গলদঘর্ম হইয়া পড়িয়াছেন, মূর্ছিত হন নাই, হইতে হইতে চৈতন্য পাইয়াছেন···।"

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এদেশের লোহা-ইস্পাত শিল্পের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের যে পরিবর্তন হচ্ছিল 'সোমপ্রকাশ' তারই

উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই আনুকুল্যটুকুও যে স্থানীয় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভাল চোখে দেখছিলেন না তা 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মতামত সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশে'র মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। যাই হোক, ভারতের শিল্পায়নের পথে ব্রিটিশ শিল্পস্বার্থ যে বেশ বড় একটা অন্তরায় ছিল, আমাদের লোহা-ইস্পাত শিল্পের প্রতিষ্ঠাকালের (এবং পরবর্তী অগ্রগতিরও) এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কয়লাখনির ইতিহাস অন্য একরকমের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশে রানীগঞ্জ অঞ্চলে ১৭৭৪ সাল থেকেই কয়লার খাদ খোঁড়ার চেষ্টা হয়।[১৩] কিন্তু সেই সময় কোনদিক থেকে কোনরকম উৎসাহ ও সহযোগিতা না পেয়ে এক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়। তারপর প্রায় চল্লিশবছরের মধ্যে আর কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ১৮২০ সালে রানীগঞ্জে আবার কয়লাখনি খোঁড়া হয়, কিন্তু তার কাজকর্মও নানারকম অসুবিধার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৫-৪৬ ও ১৮৫৮-৬০ সালে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের জন্য এই অঞ্চল জরীপ করা হয়। এইসময় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও তার কাজকর্ম চলতে থাকে। বিদেশ থেকে আমদানি কয়লা দিয়ে সেই কাজ চালানোর অসুবিধা হয়। তখন থেকে কয়লাখনির ধারাবাহিক প্রসার হতে থাকে। ১৮৬০ সালে দেখা যায় রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশটি কয়লাখনি থেকে বছরে ২৮২০০০ টন কয়লা উৎপন্ন হচ্ছে।[১৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদের প্রতি রাষ্ট্রীয় অধিকার কায়েম করতে টালবাহানা করেছেন। তার ফলে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে বিরোধ ও মামলা-মকদ্দমায় অনেক খনির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'কোল্ড ফিল্ড কমিটি' তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন: "A notable feature of this development was the failure of Government to assert their rights to the mineral wealth in the permanently settled areas. The early entrepreneurs had, therefore, to conclude agreements with the local land-owners and the inevitable complexities and resultant expensive legal disputes caused many failures."[১৫]

বাঙালীর প্রাথমিক শিল্পোদ্যমের ইতিহাসে কয়লার একটি বিশেষ স্থান

আছে। উনিশ শতকের মধ্যে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি' বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং প্রচুর মুনাফাও করতে থাকে। কিন্তু এই মুনাফার সবটুকুই বিদেশী পুঁজিপতিরা গ্রাস করতেন। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় থাকুক এবং অন্য কোন কয়লাখনি স্থাপিত না হোক, এই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসকরাও কোম্পানির মালিকদের এই উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৮৫৭ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই কোম্পানি সম্বন্ধে লেখেন:[১৬]

"The company has been about half a century in existence, having succeeded government in the possession of the splendid concern which government at an immense loss had raised for the purpose of unlocking the coal resources of Bengal. The resources, moral and material, at the command of the Company's Agent are immense. This Company has always considered itself the sole rightful owner of the extensive coal fields which stretch westward from Burdwan, and resented any infringement of or trespass upon its monopoly. For many years, Government and the local authorities seemed to acquiesce in its claims, and afforded no countenance or protection to any other speculator who dared to set up in rivalry to the Company···Great has become the Bengal Coal company, great its prestige and great the fame of its manager. The present Governor-General has, we understand, paid the tribute of his admiration, to the great company and its concerns. In competition with this company, in the face of difficulties which have scared away or ruined rival British speculations, a native gentleman, thirteen years ago, opened a mine in the vicinity of the Bengal Coal Company's fields. In thirteen years, the Searsole colliery has become the second great colliery in Bengal, and bids fair to outgrow the old company's works."

বাংলাদেশে কয়লাখনির এই ইতিহাস থেকেও বোঝা যায় ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ কতখানি এদেশীয় ধনিকদের শিল্পোদ্যমের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই, কিন্তু প্রশ্ন হল এই প্রতিবন্ধকতাই কি বাঙালীর শিল্পোদ্যমের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ ?

কার-ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি

উনিশ শতকে বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ দ্বিতীয় আর কারও ছিল কিনা সন্দেহ। ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ গবর্নমেণ্টের দেওয়ানের কাজ ছেড়ে (Customs, Salt and Opium Board) স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের জন্য 'কার ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' স্থাপন করেন (১৮৩৫-৩৬)। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন কার সাহেব (William Carr), প্রিন্সেপ সাহেব (William Prinsep) ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। কোম্পানির মূলধন বেশির ভাগই দ্বারকানাথ যোগান দিতেন। এই কোম্পানি রানীগঞ্জের কয়লাখনির ব্যবসায়ে উৎসাহী হয়ে অনেক মূলধন নিয়োগ করেন। ১৮৩৬ সালে একটি বিদেশী কোম্পানির খনি কিনে নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করা হয়। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা লেখেন (৯ জানুয়ারি ১৮৩৬) :[১৭] "আলেকজান্দর কোম্পানির ইষ্টেটসম্পর্কীয় রানীগঞ্জের কয়লার আকর গত শনিবারে নীলাম হওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে তাহা ক্রয় করিয়াছেন। ঐ আকর পূর্বে অত্যুৎসাহি জোন্স সাহেবের ছিল। ঐ সাহেব প্রথমেই এতদ্দেশে কয়লা বাহির করাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছেন।"

দ্বারকানাথ ঠাকুরই কার-ট্যাগোর কোম্পানির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি টাকা যোগাতেন এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম নিজেই পরিচালন করতেন। কোম্পানির আর্থিক ব্যাপারে, মূলধনের প্রধান নিয়োগকর্তা বলে, তিনি প্রায় সর্বময় কর্তা ছিলেন, অন্য কোন অংশীদারকে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। কার ও প্রিন্সেপ সাহেব ছাড়া পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হেণ্ডারসন, প্লাউডেন, ম্যাকফার্সন ও টেলার সাহেব অংশীদার হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দ্বারকানাথ অংশীদার করে নেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যাতে টাকা ধার পেতে অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যে, প্রধানত দ্বারকানাথের উদ্‌যোগে, ১৮২৯ সালে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়। প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ

আরম্ভ হয় ১৭ আগস্ট ১৮২৯। এই মূলধনে দ্বারকানাথের অংশ ছিল অনেকটা, এ ছাড়াও মধ্যে মধ্যে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা তিনি দিয়েছেন। কার-ট্যাগোর কোম্পানির সঙ্গে স্বভাবতঃই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৮৪০ সালের পর থেকে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে আর্থিক সংকটের ফলে অনেক ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ফেল হয়ে যায়। দ্বারকানাথ এই সংকটের ভিতর দিয়েও তাঁর ব্যাঙ্ক ও কোম্পানির কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় হঠাৎ ১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তার প্রায় দেড় বছরের মধ্যে ব্যাঙ্ক ও কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায়। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হয় ১৮৪৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর, এবং কার-ট্যাগোর কোম্পানি উঠে যায় ১৮৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি।[১৪]

১৮৪৮ সালের ৪ এপ্রিল কার-ট্যাগোর কোম্পানির পাওনাদারদের একটি সভা হয়। সভায় কোম্পানির যে হিসেব দেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে তার মোট দেনা ছিল তখন ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হলে এবং অনাদায়ী টাকা আদায় হলে প্রায় ২৯ লক্ষ ২ হাজার ৯৫০ টাকা পাওয়া যেত এবং তা দিয়ে দেনা পরিশোধ করাও হয়ত সম্ভব হত। কিন্তু যে-কোন একজন পাওনাদারের দাবি উপস্থিত হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তা মেটাতে না পারলে ব্যাঙ্কের মতো বাণিজ্য-হাউসেরও পতন হয়। কার-ট্যাগোর কোম্পানির ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনী'তে মোট দেনা ১ কোটি টাকা ও মোট পাওনা ৭০ লক্ষ টাকা বলে লিখেছেন। আগের হিসেবের সঙ্গে এই হিসেবের মিল নেই। মনে হয় দেবেন্দ্রনাথের হিসেব দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত দেনাপাওনার সঙ্গে কোম্পানির দেনাপাওনার মিলিত হিসেব।

দ্বারকানাথের কয়লার ব্যবসার কথা বলি। ৭০,০০০ টাকা দিয়ে ১৮৩৫ সালে দ্বারকানাথ আলেকজাণ্ডার কোম্পানির কাছ থেকে রানীগঞ্জে কয়লাখনি কেনেন। এ সংবাদ আমরা তৎকালের সাময়িকপত্র থেকে পাই। এই কয়লাখনি ব্যবসায়ও দ্বারকানাথের কার-ট্যাগোর কোম্পানির কাছে যে বিশেষ লাভজনক হয়নি, তা সরকারী রাজস্ববিভাগের নথিপত্রে রক্ষিত কোম্পানির কয়েকটি চিঠি থেকে বোঝা যায়। বর্ধমানের ডেপুটি কলেক্টর ও খাসমহলের সুপারিন্টেনডেন্ট টেলর (W. Taylor) সাহেবের কাছে ২৭ মার্চ ১৮৩৯ সালে লিখিত কার-

ট্যাগোর কোম্পানির একখানি চিঠি থেকে রানীগঞ্জের কয়লাখনির ব্যবসায়ের কথা কিছুটা অনুমান করা যায়। চিঠিতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যা লেখেন তার মর্ম এই :[১৯]

"১৮১৫ সালে জনৈক উইলিয়াম জোন্‌স (William Jones) এই কয়লাখনি প্রথম খনন করেন এবং গবর্নমেন্ট তাঁকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন।

"বর্ধমানের মহারানী জয়কুমারীর কাছ থেকে বাৎসরিক ৫৫৷৷৩ পাই খাজনাতে জমি নিয়ে জোন্‌স কয়লার খাদ খোঁড়েন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৭ তারিখের এই পট্টা আপনাদের রাজস্ববিভাগের দপ্তরে আছে।

"গবর্নমেন্ট নতুন একটি শিল্পপ্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্য যে ঋণ দিয়েছিলেন, তার জন্য জামিন ছিলেন আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানি। ১৮২২ সালে জোনস সাহেবের মৃত্যুর পর এই আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানি কয়লা খনির মালিক হন।

"যদিও আগের জমিতে উক্ত কোম্পানি খাদের কাজ করছিলেন, তাহলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং খানিকটা নিরাপত্তার জন্যও, তাঁরা রানীগঞ্জ ও তার পাশাপাশি আরও চারটি গ্রামের (যা বর্ধমানরাজের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল) পত্তনি তাঁদের একজন কর্মচারী গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের নামে গ্রহণ করেন।

"রানীগঞ্জের কয়লাখনি এবং এই গ্রামগুলি ১৮৩৫ সালে আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানির ওয়ারিশরা আমাদের কাছে বিক্রি করে দেন।

"রানীগঞ্জ ও অন্যান্য গ্রামের জন্য আমাদের ১৫০০ টাকা সেলামি দিতে হয়, এবং ৯৫৯ টাকা বাৎসরিক খাজনা দিতে হয়। এইসব সম্পত্তি ও জমিজমার দলিলপত্র আপনাদের অফিসেই রক্ষিত আছে।

"রানীগঞ্জ অঞ্চল আপনার যথেষ্ট পরিচিত। এরকম শুকনো অনুর্বর অঞ্চল যে চাষবাসের আদৌ অনুকূল নয় তা আপনি জানেন। সুতরাং কয়লাখনি ছাড়া অন্য উপায়ে এখান থেকে কিছু উপার্জন করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমরা যে এখানে পাশাপাশি কতকগুলি গ্রাম পত্তনি নিয়েছি তা কেবল আমাদের কয়লাখনির ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং খানিকটা খনিমজুরের সমস্যা সমাধানের জন্যও বটে। এইসব অঞ্চলের যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা আমাদের কয়লাশিল্পের কাজের জন্য। কয়লাখনি না থাকলে এই সমস্ত গ্রামের অবস্থা

যেমন শোচনীয় ছিল তেমনি থাকবে। আমরা ভাবতেই পারি না যে এই উন্নতির জন্য গবর্নমেণ্ট আমাদের কাছ থেকে বেশি করে ট্যাক্স ধার্য করবেন। আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দাবি করেছি এবং আমরা মনে করি যে এরকম জনকল্যাণকর শিল্পকর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য গবর্নমেণ্টের উচিত আমাদের কাজকর্মে কোন বাধা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ না করা। কয়লাশিল্প এমন একটি শিল্প যা আমাদের দেশে একেবারে নতুন এবং সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলা চলে। দেশের ও জাতির কল্যাণ ও উন্নতি যে কতখানি এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল, তাও বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।

"এই কারণে গবর্নমেণ্টের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন খাজনাবৃদ্ধি করে, অথবা সেলামি চেয়ে অযথা আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেন। খাজনা বৃদ্ধি করার অর্থ হল আমাদের কয়লার উপর ট্যাক্স ধার্য করা। এখনও যখন আমাদের দেশে ইংলণ্ড থেকে আমদানি কয়লা দিয়ে বেশির ভাগ চাহিদা মেটাতে হয়, তখন প্রতিযোগিতায় আমাদের কয়লার মূল্য বেশি হলে ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হবে, এবং হয়ত কয়লাখনি বন্ধ করে দিতে হবে।" চিঠির শেষ অংশটুকু এই:

"...We deem it our duty most strongly to appeal against an increased rate of assessment which operating exclusively as a direct tax upon our coal would, during the present competition and while so large a proportion of the entire quantity consumed in India is imported from England, oblige us probably at once to close our mines and save ourselves from certain loss only by disposing of stock that we have already collected while we should throw out of employment some thousands of persons who depend upon our colliery for employment in mining and in conveying the coal from Raneegunge to Calcutta.

We have etc.
sd/Carr Tagore & Co."

ব্রিটিশ শাসকরা যে 'কার-ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি'র কয়লাখনিশিল্পের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন না, তা এই চিঠির মূল বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। যদি এ দেশের স্বাধীন শিল্পোত্তম ও শিল্পোন্নতির প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এতটুকু অনুকূল মনোভাব থাকত তাহলে কয়লাশিল্পের শৈশবকালে এদেশের শিল্পোদযোগীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। অবশ্য 'কার-ট্যাগোর কোম্পানি' এই চিঠিখানি যখন লিখেছিলেন (১৮৩৯) তখন আমাদের দেশে রেলপথ স্থাপিত হয়নি। এমন কি এই কোম্পানি যখন উঠে যায় (১৮৪৮) তখনও রেলপথের পরিকল্পনা ঠিক বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। 'কার-ট্যাগোর কোম্পানি'র শিল্পোত্তম তার আগেই নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ শাসকদের শিল্পানুকুল্যের অভাব তার পতনের একটি অন্যতম কারণ। রানীগঞ্জের কয়লাখনির প্রসার অন্যান্য অঞ্চলের রেলপথ স্থাপিত হবার পর দ্রুতগতিতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর বা 'কার-ট্যাগোর কোম্পানি'র কোন সম্পর্ক ছিল না।

আমাদের প্রশ্ন হল, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো একজন অসাধারণ শিল্পোদ্যোগী বাঙালীর স্বাধীন শিল্পোত্তম ব্যর্থ হল কেন, এবং তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় মডেলের বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান কার-ট্যাগোর কোম্পানির কেনইবা মাত্র বার বছরের মধ্যে পতন হল ?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের শিল্পানুকুল্যের অভাব দ্বারকানাথের এই শিল্পোত্তমের ব্যর্থতা ও বাণিজ্যিক অবনতির একটি কারণ, এবং অবশ্যই বড় কারণ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ছাড়াও আরও অন্যান্য কারণ ছিল এবং সেই কারণগুলিরও গুরুত্ব কম বলে মনে হয় না। সেই কারণগুলি হল :[২০]

১. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কার ট্যাগোর কোম্পানি এবং নিজের বিষয় সম্পত্তি—এই ত্রিমুখী অভিযানের ফলে দ্বারকানাথের মূলধন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, তার গুরুত্ব অনুযায়ী, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কেন্দ্রীভূত হতে পারেনি। বহুক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ফলে দ্বারকানাথের মূলধন শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কেবল ভূসম্পত্তিতে বিনিযুক্ত মূলধনটুকু ছাড়া। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার-ট্যাগোর কোম্পানির যুগপৎ দেউলিয়া হওয়া থেকে এবং কোম্পানির দেনা-পাওনার হিসেব থেকে তা বোঝা যায়।

২. তখনকার ইংরেজ ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই মূলধন সংগ্রহ করতেন এদেশের ধনিক বেনিয়ানদের কাছ থেকে। বড় বড় ইংরেজরা নিঃসঙ্কোচে হাজার হাজার টাকা ঋণ করতেন ধনিক বাঙালীদের কাছ থেকে এবং সে টাকা অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁরা বাণিজ্যিক স্পেকুলেশনে উড়িয়ে দিতেন, পরিশোধ করতে পারতেন না। দ্বারকানাথের ইংরেজ অংশীদাররা হয়ত ইংরেজ বলে তাঁর কোম্পানির 'স্টেটাস' বাড়িয়েছেন, কিন্তু ঐ 'স্টেটাস'টুকু ছাড়া আর কোন লাভ দ্বারকানাথের হয়নি। বিশেষ করে মূলধনের দিক থেকে বরং তাঁরা গলগ্রহ হয়েছেন, প্রকৃত সহযোগী হতে পারেন নি। অর্থাৎ দ্বারকানাথকে তাঁদের টাকাও যোগান দিতে হয়েছে, কোম্পানিকে তো দিতে হয়েছেই। কি উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য দ্বারকানাথ ইংরেজ অংশীদার নিয়েছিলেন তা জানা নেই। ম্যাকিনটোশ কোম্পানির দুজন অংশীদার গর্ডন (J. G. Gordon) ও ক্যালডর (James Calder) দ্বারকানাথের বাল্যবন্ধু ছিলেন বলে তাঁরা তাঁকে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর করে নেন। এক্ষেত্রে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের স্বার্থ পরিষ্কার বোঝা যায়। সেই স্বার্থ হল দ্বারকানাথের টাকা। কিন্তু দ্বারকানাথ কি স্বার্থে (একমাত্র সামাজিক স্টেটাসের স্বার্থ ছাড়া) কার-ট্যাগোর কোম্পানিতে ইংরেজ অংশীদার নিয়েছিলেন, তার রহস্য ভেদ করা সত্যই কঠিন। তা না নিয়ে যদি তিনি তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন বাঙালী ধনিককে (যথেষ্ট বাঙালী ধনিক বন্ধু তাঁর ছিলেন) ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নিতেন এবং তাঁদের কয়েকজনকেও যদি স্বাধীন শিল্পকর্মে উৎসাহী করতে পারতেন, তাহলে হয়ত তাঁর কোম্পানির ইতিহাস অন্যরকম হত। বাঙালীর শিল্পোদ্যমের ইতিহাসেও একটা নতুন ধারা তিনি প্রবর্তন করতে পারতেন। নিজেও হয়ত বিস্তর দেনার দায়ে ভরাডুবি হতেন না। আর যদি গবর্নমেণ্টের সহানুভূতি পাবেন বলে তিনি ইংরেজ অংশীদার নিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা তাঁর কল্পনাবিলাস বলতে হয়। জোন্‌স সাহেব ৪০ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়লার ব্যবসা তিনি করতে পারেননি। গবর্নমেণ্ট অনুকূল হলে নিশ্চয় তাঁর অবস্থা শোচনীয় হত না। আলেকজাণ্ডার কোম্পানিও সরকারী আনুকূল্য পেলে এবং কয়লাশিল্পে লাভবান হলে নিশ্চয় দ্বারকানাথের কাছে ৭০ হাজার টাকায় তা বিক্রি করে দিতেন না। সুতরাং ইংরেজ অংশীদার হলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর শিল্পোদ্যমে সহযোগিতা করবেন,

এরকম কোন ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। ব্রিটিশ শিল্পনীতি এদেশে এরকম কোন মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তাহলে হীদ সাহেবের লোহার কারখানা উঠে যেত না এবং জামসেদজী টাটা না হয়ে কোন ইংরেজ যদি তখন লোহা-ইস্পাতের কারখানা করতে চাইতেন তাহলেই যে ভারতের ব্রিটিশ শিল্পনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন হত, এমন কথা ভাববার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কাজেই শিল্পস্বার্থের দিক থেকে ইংরেজ অংশীদার নেওয়া দ্বারকানাথের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল বলে মনে হয়।

৩. নীলের ব্যবসায়ে কার-ট্যাগোর কোম্পানিকে এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ককে জড়িত করা অথবা তাঁর নিজের দিক থেকেও জড়িত হওয়া উচিত হয়নি। নীলচাষ ও নীলকুঠির ব্যবসা কোনমতেই স্বাধীন শিল্পপদবাচ্য হতে পারে না, অথচ এই নীলকুঠিতে কার-ট্যাগোর, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও দ্বারকানাথের অনেক টাকা নষ্ট হয়েছিল।

৪. শিল্পবাণিজ্যের পরিবর্তে বিষয়সম্পত্তি ও জমিদারী কিনে দ্বারকানাথ লক্ষ লক্ষ টাকা ভূগর্ভে সমাধিস্থ করেছিলেন। 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর দলিল দস্তাবেজের মধ্যে দ্বারকানাথের এই জমিদারী কেনার ও জমিদারে পরিণত হওয়ার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বহু ভূসম্পত্তি কিনে শেষ পর্যন্ত তিনি বেশ বড় একজন জমিদার হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ বুঝতে পারেননি যে জমিদার ও শিল্পপতি একসঙ্গে হওয়া যায় না, হয় পুরোপুরি জমিদার হতে হয়, না হয় পুরোপুরি শিল্পপতি হতে হয়। দুটি একসঙ্গে হতে গেলে শেষ পর্যন্ত অচল-অটল জমিদারীটুকুই থাকে, কিন্তু সচল শিল্পবাণিজ্য থাকে না। দ্বারকানাথের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এক কথায় বলা যায়, দ্বারকানাথের মধ্যে স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের যথেষ্ট উৎসাহ থাকলেও, নতুন কালোপযোগী আদর্শ শিল্পপতির মনোভাব বা চরিত্র তাঁর ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক মনোভাবের এক বিচিত্র বিসদৃশ সংমিশ্রণ তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল। এই দুকূল-মুখী মন তাঁর বাণিজ্যিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

৫. দ্বারকানাথের বেহিসেবী ভোগবিলাসিতা ও বদান্যতা যে তাঁর বাণিজ্যিক ব্যর্থতার আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সেকথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উৎসব-পার্বণে, সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি অজস্র টাকা ব্যয় করতে একটুও

কুণ্ঠিত হতেন না। দানধ্যানও তিনি প্রকৃত দানবীরের মতো করতেন। তাঁর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে যাননি এবং তাঁর বাদশাহী ভোজনৃত্যের অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি, এরকম সম্ভ্রান্ত ইংরেজ, ভারতীয় ও বাঙালী তখন কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির অনুষ্ঠানে যাওয়াটা তখনকার দিনে ইংরেজরাও সামাজিক 'স্টেটাস' প্রতিষ্ঠার দিক থেকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে এই বাগানবাড়ির ভোজনৃত্যের উৎসবে, আতশবাজি ও আলোর বিচিত্র খেলায়, আমোদপ্রমোদের বিলাসে ঠিক কর্পূরের মতো উপে গিয়েছে তার হিসেব নেই। ১৮৫৬ সালে এই বাগানবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। "হা, যে উপবন প্রস্তুত করণে দ্বারকানাথবাবু দুইলক্ষ টাকার অধিক ধন বিসর্জন করিয়া ছিলেন এবং যে কাননে এক ২ রজনীতে ইংরাজাদি ভোজনে দশ বিশ সহস্র উড়িয়া গিয়াছিল, গত শনিবারে সেই বাগান বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ৫৪ চুয়ান্ন সহস্র মুদ্রায় তাহা ক্রয় করিয়াছেন" (সম্বাদ ভাস্কর, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬)। জামসেদজী টাটার প্রথম লোহা-ইস্পাতের কারখানার মতো অন্তত একটি কারখানার মূলধনও সেই টাকা দিয়ে যোগান দেওয়া সম্ভব হত মনে হয়। আর তার অর্ধেক টাকাও যদি অপব্যয় না হত তাহলে বিলেতে তাঁর মৃত্যুর পরে 'কার-ট্যাগোর কোম্পানি' কখনও দেউলিয়া হত না এবং দেবেন্দ্রনাথকেও পিতৃঋণের দায়ে বিপন্ন হতে হত না। বিলেতে থাকার সময় যে বিলাসিতার বহর তিনি দেখিয়েছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পরে লোককাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। বিলেতের লর্ডরাও দ্বারকানাথের বিলাসিতা ও ব্যয়ের বহর দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিলাসিতা মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহের বিলাসিতা, আধুনিক যুগের শিল্পপতির বিলাসিতা নয়। আধুনিক যুগের শিল্পপতির মন হিসেবী মন। দ্বারকানাথের মন ছিল সেকালের রাজা-বাদশাহের মন, বেহিসেবী মন। বেহিসেবী মন নিয়ে স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া যায় না, দ্বারকানাথও তাই হতে পারেননি।

রামদুলাল দে সরকার (দেব) : 'আশুতোষ দে (দেব) অ্যাণ্ড নেফিউজ'

কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছেন, এবং কানাকড়ি থেকে কোটিপতি হয়েছেন ব্যবসা করে, এরকম দৃষ্টান্ত বাঙালী সমাজে বিরল। দ্বারকানাথের একপুরুষ আগে এই বিরল দৃষ্টান্তের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হলেন রামদুলাল দে সরকার। শেষ জীবনে রামদুলাল কোটিপতি নামে পরিচিত হয়েছিলেন এবং বিলেতের 'লণ্ডন টাইম্স' পত্রিকা তাঁর পুত্রদের 'Rothschilds of Bengal' বলে সম্বোধন করতেও কুণ্ঠিত হননি। ইংরেজ আমলের আদিপর্বের বাঙালী ধনপতিদের ধনার্জনের কীর্তি সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়। রামদুলাল সম্বন্ধেও এরকম কাহিনীর অভাব নেই। কলকাতার কাছে দমদম অঞ্চলে একটি গ্রামে রামদুলাল অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দিদিমা কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনীব্যবসায়ী মদন দত্তের পরিবারে রাঁধুনির কাজ করতেন। রামদুলাল ছেলেবেলায় কলকাতায় এসে এই দত্ত পরিবারের আশ্রয়ে সামান্য কিছু লেখাপড়া শেখেন এবং খেয়ে-পরে মানুষ হন। মদন দত্তের সান্নিধ্যে ব্যবসায়ের প্রেরণা ছেলেবেলা থেকে তাঁর মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। প্রথমে মদন দত্তের কাছে তিনি বিল-সরকারের কাজ করেন (বেতন মাসিক ৫৲ টাকা), পরে শিপ-সরকারের কাজে নিযুক্ত হন (বেতন মাসিক ১০৲ টাকা)। এই সময় মালিকের নামে একখানি ডুবোজাহাজ কিনে তিনি যে ব্যবসায়ী বুদ্ধির পরিচয় দেন তাতে মদন দত্ত খুশি হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। এই পুরস্কারের টাকা নিয়ে রামদুলাল স্বাধীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তারপর তাঁর জীবনের ইতিহাস কেবল ভাগ্য, সাফল্য ও টাকার ইতিহাস। রামদুলালের শেষ জীবন পর্যন্ত এই ইতিহাস কেবল অবিরাম অগ্রগতির ইতিহাস। তাঁর মৃত্যুর পর বাকি ইতিহাস ক্রমিক অবনতির ইতিহাস, যে ক্রমাবনতির সঙ্গে তাঁর মতো আরও অনেক বাঙালী ধনিক পরিবারের ইতিহাসের সাদৃশ্য আছে।[২১]

রামদুলাল Fairlie Fergusson & Co-র বেনিয়ান ছিলেন। ব্রিটিশ এজেন্সি হৌসের মধ্যে বোধহয় বৃহত্তম ছিল এই কোম্পানি। "The transactions of that House would strike the merchant of the present day as mythical"—(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)। বাজারে এই কোম্পানির এমন প্রতিপত্তি ছিল যে এর দালালরা কোন জিনিস চাইলে তা আর অন্য কেউ

পেত না। এই কোম্পানির বেনিয়ান হিসেবে রামদুলালের সুনাম, প্রতিপত্তি ও 'ক্রেডিট' বাজারে অদ্বিতীয় ছিল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকর্ম রামদুলালের কথায়, এবং সামান্য ইশারায়, চলত। পামার কোম্পানি, আলেকজাণ্ডার কোম্পানি, ম্যাকিনটস কোম্পানি ছিল তখনকার বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, এবং পরবর্তীকালের পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠানের কাজ এরা একাই তখন করত। তার মধ্যে রামদুলাল যে-কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। টাকায় দু'পয়সা চার পয়সা দস্তুরি পেয়ে রামদুলাল এই বেনিয়ানির কাজ থেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন: "Ramdoolal may justly be said to be the pioneer of American commerce in Bengal." আঠার শতকের শেষে আমেরিকা স্বাধীন দেশ হবার পর থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে তার বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে প্রধানত রামদুলাল দের মাধ্যমে। রামদুলাল তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী, বিদেশে চীন থেকে ইংলণ্ড আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মৃত্যুর পরে ব্যবসায়ের খাতাপত্র থেকে যে সমস্ত আমেরিকান বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া গিয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায় আমেরিকার সঙ্গে রামদুলালের ব্যবসা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল:

বস্টন

G. R. Minot, G. Warren, J. Young, J. S. Amory, T. Wigglesworth, J. T. Coleridge, H. Irving, J. J. Bowditch, B Rich and Son, E. Rhodes, F. W. Everitt, W. Godard, Mackie and Coleridge, H. Leo, O. Godwin, Theuring and Perkins-

নিউ ইয়র্ক

Messrs. Lennov & Son, G. S. Higginson, Messrs. C. & D. Skinner, Messrs. Singleton & Mezick, S. Austin Junior, W. C. Appleton, E. B. Crocker, E Davies, J. J. Dixwell, W. A. Brown, A. Baker Junior, G. Brown, T. C. Bacon, M, Curtis, Baring Brothers.

ফিলাডেলফিয়া

Messrs. Grant & Stone.

সালেম

Pickering Dodge, W. Landor.

নিউবেরি পোর্ট
The Hon'ble E. S. Rant, J. H. Telcombe.

মারভেলহেড্
J. Hooper.

আমেরিকার ব্যবসায়ীরা রামদুলালকে এমন শ্রদ্ধা করতেন যে একটি আমেরিকান জাহাজের নামকরণ তাঁরা করেছিলেন রামদুলালের নামে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের একটি প্রোট্রেট (৯ ফুট×৬ ফুট) তাঁরা রামদুলালকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। এই পোট্রেটটি রামদুলালের পুত্র ও নাতিরা (আশুতোষ দে অ্যাণ্ড নেফিউজ) তাঁদের প্রতিষ্ঠানের আপিসে সযত্নে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। রামদুলালের বাণিজ্যের পণ্য তাঁর নিজের চারখানি জাহাজে বিদেশে যাতায়াত করত—তার মধ্যে একটি জাহাজের নাম 'রামদুলাল দে', একটির নাম 'বিমলা' (তাঁর বড় মেয়ের নামে), একটির নাম 'ডেভিড ক্লার্ক' (ফার্গুসন কোম্পানির একজন অংশীদার)। তখনকার দিনে (১৮২০-২৫) রামদুলাল তাঁর কর্মচারীদের মাসিক বেতন দিতেন পনের হাজার টাকা, আজকালকার দেড়লক্ষ টাকারও বেশি।

রামদুলালের মৃত্যুর (১ এপ্রিল ১৮২৫) প্রায় ৪৩ বছর পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন: "The house established by Ramdoolal still flourishes amongst us, being carried on by the grandsons of the millionaire on the daughter's side under the style of Ashootosh Deb and Nephews···The fame for honesty and capacity established by Ramdoolal is still maintained by this house, which continues to transact direct with the merchants of Boston, Newyork and Philadelphia, without the intervention of any English or American Agents." কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও প্রতিপত্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রামদুলালের বর্তমান বংশধররা সাতুবাবু-লাটুবাবুর (রামদুলালের দুই পুত্র আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব) বাবুগিরির জরাজীর্ণ ঐতিহ্যের অনুরাগী, না পূর্বপুরুষ রামদুলালের বাণিজ্যকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বলা কঠিন।

রামদুলাল, তাঁর দুইপুত্র ও নাতিদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য (Commerce) করেছেন তাঁরা, কিন্তু কখনও স্বাধীন শিল্পোদ্যমের (Industrial Enterprise) দিকে আকৃষ্ট হননি। কেন হননি ? ব্রিটিশ শিল্পনীতির প্রতিকূলতার জন্য ? মনে হয় না। রামদুলাল ও তাঁর বংশধরদের মনোভাব আধুনিক যুগোপযোগী ছিল না। ঠাকুর পরিবারে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল, দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁদের আধুনিক ছিল, যদিও জমিদারীর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা আত্মরক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। রামদুলালদের পরিবারে তাও ছিল না। রামদুলাল নিজে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং এই গোঁড়ামির জন্য বহু লক্ষ টাকা তিনি অপব্যয় করেছেন, অবশ্য দ্বারকানাথের মতো ব্যক্তিগত বিলাসিতার দিকে রামদুলালের আদৌ কোন নজর ছিল না। বরং সেদিক থেকে তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। পিতার সরল জীবনযাত্রার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দুইপুত্র সাতুবাবু ও লাটুবাবুর চরম অসংযত বিলাসিতার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। নাচ-গান-হল্লায়, কবিগানে-আখড়াই গানে, বুলবুলির লড়াইয়ে, শখের পায়রা ও বাঁদরের বিয়েতে, বাইনাচ ও খ্যামটানাচে—এই-দুই বাবু-ভাই পিতার লক্ষ লক্ষ টাকা তামাকের ধোঁয়ার মতো উড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া আশুতোষ দেব গোঁড়া হিন্দুসমাজের পোষকতার জন্যও (ধর্মসভা) কম টাকা নষ্ট করেননি। জাতরক্ষা, সমন্বয়, কৌলীন্য রক্ষা ইত্যাদির জন্য তাঁর পিতার মতো তিনিও হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। দ্বারকানাথের মতো সাতুবাবুদেরও শখের বাগানবাড়ি ছিল বেলগাছিয়ায়। সেখানেও কয়েক লক্ষ টাকা অনুষ্ঠান-আপ্যায়নের বিলাসিতায় তাঁরা ব্যয় করেছেন।

মৃত্যুর সময় রামদুলাল প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এই টাকায় তাঁর পুত্র ও নাতিরা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানকে বৃহত্তর করতে পারেননি, বরং তার অবনতির পথই ধীরে ধীরে প্রশস্ত করেছিলেন। বাণিজ্যের বদলে স্বাধীন শিল্পোদ্যমের কথা তাঁরা চিন্তাও করেননি। অথচ রামদুলালের সারাজীবনের সঞ্চিত যে বিপুল মূলধন তাঁরা পেয়েছিলেন তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের টাটা বা বোম্বাই-এর মিলমালিকদের মতো বড় বড় কলকারখানার মালিক তাঁরা হতে পারতেন। কিন্তু সেদিকে কোন উদ্‌যোগের আভাস পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ মূলধন তাঁরা একটুও বাড়াতে পারেননি, বরং দিনের পর দিন, বছরের পর বছর,

ভোগবিলাসিতায় ও নানারকমের আনুষ্ঠানিক বাহ্যাড়ম্বরে তা ক্ষয় করেছেন। এই ক্ষয়ের জন্য ব্রিটিশ শিল্পনীতি কতটুকু দায়ী ?

রামদুলাল দে তাঁর দুই পুত্রের বিবাহের জন্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ করেন—"He spent three lacs of rupees on the marriage each one of his sons"—(গিরিশচন্দ্র)। গবর্নমেণ্ট গেজেটে রামদুলাল বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর দুই পুত্রের বিবাহের আমন্ত্রণ সকলকে জানান (৭ ও ১১ ফাল্গুন ১২২৬)। বিবাহ উপলক্ষে দু'দিন শুধু ইংরেজদের খানাপিনা ও আপ্যায়নের জন্য নির্ধারিত হয় আর চারদিন মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য পৃথকভাবে ঠিক করা হয়। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রিতদের ভোজের জন্য ইংরেজি খানা, আরবী ও মোগলাই খানা এবং হিন্দুখানার ব্যবস্থা করা হয়। বাকি অনুষ্ঠান যা হয় তা কল্পনা করাই ভাল।[২২] ১৮২০ সালে ৬ লক্ষ টাকা বিবাহের খরচ আজকের দিনে ১ কোটি টাকা যাঁরা খরচ করতে পারেন তাঁরা বুঝতে পারবেন।

রামদুলালের জীবদ্দশায় তাঁর দুইপুত্র সাতুবাবু-লাটুবাবু মধ্যে মধ্যে বাড়িতে নাচগানের আসর বসাতেন। বাইজির নুপুরের আওয়াজ ও কণ্ঠস্বর রামদুলালের কানে পৌঁছত, তাতে তাঁর হিসেবের খাতা লেখার অসুবিধা হত। পুত্রদের ডেকে তিনি বলতেন—'এটা একজন ব্যবসায়ীর বাড়ি, সেকালের আমীর-ওমরাহের বাড়ি নয়। নাচগানটা যত কম হয় তত ভাল।' রামদুলাল তখন ভাবতে পারেননি যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সিন্দুকের টাকা সাতু-লাটুবাবুদের বাইজির নৃত্যরত পায়ের তলা দিয়ে অনর্গলধারায় বয়ে যাবে। ধর্মভীরু রামদুলাল বাইজি নাচাননি, কিন্তু বারাণসীতে তেরটি শিবমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই মন্দির আজও বারাণসীতে আছে। তার জন্য তখন তিনি খরচ করেছিলেন ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। পাঁচদিন ধরে বারাণসীতে তার জন্য গরীব-দুঃখীদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল। তার জন্য কত হাজার টাকা খরচ হয়েছিল তার হিসেব নেই। এই উপলক্ষে রামদুলালের সাধ্বী স্ত্রীকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়েছিল সোনা-জহরৎ দিয়ে এবং তার মূল্য হয়েছিল লক্ষ টাকার উপর। এই টাকা বারাণসীর ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের দান করা হয়েছিল।

রামদুলালের মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত টাকা দিয়ে তাঁর যে শ্রাদ্ধ করা হয়েছিল তার কাহিনীও রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর। শ্রাদ্ধসভায় বাংলাদেশ ও কাশী কাশ্মীর সৌরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র কাঞ্চী কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে শুধু

ব্রাহ্মণপণ্ডিত এসেছিলেন সাত-আট হাজার। আমন্ত্রিতদের বাদ দিয়ে প্রায় একলক্ষ কাঙালী ভোজন করানো হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন—"The entire expense of this *Shrad* amounted to five lacs of rupees"—কিন্তু 'সমাচার দর্পণ' লিখেছেন: "ইহাতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে নাই।"[২৩] রামদুলালের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধে, অর্থাৎ আশুতোষ দেবের মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।[২৪] এই কয়েকটি অনুষ্ঠানের হিসেব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় রামদুলালের সময় থেকে দুইপুরুষের মধ্যে তাঁর পরিবারে শুধু বিবাহ ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। তাঁর মোট মূলধনের (১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা) অন্তত চারভাগের একভাগ হবে বলে মনে হয়। আর একভাগ অন্তত তাঁর পুত্র ও নাতিরা যে ভোগ-বিলাসিতার খাতে ব্যয় করেছিলেন তাও অনুমান করতে বাধা নেই। বাকি অর্ধেকের বেশ কিছুটা গোঁড়া হিন্দুয়ানির দানধ্যানে ও ধর্মকর্মে যে গিয়েছে তাও বোঝা যায়। বংশধররা যে-মূলধন একেবারে বাড়াতে পারেন নি, তা এইভাবে অতিক্রুত দু-তিন পুরুষের মধ্যে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। রামদুলালের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান লোপ পেয়েছে। তাঁর বংশধররা কলকাতার ও গ্রামাঞ্চলের জমিদারীর নিষ্ক্রিয় স্বত্বভোগীতে পরিণত হয়েছেন। এই পরিণতির কারণগুলি নিশ্চয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিল্পনীতি যোগান দেয় নি। দ্বারকানাথের ক্ষেত্রে খানিকটা দিয়েছিল, কিন্তু রামদুলালের ক্ষেত্রে বোধহয় একেবারেই নয়। তাহলে কারণটা অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হয়।

১৮৪৬ সালের Bengal Directory-তে ৯২টি ব্রিটিশ বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের এজেন্টদের নাম আছে, তার মধ্যে ৪টিতে বাঙালী অংশীদার আছেন।

Carr, Tagore & Co.—Colvin's Ghaut

দ্বারকানাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Aylwin & Co.—no. 17. Strand

শম্ভুচন্দ্র দাস

Kelsalls & Ghosh—no. 5. Bankshall Street.

রামগোপাল ঘোষ

Oswald, Seal & Co.

হীরালাল শীল

বাকি ৮৮টি এজেন্সি হাউসের মধ্যে কোন বাঙালী অংশীদার নেই।

১৮৪৬ সালের সুপ্রীম কোর্টের জুরিদের নামের তালিকাতে দেখা যায়, মোট ২৫১ জনের মধ্যে ৪০জন ভারতীয়, বাকি সকলে ইংরেজ, এবং ৪০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৩৭ জন বাঙালী, ৩জন পার্সী। পার্সী তিনজনই বণিক। বাঙালীদের মধ্যে—

বেনিয়ান—১৯	বণিক— ২
জমিদার—১২	খাজাঞ্চি—১
সরকার— ২	দেওয়ান—১

দু'জন বণিক হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামগোপাল ঘোষ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও আছে, কিন্তু তাঁর নামের পাশে লেখা আছে 'জমিদার'। এই ৩৭ জন বাঙালী নিঃসন্দেহে কলকাতার নাগরিক সমাজের, এবং বাঙালী সমাজেরও, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু বেনিয়ানী, জমিদারী ও চাকরি ছাড়া বাণিজ্যের পেশা মাত্র দু'জনের। এই দু'জনের মধ্যে দ্বারকানাথের বাণিজ্যের কথা আমরা আগে সংক্ষেপে বলেছি। তার সঙ্গে রামদুলাল দে'র কথাও বলা হয়েছে।

বাঙালীর শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বিরাগের সমালোচনা

উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রে শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বাঙালীর নিস্পৃহতা ও উদাসীনতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সর্বত্রই সমালোচনার যুক্তি প্রায় একরকম এবং তার তীব্রতা ও কঠোরতার মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। এই সমালোচনার যথেষ্ট সামাজিক তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন (১২৬০):[২৫]

"এই বঙ্গদেশ মধ্যে অনেক ধনাঢ্য লোক আছেন, তাঁহারা যদ্যপি আপনাপন ধন দ্বারা ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করেন তবে অন্যান্য লোকসকল তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের

অনুগামি হইতে পারেন, সুতরাং এই রাজ মধ্যে বাণিজ্যের আতিশয্য হয়, একথা অতি যথার্থ বটে, ফলতঃ যাঁহারা অতুল ধনের অধিকারি হইয়াছেন, তাঁহারদিগের আবার সেই প্রকার সাহস নাই, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহেব বিশেষের অধীনে মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করিতে পারেন, তথাচ স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিতে পারেন না··· অনেকে কোম্পানির কাগজকেই ভাল জানিয়াছেন। আমারদিগের রাজপুরুষেরা কোম্পানির কাগজের সুদ এত ন্যূন করিতেছেন, তথাচ সকলে কাগজ রাখিবার ইচ্ছা করিতেছেন।"

প্রভাকর বলছেন যে বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা অতুল ধনের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের আবার স্বাধীন বাণিজ্য করবার মতো সাহস নেই। তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহেবের অধীনে মুচ্ছুদ্দির কাজ করতে পারেন, অল্পসুদে কোম্পানির কাগজও কিনতে পারেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারেন না। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন (১২৫৪) :[২৬]

"অস্মদ্দেশীয় লোকেরা মনের মধ্যে এমত ঠিক দিয়া রাখিয়াছেন যে, পরিশ্রমের নাম দুঃখ এবং আলস্যের নাম সুখ, সুতরাং যাঁহারা বিনা পরিশ্রমে অন্নদাস হইয়া অথবা যৎকিঞ্চিৎ উপস্বত্ব পাইয়া ঘরে বসিয়া কেবল বংশবৃদ্ধি করিতে পারিলেই সুখ জ্ঞান করেন আমরা তাহারদিগ্যে কি কথা উল্লেখ করিব বিবেচনা করিতে পারি না, দেশের লোক এরূপ না হইলে দেশের অবস্থাই বা কিরূপে এমত কদর্য হইবেক, বিদেশের বাণিজ্য দূরে থাকুক, দেশের বাণিজ্যে মনোযোগি হইলেই রক্ষা পাই, জাহাজে চড়া (বাপ রে) অনেক দূরের কথা, কালনা, মুর্শিদাবাদ, রামপুর ইত্যাদি স্থানে দেশজাত দ্রব্যের বাণিজ্য কয়জন ভদ্রসন্তান করিয়া থাকেন? যাহাদের কিঞ্চিৎ অর্থ আছে সাহেব কেনা রোগেই তাঁহারদিগের সর্বনাশ হয়, সেই টাকায় যদি আপনারা স্বাধীনরূপে ব্যবসা করেন তবে কত সম্মান কত সৌভাগ্য হইতে পারে, তাহা না করিয়া বাবুজিরা এক ২ টা সাহেব কিনিয়া বসেন·· "

এইকথা বলে প্রভাকর মন্তব্য করেছেন যে সাহেবরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁদের ঐশ্বর্য বলতে থাকে শুধু একটা ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট-পাতলুন এবং একটা কাঁচের টম্বল। কৌশল করে কোন ব্যবসা ফেঁদে বসে একজন বাবু কাড়তে পারলেই কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের আর আধিপত্যের সীমা থাকে না, তখন তাঁরা একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে ওঠেন, ঘোড়া গাড়ি সহিস বেয়ারা খানসামা ইত্যাদির ধুম পড়ে যায়। "আমরা কি মূর্খ আর সাহেবেরা কি চতুর আমারদিগের টাকায় ও আমারদিগের পরিশ্রমে সৌভাগ্য করিয়া আবার কথায়

কথায় আমারদিগ্যেই রাস্কেল বলে, ঘুষি মারে, চক্ষু রাঙায়।" ধনিক বাঙালী বাবুদের 'সাহেব কেনা' একটা রোগ এবং নিঃসম্বল চতুর ইংরেজদের 'বাবু-কাড়া' একটা কৌশল বলেছেন প্রভাকর। প্রভাকর লিখেছেন (১২৬১): [২৭]

"বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালি হইয়াছেন তাঁহারা সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা উপার্জন করণেই অধিক যত্নশীল, সুতরাং স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণের নিয়ম এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে…"

প্রভাকর দুঃখ করে লিখেছেন (১২৯৯) যে বাংলাদেশ মুটে ও চাকরের দেশে পরিণত হয়েছে [২৮]

"তাঁহাদের ধনে বিদেশের লোক বড়মানুষ হইতেছে, রঙ্গে রত্নে অনঙ্গ দেশ ঐশ্বর্যশালী হইতেছে, বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন। মুটেরা তাহাদিগের মাতৃগর্ভজাত মহামূল্য রত্নজাত মাথায় করিয়া বিদেশী বাণিজ্যপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরেরা সহাস্যবদনে বৈদেশিক সওদাগরী হাউসে সেইসকল রপ্তানী রত্নের তেরিজ জমাখরচাদি শুদ্ধ রোকড় সই হিসাব রাখিতেছে।"

বাঙালীর আলস্য প্রসঙ্গে প্রভাকর লিখেছেন (১২৫৪): [২৯]

"যে দেশের লোকেরা আলস্যকে আলিঙ্গন প্রদান-পূর্বক অহরহ বিনা পরিশ্রমে কালক্ষয় করেন, তাঁহারা আপন দেশকে পরের অধীন করিয়া চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন…এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা যদি আলস্য পরিত্যাগপূর্বক ইংলণ্ডবাসি লোকদিগের মত শিল্পবিদ্যায় অনুরাগি হওত বিভিন্নরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং জাত্যাভিমান পরিহার করিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যে উৎসুক হয়েন তবে দুঃখের লেশমাত্র থাকিতে পারে না…অধুনা অত্যল্প মনুষ্যের অন্নের সঙ্গতি আছে, নচেৎ প্রায় সকলেই নির্ধন হইয়াছে, কলিকাতাস্থ ধনিদিগের মধ্যে অনেকেরি শুদ্ধ কোম্পানির কাগজ সম্বলমাত্র।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছেন (১৭৭৮ শক): [৩০]

"এক্ষণে যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সমধিক অর্থাগম হইতে পারে, প্রায় তার অধিকাংশই এদেশীয় লোকের পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য ও অনায়ত্ত। ইহারা যেমন কোন বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে অপটু এবং উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক-ধন উপার্জন করিতে অক্ষম, সেইরূপ কোন উৎকৃষ্ট রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেও অসমর্থ…অধুনা বঙ্গদেশীয় লোকে যে প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, এবং এক্ষণে বঙ্গদেশ মধ্যে যে প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে করিয়া এদেশীয় সর্বসাধারণ লোকের দুঃখ দূর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে।

বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা কৃষি ও বণিক লোকেরই উন্নতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু এ বঙ্গদেশে উক্ত দুইপ্রকার লোকের অপেক্ষা বেতনভুক কর্মচারি লোকের সংখ্যাই অধিক। এদেশীয় অধিকাংশ মনুষ্যই নির্দিষ্ট বেতনে শ্রম করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে।"

বাংলাদেশে যে ব্যবসায়ীর চেয়ে বেতনভুক চাকুরিজিবীর সংখ্যা অনেক বেশি সেকথা ১৮৫৬ সালেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন। পরে এবিষয়ে লিখেছেন (১৭৯২ শক):[৩১]

"এক্ষণে আমাদের দেশে আর সকল বিষয়ে উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। আমাদের যুবকেরা আর সকল বিষয়েই যশোলাভ করিতেছেন; কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ওকালতি, কি চিকিৎসা, সকল বিষয়েই জয়লাভ করিতেছেন; কেবল এই এক বিষয়ে—বাণিজ্য ব্যবসায়ে এখনও তাঁহারা নিরুদ্যম রহিয়াছেন। এ বিষয়ে বোম্বাই-এর ভ্রাতৃগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, সম্প্রতি দুইজন বোম্বাই প্রদেশস্থ হিন্দু, মারকিন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ও তত্রত্য কারখানা প্রভৃতির কার্য-প্রণালী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। বঙ্গীয় যুবকেরা তাঁহাদের এই প্রশংসিত দৃষ্টান্ত কেন না অনুসরণ করেন?"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাঙালী যুবকদের বোম্বাইবাসীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে অনুরোধ করেছেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগী হতে বলেছেন। ১৮৭০ সালের কথা।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক বাংলাদেশের এক ধনী ব্যক্তির একখানি চিঠি প্রকাশ করেছেন (১৮৪৯)। চিঠিখানি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য:[৩২]

"...সম্পাদক মহাশয়, আমি বিলাতীয় হুণ্ডী, কোম্পানির কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিতাম, এবং প্রজালোককে ধান্যের বাড়ি নিয়মে ধান্য দিতাম, আর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য কাটা হইলে জমীদারেরা রাজস্বের জন্য ধান্যক্ষেত্রে আটক করিতে আমি অধিক সুদি খত লেখাইয়া লইয়া প্রজাদিগকে রাজস্বের টাকা দিতাম, এবং সোনারূপা হীরকাদি বন্ধক রাখিয়া ভদ্রলোকদিগকে গত পাঁচ বৎসরে অনেক টাকা দিয়াছি, এইক্ষণে বাজার এমত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে আসল টাকা দূরে মরুক তাহার পাঁচ আনা বাদ দিয়াও মূলধন উঠাইবার উপায় দেখিতেছি না, কোম্পানির কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছি, কিঞ্চিৎ লাভের জন্য চারি টাকা সুদি এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়াছিলাম। কোম্পানি বাহাদুর পাঁচ টাকার কাগজ

বাহির করিয়া দিলেন অমনি চারি টাকার কাগজের দর কম হইয়া পড়িল, তখন যদি হাজারে কিছু টাকা নোকশান করিয়া ছাড়িয়া দিতাম তবে এখন এত দুঃখ হইত না, তৎকালে কুবুদ্ধি হইয়াছিল কিছুকাল পরে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে কিন্তু এইক্ষণে সেই কাগজ মাটী হইয়া গিয়াছে, অতএব আশী হাজার টাকার কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বিলাতি হুণ্ডীর প্রতি আর কেহ বিশ্বাস করেন না, বাণিজ্য হৌসের মহামারীর পুর্বে অনেক টাকার হুণ্ডী ক্রয় করিয়া সে টাকা জলে দিয়াছি…।”

এই চিঠিখানি থেকে বিত্তশালী বাঙালীর টাকার কর্মলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিলেতী হুণ্ডী ও কোম্পানির কাগজ কেনা-বেচা করা, এবং অত্যধিক সুদে টাকা খাটানো, এই ছিল বড়লোক বাঙালীর প্রধান কাজ।

অর্থনীতিক্ষেত্রে ধনিক বাঙালীর এই রক্ষণশীল মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন ‘সোমপ্রকাশ’ একাধিক রচনায়। ইংরেজদের বিনা মূলধনে ব্যবসাপ্রসঙ্গে ‘সোমপ্রকাশ’ লিখেছেন (১২৭১):৩৩

“আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, অমুক ইউরোপীয় অমুক ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। অমুক বাবু মুচ্ছুদ্দি হইলেন (পাদটিকা : ‘ধনী বাবুদিগের অনেকে স্বয়ং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া বড় কষ্টস্বীকারে অগ্রসর হন না, বসিয়া যা কিছু লাভ করিতে পারেন সেই চেষ্টায় যান, শেষে লাভের মূলে জল দিয়া নিশ্চিন্ত হন।’) দিনকয় পরে শুনিতে পাই, তিনি ফেইল হইয়াছেন। বাবু টাকার নিমিত্ত ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন। বাজারের লোকেরা বাবুকে ধরিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ওদিকে সেই ইউরোপীয় নাম ফিরাইয়া আর দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। নীলপ্রধান প্রদেশে যে এত অত্যাচার হয়, অধিকসংখ্য মূলধনশূন্য ব্যক্তির ব্যবসায়ে প্রবৃত্তিই তাহার প্রধান কারণ। যাহারা এইরূপ নীল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের মূলধন থাকে না। সুতরাং প্রজার শোণিত আকর্ষণ পুর্বক অবয়ব পুষ্ট করিতে হয়। আমরা জানি অনেকে এই প্রকারে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছে। ইহাদিগের নিজের এক পয়সাও ছিল না। ঋণ ইহাদিগের ব্যবসায়ের মূল, দেউলিয়া আদালত ইহাদিগের পলাইবার পথ।”

ধনিক বাঙালীদের মুচ্ছুদ্দিগিরি প্রসঙ্গে ‘সোমপ্রকাশ’ যে মন্তব্য করেছেন তা লক্ষণীয়। তাঁরা নিজেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়ে বড়-একটা কষ্ট স্বীকার করতে চান না, বসে বসে বিনা আয়াসে কি উপায়ে সেই টাকা খাটিয়ে কিছু লাভ করতে পারেন সেই চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত লাভের মূলে জল ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন, অর্থাৎ টাকাটি জলে দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে অধিকাংশই বড়লোক বাঙালী মুচ্ছুদ্দি-বেনিয়ানের টাকায় ব্যবসা

করতেন, এমন কি নীলকররা পর্যন্ত, সেকথা এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে। ধনিক বাঙালীর মূলধন প্রধানত দেউলিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীর মারফত ভস্মে গিয়েছে। অন্তত তার অনেকটা অংশ যে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাকি অংশের অনেকটা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ধর্মকর্ম, উৎসব-পার্বণ ও বিলাসব্যসনে ব্যয় হয়েছে, আর খানিকটা সমাধিস্থ হয়েছে শহর ও গ্রামের বাড়িঘরে ও ভূসম্পত্তিতে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাঙালীদের তুলনা করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (১২৮৫):[৩৪]

"মেষেরা যেমন দলপতিকে কোনদিকে গমন করিতে দেখিলে অন্ধেও নির্বিকার-চিত্তে ও অবলীলাক্রমে সেই দিকে দলে দলে গমন করিতে থাকে, আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ, অমুক ব্যক্তি দ্রব্যের বাণিজ্য করিয়া এত লাভ করিলেন শুনিতে পাইলেন অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যত পারিলেন খরিদ করিলেন এবং যদি একবার মূলধনচ্যুত হইলেন ও চিরকালের জন্য বাণিজ্যকে প্রণাম করিয়া চাকুরির অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু বোম্বাইবাসীরা সেরূপ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বসিয়া না পড়িয়া কপাল ঠুকিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাহারও সাহায্য ভাগী হইয়া বাণিজ্য কার্যে রত হয় এবং অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অল্প দিনেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়। ফল কথা তাহারা আর বাঙ্গালিদিগের ন্যায় সামান্য একটি সূঁচ হইতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখ প্রত্যাশী থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা সাবান, দেশলাই, কাপড়, সূতা, প্রভৃতির কল বিলাত হইতে আনয়ন করিয়া এক্ষণে তাহার কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের কাছে কি কলিকাতার বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী নামে অভিহিত হইতে পারেন; ব্যবসায়ী বোম্বাইবাসী প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ যাঁহাদের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেণ্টসি পরীক্ষোত্তীর্ণ দুই জন ছাত্রের ১০০০০ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত আছে। আনুমানিক কোটি টাকা তাঁহাদের আয় ও পুণ্য কার্যেও অসংখ্য টাকা ব্যয়। ব্যবসায়ী আহম্মদাবাদে জলশত ভাই মন্নু ভাই। যাঁহাদের প্রথমে এক কপর্দকও সংস্থান ছিল না কিন্তু এক্ষণে কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য। ব্যবসায়ী মুরার জি গোকুল দাস ও মর মঙ্গল দাস থাম্ভু ভাই। যাঁহাদিগের কলে কাপড় ও সূতা বপন করিয়া কুলান করিতে পারিতেছে না। বাণিজ্য ব্যবসায়ী নারসী কেশব জী কোং। যাহাদিগের আফিঙ্গের ব্যবসায়ে কলিকাতাওয়ালা বড় বড় চতুর ব্যবসায়ীরাও সর্বদা শঙ্কিত ইত্যাদি। বাস্তবিক প্রকৃতরূপে ইহারাই মহাজন ও সওদাগর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে পারেন।"

এর পর 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন যে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে বাঙালীরা কোথায় মূলধন পাবেন এবং কেই বা তাঁদের সাহস দান করবে, তাহলে তার উত্তরে প্রথমেই আমরা বাঙালী জমিদার ও ধনীদের কথা বলব। তাঁদের হাত ধরে অনুরোধ করব—"ও ভ্রাতঃ কলিকাতা ও মফস্বলবাসী জমিদার ও ধনিগণ! আপনারা অতঃপর ৩ পার্শেণ্ট ও ৪ পার্শেণ্ট সুদে গবর্নমেণ্টে টাকা জমা না দিয়া ৪।৫।৬ জনে একত্রিত ও প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিদেশ হইতে বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি আনয়ন ও স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে বাণিজ্য জাহাজ পরিপূরণ করিয়া সমুদ্রপথে দূর দেশে চালান দিয়া বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত হও।" দুঃখের বিষয় এ আবেদনে কোন ফল হয়নি।

পাটকল ও পাটের ব্যবসার জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। এই পাটের ব্যবসার সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্ক সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (১২৮৭):[৩৫]

> "চটের ব্যবসায়-সংঘর্ষে বঙ্গদেশ স্কটলণ্ডকে পরাজয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে বঙ্গবাসীর কি লাভ হইয়াছে? বাঙ্গালীরা ঐ ব্যবসায়ের লাভের কত অংশ পাইতেছেন? প্রণিধানপূর্বক, যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় দৃষ্ট হইবে, লাভ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে সত্য, এবং কতকগুলি বঙ্গীয় শ্রমজীবী কলে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা পূর্বকার শিল্পজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। কলের সমস্ত টাকাই ইংরাজের, উহাতে বাঙ্গালী অংশী অতি অল্পই আছেন। সুতরাং লাভের অংশ সমুদয়ই ইংরাজের, বাঙ্গালীর কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীরা যে থলিয়া ও চটের কার্যে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে, তাহার যো নাই। আর অধিক কল চলিলে ব্যবসায় মন্দা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হস্তে প্রস্তুত করিয়া গুণের কারবার করিলেও কলের সহিত যুঝিয়া উঠা যাইবে না।... যদি বাঙ্গালী ধনিগণ অধিক পরিমাণে চটের কলে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিণামে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিতেন। কারণ বাঙ্গালায় অনেক সুবিধা আছে। যেখানে পাট জন্মে সেইখানেই কল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন সুবিধা নাই। এই সুবিধা থাকাতেই বাঙ্গালায় পাটের কলের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অনুদ্যম ও অনুৎসাহশীলতা ধনী বাঙ্গালীদিগের একটি প্রশস্ত আয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।"

বাংলাদেশে আগে হাতে-তৈরি চট অন্যতম গৃহশিল্প ছিল। চব্বিশপরগণা ও হুগলি অঞ্চল এই গৃহশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। পাটকল হবার পর এই

হাতের চটশিল্প বাজারের প্রতিযোগিতায় ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। পাটকল প্রধানত ব্রিটিশ মূলধনেই গড়ে ওঠে, তাই বাঙালীরা তাতে বিশেষ কিছুই লাভবান হন না। পাটচাষ করে চাষীদের কিছু লাভ হয় এবং কৃষিকর্ম ও গৃহশিল্প থেকে উৎখাত কিছু লোক পাটকলের মজুরে পরিণত হয়। 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন যে ধনিক বাঙালীরা উদ্যম ও উৎসাহের অভাবে পাটব্যবসায়ে যতটুকু অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল তা করতে পারেননি।

আজকাল আমরা দেখতে পাই যে সরকারী অফিসে একটি কেরানীর চাকরি খালি হলে তার জন্য দশ হাজারের কাছাকাছি পর্যন্ত দরখাস্ত পড়ে। এ উপসর্গ মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্রে নতুন নয়। পুরো উনিশ শতক ধরে (আঠার শতকও বলা চলে) এই চাকরিপ্রিয় বাঙালী চরিত্রের বিকাশ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ক্রমে যত বাঙালী মধ্যবিত্তের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে, তত চাকরি বাড়েনি এবং অল্প চাকরির জন্য তাই অত্যধিক লোক প্রার্থী হয়েছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (১২৮৮):[৩৬]

> "চাকুরীর মান বেশি হওয়াতে সেই লোভে অন্য কোন স্বাধীন চিন্তাশীল ও শ্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছাও করে না। কাজেই ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকার কার্য হতাদৃত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর এখন যেরূপ দুরবস্থা তাহার অপেক্ষা সামান্য মুদির দোকান করিয়া দিনাতিপাত করা ভাল। আমাদিগের সমাজে অলস অপদার্থ ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক বলিয়াই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাই শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ধনী ও দরিদ্র সকলেই ইউরোপীয়ের পদলেহনে প্রস্তুত। এখন কৃষিকার্য করা ভদ্রলোকের কর্ম নহে, তাহাতে লোক চাষা বলিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরও এ সংস্কার হওয়াতে ক্রমে লোকের চাকুরীপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই কারণে কৃষকেরা পর্যন্ত ভদ্র হইবার প্রত্যাশায় জাতিব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এখন চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। কর্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্মের মূল্য বাড়িতেছে, কাজেই দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশহাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।...যাবৎ লোকের মন হইতে চাকুরী প্রবৃত্তি বিদূরীত হইয়া দেশের উন্নতির চেষ্টা ও স্বাধীন কার্যে প্রবৃত্তি না জন্মিবে তাবৎ প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই...।"

১৮৮১-৮২ সালের লেখা, কিন্তু মনে হয় যেন ১৯৬৭-৬৮ সালে বাঙালীর চাকরির সমস্যা নিয়ে লেখা।

বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করে দেশের শিল্পোন্নতি হলে তাতে লাভ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নীলকর ও চা-করদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন যে এদেশের লোক দিয়ে এদেশের লোকের উপর অত্যাচার করানো এবং সেই মূলধন থেকে নিজেরা দশটাকা উপার্জন করা, এই হল আমাদের লাভ। রেলওয়ে প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন যে তার যে প্রকৃত লাভ তার আসল ভাগী ইংরেজরা, এদেশীয়দের লাভ দাসত্ব ও মজুরী। পাটকল বা অন্যান্য শিল্পকারখানায় ইংরেজরা যে মূলধন বিনিয়োগ করেছেন, তাতেও এদেশীয়দের চাকরি ও মজুরি ছাড়া আর অন্য কিছু বিশেষ লাভ হয় নি।[৩৭]

ইয়ং বেঙ্গল বা ডিরোজীয়ানরাও ধনিক বাঙালীদের মুচ্ছুদ্দিকর্ম ও আলস্য-বিলাসের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রতি অনুরাগী হতে বলেছেন। ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠীর মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখেছেন (১৮৩৯):[৩৮]

> "আমরা শ্রবণ করিতেছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছুদ্দিপদ প্রাপ্ত্যর্থ আর. সি. জ্যানকিন কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে কেবল দস্তুরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয়।...এমত সকল বৃহত ২ ধনী কিন্তু বাণিজ্য দ্বারা কিরূপে অর্থলাভ হয় কি প্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে একবারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থপ্রদান-পূর্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন।"

বিদ্যা ও বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'জ্ঞানান্বেষণ' বাণিজ্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন (১৮৩৮):[৩৯]

> "ইংলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্বসাধারণজনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন।...
>
> "আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাঁহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্নমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহারদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে ২ নানা কার্যে মূলধন বিনাশ পায়

আর কিছুদিন পরে আমরা দেখি যে ঐব্যক্তি হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন…"

রক্ষণশীল প্রগতিশীল নির্বিশেষে উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রে বাঙালীর বাণিজ্য-বিমুখতা সম্বন্ধে যে একসুরের সমালোচনা দেখা যায়, তার কারণ কি? কারণ হল, ব্রিটিশ আমলে নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে যতটুকু স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, এবং যে কারণে হয়নি সেটা শুধু বৈদেশিক শাসকদের নীতিগত বাধাবিপত্তি ও স্বার্থগত বিরোধের কারণ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সাময়িকপত্রে শতকরা পাঁচটি সমালোচনার মধ্যে ব্রিটিশ শিল্পনীতির অন্তরায়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রধানত নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালীর এবং ধনিক বাঙালীর এমন কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে যা তাঁদের স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের উদ্যমের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কয়েকটি সমালোচনা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়:

ক। যাঁরা ধনিক তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহেবদের অধীনে বেনিয়ানী ও মুচ্ছুদ্দিগিরি করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার সাহস নেই। এটা বড়লোক বাঙালীদের 'সাহেব-কেনা' রোগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ। কোম্পানির কাগজ কিনে অথবা অন্য কোন উপায়ে সুদ উপভোগ করা, জমিদারীর উপস্বত্ব থেকে আয় করা অথবা বাঁধা মাইনের চাকরি করা, এই তিনটে হল ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর অন্যতম পেশা। এই পেশা বা বৃত্তি অবলম্বনের কারণ হল, বাঙালীরা শ্রমবিমুখ ও আলস্যকাতর। কোন দুঃসাহসিক দায়িত্ব গ্রহণে তাই তাঁরা বিমুখ।

গ। বাণিজ্যিক বুদ্ধিও বাঙালীর তীক্ষ্ণ নয়। হঠাৎ কোন বাণিজ্য লাভবান হবে মনে হলে দু'চারজন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হয়ত সেইদিকে ছুটে যান, তারপর একটু আঘাত পেলে, অর্থাৎ লোকসান হলে সমস্ত গুটিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন, আর কোনদিন বাণিজ্যের পথে যেতে চান না। বোম্বাই পশ্চিমভারত প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মতো বাঙালীদের একাগ্রতা বা দৃঢ়তা বলে কিছু নেই।

বিভিন্ন সাময়িকপত্রের সমালোচনার এই হল মর্ম। ধনিক বাঙালীদের মুচ্ছুদ্দিগিরির ও সুদখোর প্রবৃত্তির কঠোর সমালোচনা সকলে করেছেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' মাধব দত্তের কথা উল্লেখ করে তাঁর মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্মগ্রহণকে 'অতি কুৎসিত' ও 'অতি নিন্দনীয়' আচরণ বলেছেন। যাঁরা পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হন তাঁরা, 'জ্ঞানান্বেষণ' বলেছেন, গবর্নমেণ্টের অতি ক্ষুদ্র কাজের ভার নিয়ে ঘরে বসে বৃথা কালক্ষেপ করেন এবং দু'এক পুরুষের মধ্যে তাঁদের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়। দেনার দায়ে হয় তাঁরা কারাবাসী অথবা আত্মীয়ের গলগ্রহ হন।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিশেষত্ব হল বিদেশী শাসকরা পরাধীন দেশটিকে বা উপনিবেশকে—

(১) তাঁদের নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের একচেটে বাজারে পরিণত করতে চান ("using the dependent country as a market for the products of its own manufacturing industry"—Gunnar Myrdal.)

(২) প্রাথমিক দ্রব্য বা কাঁচামালের প্রধান উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেন ("procuring primary goods from its dependent territory, and even in investing so as to produce them in plenty and at low cost"—Myrdal)

(৩) রপ্তানি ও আমদানি দু'রকমেরই বাজার করে তোলেন ("monopolising the dependent country as far as possible for its own business interests, both as an export and import market"—Myrdal)।[৪০]

ভারতবর্ষকেও এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি-আমদানির বাজার এবং কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁরা নিজেদের দেশের শিল্পোন্নতির স্বার্থে পরাধীন ভারতের শিল্পোন্নতি কাম্য বলে মনে করেননি। এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই, থাকতেও পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন যুগের শিল্পবাণিজ্যের স্বাধীন

পরিবেশে (এই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হলেও) ব্যবসাবাণিজ্যের ও শিল্পোত্তমের যেটুকু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, মূলধন থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের মতো ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তার সামান্য সদ্ব্যবহারও করতে পারেননি। এই অক্ষমতার আর্থনীতিক (economic) কারণের যত গুরুত্বই থাক, অনার্থনীতিক (non-economic) ও সমাজতাত্ত্বিক (Sociological) কারণের গুরুত্বও কম নয়।

বাঙালীর বাণিজ্যবিমুখতার সমাজতাত্ত্বিক কারণ

ব্রিটিশ আমলে বাঙালীসমাজে যে নতুন ধনিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয় তাঁদের চরিত্র কতকগুলি বিশেষ উপাদানে গঠিত। ইংরেজ শাসক ও বণিকদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ তাঁরা নানাদিক থেকে পেয়েছিলেন। এই সান্নিধ্য বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে নানা উপায়ে তাঁদের অর্থোপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিল। অধিকাংশ পথই সত্যকার 'enterprise'-এর পথ নয়, অনুগ্রহ-জীবীর মসৃণ পথ। এপথে চলতে হলে প্রকৃত বুদ্ধিমান না হলেও ধূর্ত ও শঠ হওয়া প্রয়োজন, এবং সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যক্তিগত (জাতিগত বা সমষ্টিগত নয়) উগ্র স্বার্থচেতনা। মহারাজা নবকৃষ্ণ, মদন দত্ত, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল ও অন্যান্য ধনিক বাঙালী যাঁরা আঠার শতকেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, তাঁরা এই উগ্র ব্যক্তিস্বার্থচেতনা থেকে পরস্পরের সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত থেকেছেন এবং শুধু নিজেদের আর্থিক আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেননি। ন্যায়বোধ ও নীতিবোধ তাঁরা একেবারে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ইংরেজতোষণ তাঁদের প্রতিষ্ঠালাভের অন্যতম কৌশল ছিল। কলকাতার হাটবাজারের ইজারাদারী, লবণ ও অন্যান্য বাণিজ্যপণ্যের দালালি, বেনিয়ান ও মুচ্ছুদ্দিরূপে ইংরেজপোষণ, দেওয়ান-সরকার-গোমস্তা-মুন্‌শী প্রভৃতি বিচিত্ররূপ ধারণ করে ইংরেজতোষণ ও প্রধানত দস্তুরিগত অর্থপ্রাপ্তি—এইগুলি ছিল একেবারে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকে ধনিক বাঙালীর অর্থ উপার্জনের অন্যতম পথ। এ পথ নিশ্চয় সৎসাহস, উত্তম ও স্বাধীনতার বিপদসঙ্কুল অথচ প্রশস্ত পথ নয়। যে-পথে ধনিক বাঙালীরা ধনসঞ্চয় করেছেন, (অবশ্য শুধু বাঙালীরা নন, এই সময় ভারতের

অন্যান্য অঞ্চলেরও ধনিকরা অনেকে এই উপায়েই ধন সঞ্চয় করেছেন) সে-পথ নোংরা অলিগলিপথ, চোরাগলি পথ, সর্পিল ও সংকীর্ণপথ। এই পথে যে কর্মে রত থেকে তাঁরা মুঠো-মুঠো ধুলো তাল-তাল সোনায় পরিণত করেছেন, তাতে হয়ত ম্যাজিসিয়ানের কৌশল আছে, কিন্তু পুরুষের পৌরুষ নেই, সাহস বা উদ্যমও নেই।

যদি একথা সত্য হয় যে—"Enterprise is *action of a relatively high order of vigor, inspired by the vision of achievement of some desirable and ambitious objective*"[৪১]—এন্টারপ্রাইজ বা শিল্পোদ্যম হল উচ্চস্তরের সাহস ও উৎসাহযুক্ত কোন কর্ম, যা কোন অভিপ্রেত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্দেশ্যের সাফল্যের দূরদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল ও অনুপ্রাণিত, তাহলে একথাও মনে হয় যে অর্থনীতিক্ষেত্রে ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালীদের কোন 'ambitious objective'-এর 'vision of achievement' ছিল না এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন কোন কর্মে তাঁরা প্রবৃত্ত হননি যাতে 'high order of vigor' প্রয়োজন হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামদুলাল দে'র মতো দু'একজন যাঁরা স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের 'action' ও 'vision' দুই-ই অনেকটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিবন্ধকতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দ্বারকানাথের মতো কেউ কেউ অমিতব্যয় ও অতিবিলাসে অনেক মূলধন ক্ষয় করেছিলেন, জমিদারীর নিশ্চিন্ত আয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ রামদুলালের মতো যথেষ্ট বণিক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার পাদমূলে অনেক 'মূলধন' উৎসর্গ করেছিলেন।

সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যে-কোন প্রকারে প্রচুর ধনসঞ্চয় করলে যে দেশের উন্নতির জন্য 'মূলধন' সৃষ্টি হয়, এ ধারণা ঠিক নয়। দেশের তিনজন লোক যদি কোটিপতি হন এবং বাকি সাতানব্বুই জন দারিদ্র্যের এমন স্তরে জীবনধারণ করেন যে এক পয়সাও সঞ্চয় (Saving) করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় না, তাহলে জাতীয় উন্নতির জন্য প্রকৃত মূলধনও সৃষ্টি হয় না। বাংলাদেশে অতিসংকীর্ণ একটি ধনিকশ্রেণী ব্রিটিশ আমলে সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু সমাজের বেশিরভাগ লোকের কিছু কিছু অর্থাগমের সুযোগ হলেও দারিদ্র্যই বেড়েছিল নানাকারণে। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এই কারণগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[৪২] 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন যে বাংলাদেশে

সাধারণলোকের দুঃখকষ্ট আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এমনকি যাঁরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন তাঁরাও একদিকে জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং অন্যদিকে পুরাতন সামাজিক প্রথার প্রতি আনুগত্যের জন্য বিশেষ সঞ্চয় করতে পারেন না। প্রথম কারণ, আগের চেয়ে জিনিসপত্রের মূল্য বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আয় বাড়েনি। আয় যেটুকু বেড়েছে তা মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কম। দ্বিতীয় কারণ, "সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের সংস্কার ও হৃদয়ের ইচ্ছার ব্যতিক্রম ঘটাতে, অনেক নূতন-বিধ ভোগ্যবস্তু, নূতন-বিধ সামগ্রী অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি না হইলে সমাজে হেয় ও অবগণিত হইতে হয়, সুতরাং সেগুলির আহরণের জন্য লোকে ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকে।" 'সোমপ্রকাশ' এখানে যে সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ আমলে লোকের জীবনযাত্রার (pattern of living) খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। বাজারে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তু আমদানির ফলে মানুষের 'consumption-pattern'-এরও পরিবর্তন হয়েছে। তারফলে সকলের ব্যয় বেড়েছে কিন্তু আয় বাড়েনি। দুঃখকষ্ট ও অভাববৃদ্ধির এও একটা বড় কারণ। এছাড়া আরও একটি কারণ 'সোমপ্রকাশ' উল্লেখ করেছেন যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "হিন্দুসমাজের পুরাতন রীতিনীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকাতে, যে, যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য বোধ হইতেছে না।" এই সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলি 'সোমপ্রকাশ' এইভাবে নির্দেশ করেছেন:

প্রথম হল 'একান্নবর্তিতা'। "ইহা যে লোকের দরিদ্রতাবৃদ্ধির অন্যতর কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নিষ্কর্মা, অথবা অল্পোপার্জক, একজন উপার্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে।" এই একান্নবর্তিতার ফলে পরিবারের (এবং সমাজেরও) অনেক লোক যৌবনকাল থেকেই শ্রমবিমুখ ও অলস হয়ে যায়। বহু নিষ্কর্মা লোক পোষণের ফলে যিনি পরিশ্রম করে উপার্জন করেন, তিনিও অর্থের সদ্‌গতি করতে পারেন না এবং ক্রমে শ্রম ও উপার্জন উভয় সম্পর্কেই তিনি উদাসীন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ একজন পরিশ্রমী ও উদ্‌যোগী পুরুষও একান্নবর্তী পরিবারের নিষ্পেষণে ক্রমে শ্রমবিমুখ ও অকর্মণ্য হয়ে যান। জাস্টিস ফিয়ার (Justice Phear) বেথুন সোসাইটিতে 'হিন্দু যৌথ পরিবার' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন (১৮ মার্চ ১৮৬৭)। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন:[৪৩]

"But while your system is admirable to look at on its affectionate and charitable side, it has a reverse; it takes away from the individual that stimulus to exertion which the sense of self-dependence alone can give. I have been often grieved, during the short time I have been among you, to see men of the middle ranks, in the prime of life, residing at the family house with their wives and children about them, in a state of perfect idleness.···Clearly it is antagonistic to any exhibition of energy. *It is fatal to the development of any true spirit of enterprise*, and in some sense affects the common appreciation of honesty." (*emphasis* added)

জাস্টিস ফিয়ারের এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ *The Bengalee* পত্রিকায় লেখেন এপ্রিল ১৮৬৭)[৪৪]

"Not one in a thousand, not one in ten thousand can talk of the Joint Hindoo Family without a shudder. Not a boy in his teens, not a youngman above 20, not a middle-aged man of forty, not an old man of sixty can contemplate the accursed Joint Family without a cold tremor convulsing his entire frame. The men are fiends, the women are furies in that same Joint Hindoo Family. It is well Mr. Justice Phear has raised the veil."

বিশ শতকের মধ্যভাগে পর্যন্ত বাংলাদেশে এই একান্নবর্তী পরিবারের যে কতদূর আধিপত্য ছিল তা ১৯৫১ সালের সেন্সাসের সার্ভে থেকে বোঝা যায়—"The survey indicates that the joint family system, far from disintegrating as is loosely imagined, is still quite strong both in the north and the south-west and even in the surroundings of the metropolitan industrial area of 24-Parganas."[৪৫] বাঙালীর আর্থনীতিক নিরুৎসাহ ও নৈষ্কর্ম্যের একটা বড় কারণ হল একান্নবর্তী পরিবারের সামাজিক প্রথা।

দ্বিতীয় কারণ হল 'বাল্যবিবাহ'। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন যে এই প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে আর্থিকক্ষেত্রে দু'টি অপকার হয়: (১) পুত্রকন্যাদের

উপার্জনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না, (২) ব্যয় ক্রমে বাড়তে থাকে। যেমন এক ব্যক্তির একটি পুত্র আছে। তিনি নিজে মাসে ৩০৲ টাকা উপার্জন করেন, তাতে কোনরকমে তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ চলে যায়। পুত্রটির ১৪।১৫ বছর বয়সে বিবাহ দেওয়া হল, তাতে একটি পরিবার বৃদ্ধি হল। পরে ১৮।১৯ বছর থেকে পুত্রটি সন্তানের জন্ম দিতে আরম্ভ করল। তখন তাঁর ৩৲ টাকাতে আর সংসার চলে না। কাজেই তিনি পুত্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। "শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং তাহারও উপার্জন অল্প হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানের স্রোত অপ্রতিহত রহিল।" এদিকে বৃদ্ধ পিতা অক্ষম হয়ে পড়লেন, তাঁর উপার্জনের ক্ষমতা রইল না। পরিবারের অবস্থা তখন কি হল? দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। তার উপর পুত্রটি চিরদিনের জন্য সমাজে একটি অপদার্থ হয়ে রইল, তার কোন আর্থিক ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকল না।

তৃতীয় হল—পিতামাতার শ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি ব্যয়বহুল সামাজিক প্রথা। এই প্রথাগুলির জন্য ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই বহু টাকা অপব্যয় হয়। তার জন্য টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না এবং দেশের মূলধনও বাড়ে না।

চতুর্থ হল—'চিরবৈধব্য'। এই প্রথার জন্য বহু নিরুপায় স্ত্রীলোকের ভরণপোষণের ভার বহন করতে হয় আত্মীয়স্বজনকে। তাতেও আর্থিক অপচয় কম হয় না।

পঞ্চম হল—'জাতিভেদ ও জাত্যভিমান'। "যদিও ইংরাজীশিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চজাতির লোক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও হীন জাতিদিগের চিরাবলম্বিত অনেক কার্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।" 'সোমপ্রকাশে'র এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে ব্রিটিশ আমলে সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) খানিকটা সঞ্চারিত হলেও তা নানাকারণে প্রতিহত হয়েছে। প্রথম ও প্রধান কারণ জাতিভেদ ও জাত্যভিমান। জাতিভেদপ্রথা ব্রিটিশ আমলে আদৌ শিথিল হয়েছে কিনা সন্দেহ। ইংরেজী

শিক্ষা, সমাজসংস্কার আন্দোলন ইত্যাদির তরঙ্গাঘাতে জাতিভেদের বন্ধন আলগা হয়নি, অথবা তার লৌহপ্রাচীরে বড় রকমের কোন ফাটল ধরেনি। সামান্য একটু-আধটু ছিদ্র যদি কোথাও হয়ে থাকে তাহলে তাকে 'intercaste mobility' বলে মনে করার কোন কারণ নেই। টাকার জোরে শ্রেণীরেখা (class-line) অতিক্রম করা যত সহজ, আমাদের জাতিবর্ণের স্তরবিন্যস্ত সমাজে জাতিরেখা (caste-line) অতিক্রম করা তত সহজ নয়। টাকার প্রচণ্ড চাপেও জাতির গণ্ডি যে অতিক্রম করা যায় না, তার অজস্র দৃষ্টান্ত আঠার ও উনিশ শতকের সমীকরণ ও জাতিসভার (caste-council) ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক দ্বিপ্রহরকালেও দেখা যায়, বাঙালী সমাজে, এমন কি ভারতীয় সমাজেও, জাতিভেদের বন্ধন বিশেষ শিথিল হয়নি। বৃত্তিগত গতিশীলতা (occupational mobility) উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকে অনেক বেড়েছে এবং সেই অনুপাতে কুলবৃত্তির বন্ধনও শিথিল হয়েছে, কিন্তু সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই জাতিগত গোঁড়ামি এখনও প্রবল আছে। 'সোমপ্রকাশে'র বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে কুলবৃত্তির বন্ধন অনেক বেশি দৃঢ় ছিল এবং তার জন্য বাঙালীদের পক্ষে আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মণের ছেলে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য কোনরকম পারিবারিক ও সামাজিক প্রেরণা পাননি, বরং বাধাই পেয়েছেন। সামাজিক প্রথানুগত্যের জন্য তাঁদের মানসিক গড়ন (mental orientation) ছেলেবেলা থেকেই তাই বাণিজ্যবিমুখ হয়ে ওঠে। তার ফলে কর্মজীবনে শিল্পবাণিজ্যের নতুন রাজ্যে তাঁদের পক্ষে অভিযান করা সম্ভব হয় না।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার যে রচনা নিয়ে আলোচনা করা হল তা ১২৮০ সালে (ইংরেজী ১৮৭৩-৭৪ সালে) লেখা। আরও বার বছর পরে ১২৯২ সালে (১৮৮৫-৮৬) "বাঙ্গালীর দারিদ্র্য" নামে একটি দীর্ঘ রচনায় এ বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ' বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথমে বাঙালীর উপজীবিকা (occupation) মোট সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :[৪৬]

প্রথম শ্রেণী : সামান্য ব্যবসাবাণিজ্য

এই শ্রেণীতে আড়তদার গোলাদার দোকানদার থেকে সামান্য মুদি ও ফেরিওয়ালা পর্যন্ত এবং যাঁরা নগদ টাকা ও ধান ইত্যাদির তেজারতি করেন

তাঁদের সকলকেই ধরা হয়েছে। এঁদের সকলের কাজেই কিছু মূলধন দরকার এবং লাভ-লোকসানের ব্যাপার আছে বলে কাজটিকে ব্যবসাবাণিজ্য বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী : ভূসম্পত্তির উপস্বত্বভোগ

এই শ্রেণীতে জমিদার পত্তনিদার তালুকদার জোতদার গাঁতিদার ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি বৃত্তিভোগী ও কৃষকদের ধরা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী : দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিক্রয়

এই শ্রেণীতে চাকরিজীবী হাইকোর্টের জজ থেকে সামান্য মুটে-মজুর, চা বাগান রেলওয়ে প্রভৃতির কুলি সকলকেই ধরা হয়েছে। উকিল মোক্তার ডাক্তাররাও এই শ্রেণীভুক্ত। এঁরা সকলেই অপরের জন্য দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেন।

চতুর্থ শ্রেণী : জাতীয় ব্যবসাযোগে জীবিকাশিল্পী

পুরোহিত ধোপা নাপিত তন্তুবায় কর্মকার সূত্রধর কাংসকার গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকলে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ এঁরা সেই প্রাচীনকাল থেকে বৃত্তি অনুযায়ী জাতিভুক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের কুলবৃত্তি অবলম্বন করেই জীবিকানির্বাহ করেন।

পঞ্চম শ্রেণী : পরমুখাপেক্ষী ও পরভোগ্যোপজীবী

তোষামোদ ভিক্ষা উঞ্ছবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা যাঁরা জীবিকানির্বাহ করেন তাঁদেরও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই বৃত্তিকে অবশ্য 'ঘৃণিত বৃত্তি' বলা হয়েছে।

এই পাঁচটি বৃত্তি সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন যে এগুলি সমাজে ব্রিটিশ পূর্ব যুগেও ছিল, নতুন বৃত্তি নয়। ব্রিটিশ আমলে যে দুটি নতুন বৃত্তির কথা 'সোমপ্রকাশ' উল্লেখ করেছেন তা যে-কোন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীকেও চমৎকৃত করবে। এই নতুন বৃত্তি দুটি হল :

(১) আত্মবিক্রয় ও ধর্মবিক্রয়

(২) প্রতিভা বিক্রয়

আত্মবিক্রয় ও ধর্মবিক্রয় প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন : "বেশ্যাবৃত্তি, বিবাহের কন্যা বিক্রয় ও বি. এ., এম. এ পাশযুক্ত পুত্রের প্রভূত পণগ্রহণ, শিল্পের

নিকট গুরুর অর্থগ্রহণ, এ সকল বৃত্তি প্রাচীন সমাজে বড় প্রচলিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রে ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বনে বিশেষ নিষেধ আছে ও ঘোর অধর্ম বলিয়া দণ্ডের বিধান আছে।" কিন্তু ব্রিটিশ আমলে টাকার দোর্দণ্ড প্রতাপে শাস্ত্রের এই বিধান ও নিষেধ স্বচ্ছন্দে লঙ্ঘন করতে অনেকেই কুণ্ঠিত হন নি।

'প্রতিভাবিক্রয়' সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন : "এই বিভাগে প্রতিভা সম্ভূত কাব্য নাটক নভেল বিক্রয়, বিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র অথবা উপদেশ পূর্ণ কোনরূপ সাময়িকপত্রাদি বিক্রয় দ্বারা আবিষ্কর্তা, প্রণেতা রচয়িতা যে স্বত্ব ভোগ করেন, সেই স্বত্বাধিকারিগণকে 'প্রতিভাবিক্রেতা' বলা যায়। পুরাকালে এ প্রথাটি প্রচলিত ছিল না।" লক্ষণীয় হল, আত্মবিক্রয় ও ধর্মবিক্রয়কে 'সোমপ্রকাশ' 'নিতান্ত ঘৃণ্য' বলে নিন্দা করেছেন, কিন্তু 'প্রতিভাবিক্রয়কে' নিন্দা করেননি। প্রতিভাবিক্রয় সম্বন্ধে বলেছেন যে এই "উপজীবিকা যদিও পূর্বকালে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনে কোন দোষ দেখা যায় না বরং প্রার্থনীয় বলা যাইতে পারে।" 'সোমপ্রকাশ' মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপত্র, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। 'Commercialisation' ও 'Vulgarisation af talent' ধনতান্ত্রিক যুগের বিশিষ্ট সামাজিক উপসর্গ। ব্রিটিশ আমলে স্বভাবতঃই এই উপসর্গের আমদানি ও প্রসার হয়েছে বাংলাদেশে, এবং ভারতবর্ষেও। প্রতিভা, বাজারের অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো, টাকার বিনিময়ে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হয়েছে। নতুন মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে বাংলাদেশের, অন্যতম উপজীবিকা হয়েছে প্রতিভাবিক্রয়।

'একান্নবর্তী যৌথ পরিবার' (Joint Family) বাঙালীর (হিন্দুর) স্বাধীন কর্মোদ্যম ও শিল্পোদ্যম কি ভাবে নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় করেছে, আগে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বাঙালীর উপজীবিকার মধ্যে যে 'ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব-ভোগের' কথা বলা হয়েছে, তার গুরুত্বও বাঙালীর শিল্পোদ্যমের অভাবের কারণ হিসেবে কম নয়, বরং আরও বেশি বলা চলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নানাস্তরের মধ্যস্বত্বের প্রবর্তন বাংলার সঞ্চিত মূলধনকে যেভাবে ভূসম্পত্তিভোগের দিকে চালিত করেছে, সেরকম বোধ হয় ভারতের আর অন্য কোন প্রদেশে করেনি। বাঙালীর আর্থনীতিক অপমৃত্যুর প্রধান কারণ হয়েছে ভূসম্পত্তির অনার্জিত, অনায়াসলব্ধ আয় (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন' বলেছেন :

"The limitation of the revenue payable by the Zamindars, coupled with their exemption from any income-tax on agricultural incomes throws an undue burden on other classes of tax-payers. *The discrimination in favour of land has had the effect of creating a bias in favour of investment in land rather than in industrial enterprises*, and has contributed to the over-capitalisation of rent-receiving as opposed to productive purposes either in agriculture or industry."

বাঙালীর সঙ্গে বোম্বাইবাসীর শিল্পবাণিজ্যোদ্যমের তুলনা করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসা কার্যে সুদক্ষ। বাঙ্গলার ধন সম্পত্তি ভূমিতে আবদ্ধ। বোম্বাই অঞ্চলে ভূমির তেমন মূল্য নাই কেন না এ প্রদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই।"[৪৭] একদিকে একান্নবর্তী যৌথ পরিবার, অন্যদিকে চিরস্থায়ী ভূস্বত্ব-উপস্বত্ব, এই দু'য়ের আকর্ষণে বাঙালীর স্বাধীন কর্মোদ্যম ও শিল্পোদ্যম নিষ্পেষিত হয়েছে।

বাঙালার আর্থিক অবনতির আরও কয়েকটি কারণ 'সোমপ্রকাশ' উল্লেখ করেছেন। বাঙালীর আর্থিক অবনতিকে 'ব্যাধি' মনে করে কারণগুলিকে বলা হয়েছে এক-একটি ভয়ানক 'উপসর্গ'। কারণগুলি এই ঃ

প্রথম কারণ—লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও ঘরমুখো মন। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সেই অনুপাতে আয়ের পথ বাড়েনি। তাছাড়া বাঙালীরা অত্যন্ত বেশি ঘরমুখো ও ঘরকুনো। "বাঙ্গালী ঘরে পড়িয়া অনাহারে মরিবে, তথাপি বাহিরে যাইয়া আহারান্বেষণ করিবে না।" অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্যে বাঙালীর উদ্যমের অভাবের একটা বড় কারণ এই ঘরমুখো স্বভাব।

দ্বিতীয় কারণ—বাঙালীর বিবাহপ্রিয়তা ও বিবাহবাধ্যতা। "বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তা ও বাধ্যতা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের প্রধান সহায়।" এই বিবাহপ্রিয়তা ও বাধ্যতা থেকে বাংলাদেশে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের এত বেশি প্রচলন হয়েছে। এই সামাজিক কুপ্রথা বাঙালীর স্বাধীন কর্মপ্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে খর্ব করেছে।

তৃতীয় কারণ– কৌলীন্যপ্রথা। এই প্রথার জন্য বিবাহে পুত্রকন্যার পণ গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের অনুকরণে ব্রাহ্মণেতর জাতের মধ্যেও এই প্রথার প্রভাব পড়েছে। "এই সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া অনেককে প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিতে হয়, দূরপণেয় ঋণপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, এমনকি অনেক সময়ে ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে হয়।" কাজেই কৌলীন্যপ্রথা যে বাঙালীর আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চতুর্থ কারণ—একান্নবর্তিতা সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে।

পঞ্চম কারণ—সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কতকগুলি কাজ করতে বাধ্য হওয়া—যেমন পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহ, ঠাকুরসেবা, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি। "আমাদের দেশে ক্রিয়াকর্মে যাগযজ্ঞে ও মহোৎসবে অধিক টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ইহাতে সাধারণকে আলস্য পরবশ করে। কেহ অতিথিশালা স্থাপন করিলেন বা অন্নসত্র দিলেন, কতকগুলি লোক তথায় পরপিণ্ডে পেট পুরিয়া আলস্য ও পাপের আশ্রয় নিতে লাগিল ও অকর্মণ্য হইয়া সমাজের অব্যবহার্য জীব হইতে চলিল। ধনীর ধন বিতরণের এরূপ পন্থা প্রশস্ত নহে। ইহাতে দারিদ্র্য আনয়ন করে।" সামাজিক প্রথা দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে যে কিভাবে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জাল বিস্তার করতে পারে, এটি তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। এদেশের ধনিকরা নানারকম অসাধু উপায়ে স্বচ্ছন্দে অর্থ উপার্জন করতে পারেন, কিন্তু শেষে সেই সনাতন পাপ-পুণ্যবোধ থেকে যখন তাঁদের বিবেকদংশন আরম্ভ হয়, তখন পাপকর্ম থেকে মুক্তির আশায় তাঁরা ধর্মশালা, অতিথিশালা, দেবালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন এবং তার ফলে দেশের লোককে অলস ও নিষ্কর্মা হবার সুযোগ দেন। উনিশ শতকে বাঙালী ধনিকরা এরকম যে কত করেছেন এবং তারজন্য যে কত লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হয়েছে তা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

ষষ্ঠ কারণ—"বংশগত মর্যাদা ও শাস্ত্রোক্ত নিষেধ।" এ সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন জমিদার সন্তানের প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। তাঁর বার্ষিক আয় ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। সরকার তাঁকে রাজোপাধি দিয়েছিলেন। পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর সম্পত্তি পুত্রকন্যাদের মধ্যে ভাগ

হয়ে যায়। আবার তাঁদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় চারপুরুষের মধ্যে ঐ সম্পত্তি কড়ায়-গণ্ডায় ভাগ হয়। বর্তমান জমিদার বা রাজসন্তান নয় গণ্ডা তিন কড়ার মালিক, তাতে যে আয় হয় তা দিয়ে তাঁর সংসার চলে না। তিনি হয়ত একশ টাকার মাইনের একটা চাকরি করতে পারেন, কিন্তু রাজসন্তান ও জমিদার হয়ে তাঁর চেয়ে পদমর্যদায় ছোট এমন লোকের কাছে চাকরি করতে তিনি রাজি নন। "তাঁহার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, এই অভিমানে ফাটিয়া ঘরে বসিয়া উপবাস করিতে লাগিলেন, ক্রমে বৃথা অভিমানে, চিন্তায়, দারিদ্র্যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন···ইহাকে বলে বংশগত অভিমানের অত্যাচার।" ব্রিটিশ আমলে আর কিছু হোক না হোক, একশ্রেণীর অজ্ঞাতকুলশীল নানাপ্রকার কৌশলে এদেশে ধনিকবংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন এবং ধনজাত একটা অভিমান ও মর্যাদাবোধ তাঁদের মধ্যে জেগেছিল। বাংলাদেশের হিন্দু দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তাঁদের ধনসম্পত্তি তিন-চার পুরুষের মধ্যে উচ্ছন্নে গেলেও, এই বিত্তজাত বংশমর্যাদাবোধ উত্তরপুরুষের মন থেকে লোপ পায়নি।*

শাস্ত্রোক্ত নিষেধ সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন: "তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তুমি স্বহস্তে হলচালন করিতে, যবন বা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে পারিবে না। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রোক্ত নিষেধ মানিলে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্বন্ধেও অনেক প্রকার নিষেধ আছে। সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মনু প্রভৃতির সংহিতা পাঠে পাঠক জানিতে পারিবেন। সুখের বিষয় যে, অধুনা অনেকে ঐ সকল সংহিতার নিষেধ-বিধি মানেন না। তথাপি যেটুকু পালন করেন, তাহাতে অবনতির আশংকা আছে।"

সপ্তম কারণ—জাতিভেদ ও কর্মভেদ। "জাতিভেদ ও কর্মভেদ জাতীয় অবনতির দুইটি প্রধান সহায়। জাতি ও কর্মভেদে পরস্পরের সহিত ঐক্য থাকে না, কোন সভাসমিতি সংগঠিত হয় না। কেহ কাহারো জন্য চিন্তা করে না, সহানুভূতিও থাকে না। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। কোন সাধারণে

* কলকাতা শহরের একাধিক প্রাচীন বাঙালী ধনিক পরিবারের বর্তমান বংশধরদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, পূর্বপুরুষদের কীর্তিকথা তাঁরা সবিস্তারে না জানলেও, ১৫০। ২০০ বছর আগেকার বংশমর্যাদাবোধ আজও তাঁরা ছাড়তে পারেননি। এঁরা অধিকাংশই চাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করতে অনিচ্ছুক, কারণ তাতে বংশমর্যাদার হানি হবে এই তাঁদের ধারণা। বাড়িভাড়া এঁদের অন্যতম আয়।—লেখক

দেশহিতকার্যে সকলে একত্র হইয়া বদ্ধপরিকর হয় না। দুরূহ কার্যে একাগ্রতা ও একতার বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে তাহা পাওয়া যায় না। তখন কেহ উজান কেহ বা ভাটা বাহিতে আরম্ভ করে, কেমন চাঁ ভাঁ লাগিয়া যায়।” জাতিগত কর্মভেদ অবশ্য শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা ভারতবর্ষের আর্থিক অনুন্নতি ও অবনতির অন্যতম কারণ।

অষ্টম কারণ বলা হয়েছে শিক্ষার বিভ্রাট। ব্রিটিশ আমলে যে শিক্ষার প্রাধান্য বেড়েছে তা মানুষকে কর্মক্ষম করে না। শিল্পকৌশল, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য অর্থকরী ও কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে নেই বললেই হয়। “যে ভাবের শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল শূন্যে কেল্লা নির্মাণের বৃদ্ধি হয়, বচনে খৈ ফুটাইবার ক্ষমতা হয়, শিমুল ফুলের মত অল্প বাতাসে ফাটিয়া চাটিয়া দেশময় হওয়ার সুবিধা হয়, এরূপ নিষ্ফল শিক্ষায় দারিদ্র্য ও দুঃখের স্রোত প্রবলবেগে বহিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

নবম কারণ—কার্যক্ষেত্রের অভাব। ‘সোমপ্রকাশ’ লিখেছেন যে দেশের লোকসংখ্যা ক্রমে বাড়ছে, কিছু লোক শিক্ষাও পাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার যোগ্যতা ও লোকসংখ্যা অনুপাতে কাজকর্মের সংস্থান হচ্ছে না। “রেলওয়ে, ট্রামওয়ে চা-বাগানে সওদাগরের বাটীতে অনেক লোক প্রতিপালন হয়। বিদেশীয় বণিকদিগকে আশীর্বাদ করি। তাঁহাদের দ্বারে খাটিয়া বিস্তর লোক জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। দেশীয় ধনী গুণপুরুষদিগের এসকল বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। দেশের কিসে উন্নতি হয়, অবনতি হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, এরূপ চিন্তায় কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের অসার মস্তিষ্ক আলোড়িত হয় না। যদি আজ বিদেশীয় বণিকগণ তাঁহাদের কাজ কারবার কলকারখানা ভারত হইতে উঠাইয়া লয়, তবে এই অগণ্য দরিদ্র ভারতবাসীর দশা কতদূর শোচনীয় হয় তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেইজন্য এই বলি, কেবল বিদেশের মুখাপেক্ষী ও বিদেশীয়ের ভাগ্যোপজীবী হইলে দেশের দারিদ্র্য কখনও ঘুচে না।” এদেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে দেশের আর্থিক উন্নতিচিন্তা সম্বন্ধে ঔদাস্যের এই অভিযোগ কেবল ‘সোমপ্রকাশে’র নয়, সেকালের অধিকাংশ সাময়িকপত্রের।

দশম কারণ—“গবর্নমেণ্টের বিদেশপ্রিয়তা, বিজাতীয়তা ও ধর্মান্ধতা।” বিদেশী শাসকরা এদেশের শিল্পোন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট উদাসীন বলেও দেশের দারিদ্র্য দূর হয় না। এযুক্তি অকাট্য এবং খুব সাধারণ যুক্তি।

কিন্তু বাংলাদেশে শিল্পোন্নতির অন্তরায় হিসেবে এখানে যে সমাজতাত্ত্বিক কারণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বিদেশী ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থবুদ্ধিজাত শিল্পনীতি যে এদেশে শিল্প-প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল, একথার পুনরাবৃত্তি অনেক অর্থনীতির ইতিহাসগ্রন্থে করা হয়েছে। এরকম স্বতঃসিদ্ধ সত্যের অবতারণা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সে কথা গোড়াতেই বলেছি। আমাদের লক্ষ্য হল আর্থনীতিক কারণ ছাড়াও আরও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ বাংলাদেশে বাঙালীর শিল্পোদ্যমের পথে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিল কিনা সন্ধান করা। এই ধরনের কয়েকটি সামাজিক কারণের উল্লেখ আমরা আগে করেছি। আরও একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব—সমুদ্রযাত্রার দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাঙালীরা যখন শিক্ষা ও অন্যান্য কাজকর্মের জন্য সমুদ্রপথে, প্রধানত ইংলণ্ডে, যাত্রা করতে আরম্ভ করেন, তখন স্বদেশে ফিরে আসার পর তাঁদের হিন্দুসমাজে গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে এক সমস্যা দেখা দেয়। যাঁরা হিন্দুসমাজের কর্ণধার তাঁরা অনেকেই বিদেশ-প্রত্যাগতদের সমাজচ্যুত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাই নিয়ে বাংলার হিন্দুসমাজে বেশ প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা। 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :[৪৮]

> "বাণিজ্যবিস্তার করিতে হইলেও বিদেশ গমন নিতান্ত আবশ্যক। কেবল পল্লীর ভিতরে বসিয়া তৈল লবণ বেচিলে বাণিজ্য করা হয় না। যখন এখানকার শিল্পোন্নতি হইবে তখন নানাদেশে এজেণ্ট রাখিতে হইবে, নচেৎ দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবে না। বাণিজ্যের জন্য পণ্যদ্রব্যও জাহাজে করিয়া দেশে-বিদেশে লইয়া যাইতে হইবে। পার্সীরা বোম্বাইয়ের বস্ত্র অনেক দূরদেশে লইয়া যাইতেছেন, তাই তাহাদের যত্ন নিষ্ফল হয় না। নতুবা লিটনের রাজবুদ্ধির প্রসারে বস্ত্রের শুল্ক রহিত হওয়াতে বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায়কে আজি চক্ষের জলে ভাসিতে হইত।...ব্যবসায়ীরা ইউরোপে এজেণ্ট রাখিতে পারিলে তবে সম্পূর্ণ উপকারের সম্ভাবনা। এখন আমাদের বক্তব্য এই, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মকে মাথায় করিয়া থাকিলে এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধি ঘটিবে না, তাহা নিশ্চিত। সেজন্য বলিতেছি, হিন্দুধর্ম যদি পুনর্জীবিত হয়, তবে উহার অনেক লেজামুড়া বাদ দিতে হইবে।"

ইংলণ্ডে যখন ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশের বাণিজ্যশিল্পের প্রদর্শনী হয় তখন হিন্দুরা যাতে অবাধে বিলাতযাত্রা করতে পারেন তাই নিয়ে আন্দোলন হয়। শিক্ষিত হিন্দুদের তরফ থেকে এরকম হাস্যকর প্রস্তাবও করা হয় যে গবর্নমেন্ট যদি সমুদ্রগামী জাহাজে ব্রাহ্মণ পাঁচক, গঙ্গাজল ও পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন, তাহলে সমস্যার খানিকটা সমাধান হতে পারে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করেন: "সহযোগীদিগের এইরূপ প্রস্তাবে আমরা কোনরূপেই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলাম না। আকাশে উড়িবার সাধ আছে অথচ ব্যোমযানে উঠিব না—যেমন মৃত্তিকায় বেড়াইতেছি তেমনি বেড়াইব অথচ আকাশে উড্ডয়ন করা হইবে এরূপ আশা যেমন হাস্যজনক, ইংলণ্ড আমেরিকা যাইব, নানাভাবে ভাবুক হইব অথচ দেশীয় মূর্খমণ্ডলীর কুসংস্কার বজায় রাখিব ইত্যাদির চিন্তা কি তদ্রূপ নহে?"[৪৯] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন: "অনেকেই জানেন বিলাত প্রত্যাগতদিগকে লইয়া এখানে ঘোরতর দলাদলি চলিতেছে। তন্মধ্যে অনেকেই তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার পক্ষপাতী এবং অনেকেই বিপক্ষ। প্রতিপক্ষরা বলেন উহাদিগকে সংগ্রহ করিলে ধর্মলোপ ও জাতিলোপ হইবে। যাই হউক এইরূপ মতভেদ লইয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার সংস্পর্শ অনেক পল্লীগ্রামেও পৌঁছিয়াছে। যাঁহারা সংগ্রহের পক্ষপাতী তাঁহারা অসংগ্রহে সমাজের অন্তর্বাদ কমিবে এই আশঙ্কা করেন। কারণ আজকাল উচ্চশিক্ষা উচ্চপদ ব্যবসায় বাণিজ্য নানা সূত্রে লোক বিলাত যাইতেছে। এই স্রোত রোধ করাও কঠিন।"[৫০]

আন্দোলন বেশ প্রবল হয়। হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের উপযোগিতা বিচার করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হন রমেশচন্দ্র মিত্র। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র চন্দ, মন্মথনাথ মিত্র, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার প্রমুখ ষোলজনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। বিচার-বিবেচনার পর পণ্ডিতরা রায় দেন যে সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশযাত্রার ফলে প্রায়শ্চিত্তের অথবা হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কারের কোন কারণ ঘটে না। তাঁরা যে 'ব্যবস্থা' দেন তা এই:[৫১]

Vyavastha I—As sea-voyage does not come within the category of heinous transgressions, involving degrada-

tion (*patitya*), and heavy penances are not provided for it, and there is nothing even by parity of reasoning to consider it a heinous transgression, a person who makes a seavoyage without committing any heinous transgressions, should not be considered fallen (*patita*).

Vyavastha II—As residence in England and other foreign countries does not come within the category of heinous transgression, involving degradation (*patitya*) and heavy penances are not provided for it, and there is nothing even by parity of reasoning to consider it a heinous transgression, a person, who resides in England and other foreign countries, without committing any heinous transgressions should not be considered fallen (*patita*).

উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত যদি সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশযাত্রা নিয়ে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এরকম আন্দোলন সম্ভব হতে পারে, তাহলে বাঙালীর আর্থিক উন্নতি ও স্বাধীন শিল্পোদ্যমের পথে কেবল বিদেশী শাসকের শোষণনীতির প্রতিবন্ধক ছাড়া এদেশীয় লোকের সামাজিক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির কোন সক্রিয় প্রতিকূল ভূমিকা ছিল না, এমন সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।

প্রাচীনযুগ থেকে প্রায় মধ্যযুগের প্রান্ত পর্যন্ত ইতিহাসে বাঙালীর বাণিজ্যিক কৃতিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানত কুলবৃত্তিগত বাণিজ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বর্ধমান জেলায় গলসীথানার অধীন মল্লসারুলগ্রামে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দের, অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্তযুগের, একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এই তাম্রশাসনে এই অঞ্চলের তদানীন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। যেমন বক্কতক বা বাকৃতার হিম দত্ত, বটবল্লকের ষষ্ঠী দত্ত, শ্রী দত্ত, গোধগ্রামের মহি দত্ত ও রাজ্য দত্ত। এই দত্ত-রা কারা? পশ্চিমবঙ্গের গন্ধবণিক তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দত্ত'-রা অন্যতম। এঁরা

মনে হয় এই বণিক দত্ত-দেরই প্রাচীন পূর্বপুরুষ। প্রায় দেড়হাজার বছর আগে এঁরা এক-একটি অঞ্চলের বিশেষ অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, প্রধানত তাঁদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তির জন্য। বাংলাদেশের এই বণিকসম্প্রদায় বংশপরম্পরায় বাণিজ্য করে প্রচুর বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। হাজার-বারশ বছর পরেও এই বণিকদের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে, বিশেষ করে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে। উজানির ধনপতি সদাগর 'গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী।' 'বিদিত অবনী' কথা থেকে বোঝা যায়, বাঙালী বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশেও বাণিজ্য করতে যেতেন। উজানি নগরে ছিল ধনপতির বাস। অজয় নদের তীরে, বর্ধমানের উজানি-কোগ্রাম এই উজানি নগর। কেবল ধনপতি সদাগরের উজানি নয়, চাঁদ-সদাগরের চম্পকনগরও এই অঞ্চলে। খুল্লনার পাত্র নির্বাচন প্রসঙ্গে বণিকদের যে সব নাম ও বসতির উল্লেখ আছে তা এই—চম্পকনগরের চাঁদ সদাগর, বর্ধমানের ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, সাঁতগাঁর বা সপ্তগ্রামের রাম দাঁ, বড়শুলের হরি দত্ত, ফতেপুরের রাম কুণ্ডু, কর্জনার হরি লাহা, ভাল্লকির সোম চন্দ। ধনপতি সদাগরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম হয়েছিল। তাঁদের নামধামের তালিকা আরও বিস্তৃত—যেমন বর্ধমানের ধুস দত্ত, চম্পাইনগরের চাঁদ সদাগর, লক্ষ্মী সদাগর, কর্জনার নীলাম্বর বণিক ও তাঁর সাতভাই, গণেশপুরের সনাতন চন্দ, তাঁর ভাই গোপাল ও গোবিন্দ চন্দ, সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা ও রাম দাঁ, সাকোঁর শঙ্খদত্ত, বিষ্ণুদত্ত ও তাঁর সাতভাই, কাইতির যাদবেন্দ্র দাস, ঝাড়গ্রামের রঘুদত্ত, তেঘরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর রাম রায় ও তাঁর দশ ভাই, লাউগাঁর রামদত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, খণ্ডঘোষের বাসু দত্ত, গোতানের রামদত্ত প্রভৃতি—

একে একে বণিকের কত কব নাম
সাতশত বেণে আইসে ধনপতিধাম।

সাতশত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতি সদাগরের গৃহে। যে সমস্ত গ্রাম থেকে তাঁরা এসেছিলেন তার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম আজও স্বনামে বর্তমান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে দামোদর অজয় দ্বারকেশ্বর সরস্বতী প্রভৃতি নদনদীর তীরে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত। আশ্চর্য হল, এই সব অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে আজও দেখা যায় বণিক সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি সর্বাধিক।

গ্রামে পা দিলেই এই অঞ্চলে আজও সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী, বড় বড় অট্টালিকা-বহুল যে-সব পাড়া দেখা যায়, সেগুলি প্রধানত বণিকসম্প্রদায়ের পাড়া।

বাণিজ্য বাংলার বণিকদের কুলবৃত্তি। এই কুলবৃত্তির ঐতিহ্য বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালী বণিকরা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। বর্ধমান বাঁকুড়া হুগলি প্রভৃতি জেলায় নয় শুধু, কলকাতা শহরেও আঠার শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে (trade and commerce) বাঙালী বণিকসম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। কলকাতা শহরে বাঙালী শেঠ বসাক প্রভৃতি তন্তুবণিকদের ইতিহাস এবং তাম্বুলি প্রভৃতি অন্যান্য বণিকসম্প্রদায়ের ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫২] কিন্তু আশ্চর্য হল, উনিশ শতকে তো নয়ই, বিশ শতকেও বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙালী বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ কেউ দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন বলে জানা যায় না। কুলবৃত্তিগত বাণিজ্যের (commerce) সীমা তাঁরা হয়ত শাখাপ্রশাখায় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে ধনতান্ত্রিক যুগের প্রকৃত শিল্পোদ্‌যোগীর মতো আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হননি। কেন হননি তা বাস্তবিকই ভাববার বিষয়। স্বাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী পর্যাপ্ত মূলধন সঞ্চয় করেছেন এরকম ব্যবসায়ীর অভাব নেই এঁদের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এঁরা বাণিজ্যমুখী হলেও স্বাধীন শিল্পমুখী হন নি? কেন এঁরা প্রসিদ্ধ 'ব্যবসায়ী' হতে চান, 'শিল্পপতি' হতে চান না? তার অন্যতম কারণ মনে হয়, বেচাকেনার বাণিজ্যে মুনাফার যে নিশ্চিন্ততা আছে, শিল্পোদ্যমে তা নেই। রক্ষণশীল মন নিশ্চিন্ততার আশ্রয়ে ডানা গুটিয়ে থাকতে চায়, গতিশীল মনের মতো অবাধে ডানা বিস্তার করতে চায় না অনিশ্চিতের সন্ধানে। শিল্পোদ্‌যোগী পুরুষের (entrepreneur) মন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন ও কৃতিত্বকামী। বাঙালী বণিকসম্প্রদায় যেমন কুলবৃত্তিগত রক্ষণশীলতা শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারেননি, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বাঙালী যাঁরা বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁরাও বেশিদূর পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেননি।

আর্থনীতিক ব্যবস্থা যদি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র ছাড়া যদি ব্যক্তির উপর শিল্পবাণিজ্যের জন্য নির্ভর করতে হয়, তাহলে

যে-কোন দেশের শিল্পোন্নতির মূলে যে শিল্পোদ্‌যোগী পুরুষের দূরদর্শী অভিযানের প্রয়োজন আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না, অথবা অর্থতত্ত্বের সূত্র ধরে বিচার করার প্রয়োজন হয় না। অর্থনীতিবিদ্‌রা অনেকে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন এবং শুম্পিটার-এর মতো কয়েকজন শিল্পোন্নতির মূলে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫৩] শুম্পিটার বলেছেন যে, কোন দেশের আর্থনীতিক বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে হয় না, হঠাৎ এক-একটা ঝাঁকুনি ও উল্লম্ফের ভিতর দিয়ে হয়। এই ঝাঁকুনি ও উল্লম্ফের শক্তি যোগান দেন প্রত্যেক দেশের শিল্পোদ্‌যোগী পুরুষরা, যাঁরা বলিষ্ঠ কল্পনা ও একাগ্রতা নিয়ে স্বাধীন শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড আমেরিকা, এমনকি জাপানের মতো শিল্পোন্নত দেশের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় যে শিল্পোন্নতির মূলে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের ভূমিকা (role) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথমেই আমরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছি তা হল, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে বা বাঙালীদের মধ্যে, এমনকি যাঁরা বংশানুক্রমে বাণিজ্যবৃত্তিজীবী তাঁদের মধ্যেও, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের প্রকাশ তেমন হয়নি কেন ?

এই প্রশ্নের বহুকথিত সহজ উত্তর হল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূলতা। এ উত্তরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমরা প্রকাশ করি নি, কিন্তু সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেছি। রামদুলাল দে'র মতো কৃতী বণিক, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদ্‌যোগী শিল্পানুরাগী, এবং আরও অনেক বাঙালী যাঁরা ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্বে অর্থোপার্জনের নানারকমের সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন, এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁরা অন্তত স্বাধীনভাবে ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তৎপর হতে পারতেন। একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এই তৎপরতা উনিশ শতকের প্রথম পর্বের মধ্যেই কিছুটা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তাও সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তা না হলে নীলকুঠির ব্যবসায়ে কার-ট্যাগোর কোম্পানির প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা কখনই তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন না। কাজেই বাঙালীদের মধ্যে শিল্পোদ্যমের খানিকটা যে অভাব ছিল একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আমরা বাঙালী হিন্দুদের কথা বলছি, বাঙালী মুসলমানদের কথা নয়।

তার কারণ বাঙালী মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদের অনেক পরে উৎসাহী হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ আঠার শতক এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুরাই ছিলেন প্রধান ও অগ্রগণ্য। উনিশ শতকে অন্তত বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ব্যক্তিগত শিল্পোত্তমের প্রকাশ কিছুটা পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি এবং তা না হওয়ার জন্য ব্রিটিশনীতির যত গুরুত্বই থাক, বাঙালী হিন্দুদের নিজস্ব সমাজনীতির গুরুত্বও কম ছিল না। এইটাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

যে-কোন জাতির জাতীয় উন্নতি, বিশেষ করে আর্থিক জীবনের অগ্রগতির জন্য, সেই জাতির জনমানসে যে বেশ কিছুটা ব্যক্তিগত কৃতিত্বপ্রবণতা (achievement motive) থাকা দরকার, সমাজবিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। সমাজের মধ্যে যদি 'need for achievement' (n Achievement বলা হয়েছে) বা কৃতিত্বপ্রদর্শনের প্রয়োজনবোধ রীতিমত সজাগ না থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত শিল্পোত্তমের অথবা কৃতকর্মা পুরুষের বিকাশ সেই সমাজে হয় না, এবং তা না হলে তার আর্থিক ক্রমোন্নতিতে নিশ্চিত ব্যাঘাত ঘটে। ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড বলেন ঃ[৫৪]

> "....a society with a generally high level of n Achievement will produce more energetic entrepreneurs who, in turn, produce more rapid economic developement."

অবশ্য বর্তমান শতকের গোড়াতেই ১৯০৪ সালে প্রখ্যাত জার্মান সমাজ-বিজ্ঞানী ম্যাক্‌স হ্বেবার (Max Weber) বলেন যে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের হিসেবী যুক্তিবাদী উদযোগী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ একটা ধর্মীয় মনোভাব থেকে উদভূত। সেই ধর্মীয় মনোভাব হল Protestantism-এর মনোভাব। আমেরিকা ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে অনুসন্ধান করে ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড দেখেছেন যে বিভিন্ন দেশের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশির ভাগ শিল্পোদ্‌যোগী কৃতকর্মা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড-এর আগে উইন্টারবটম্‌ প্রথমে (১৯৫৩ সালে) বিভিন্ন সমাজে মায়েদের

শিশুপালনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে কৃতিত্ব-প্রবণতার সঙ্গে আর্থিক অগ্রগতির সম্পর্ক বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। তিনি দেখেন যে যাঁরা জীবনে কৃতকর্মা পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মায়েরা সর্বাগ্রে তাঁদের সর্বক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিয়েছেন। মায়েরা ছেলেদের বলেছেন :

> "Know his way around the city
> Be active and energetic
> Try hard for things for himself
> Wake his own friends
> Do well in competition."

যে-ছেলেরা বাল্যকাল থেকে মায়েদের কাছে আত্মনির্ভরতার এই শিক্ষা পেয়েছে তাদেরই আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বিকাশ হয়েছে এবং কর্মজীবনে তারাই হয়েছে কীর্তিমান পুরুষ। তাদের মধ্যেই সারা জীবন অত্যন্ত সজাগ কৃতিত্ববাসনা সক্রিয় থাকে দেখা যায়। কিন্তু যাঁদের মধ্যে এই বাসনা নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব থাকে তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছেলেবেলায় তাঁদের বাপ-মা অতিরিক্ত স্নেহের পক্ষপুটে তাঁদের লালন-পালন করেছেন, কারও সঙ্গে মেলা-মেশা করতে দেননি এবং স্বাধীনভাবে কোন মতামত প্রকাশ করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পদে পদে বাধা দিয়েছেন।[৫৫] অর্থাৎ আলালের ঘরের দুলালের মতো ছেলেবেলা থেকে তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন। স্বভাবতঃই শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে যখন তাঁরা যৌবনে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন, তখনও তাঁরা বাল্যকালের দুলালসুলভ পরনির্ভরতা ছাড়তে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কৃতকর্মা উদ্‌যোগী পুরুষের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়, সাধারণ কেরানী ও চাকুরী-জীবীর বংশবৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব। বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে অনেকটা তাই হয়েছে।

বাংলাদেশের মায়েরা অত্যধিক স্নেহকতার ও কোমলস্বভাব। সন্তানের প্রতি তাঁরা প্রায় স্নেহান্ধ বলা চলে। অধিকাংশ মায়েরাই তাই, যদিও বিদ্যাসাগরের মায়ের মতো দু'একটি ব্যতিক্রমও আছে। যেখানে ব্যতিক্রম, অর্থাৎ যেখানে কোমলতা ও কঠোরতার অদ্ভুত সমন্বয় ঘটে মাতৃচরিত্রে, সেখানে দেখা যায় বিদ্যাসাগরের মতো কৃতকর্মা সন্তানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু সাধারণত

দেখা যায়, বাঙালী পরিবারে বাবা-মা'র, বিশেষ করে মায়েদের স্নেহান্ধতার জন্য ছেলেদের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের বিকাশ হয় না। অধিকাংশ বাঙালী যুবক একটা নিস্তেজ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, কাজেই 'কর্ম' বলতে একটি কর্মই তাদের চোখের সামনে জ্যোতির কনকপদ্মের মতো ভেসে ওঠে, সেটি হল নিশ্চিন্ত দাসত্বকর্ম। আজও সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে কেরানীগিরি হল কর্মজীবনের সর্বাধিক কাম্য কর্ম, এবং তাও স্বদেশের, বিশেষ করে কলকাতা শহরের, গণ্ডির মধ্যে বাঞ্ছনীয়।

সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, সেই সমস্ত সমাজের দ্রুত আর্থনীতিক বিকাশ হয়েছে যেখানে সামাজিক শক্তির মূল নৈর্বক্তিক ইন্‌স্টিটিউশন-গত প্রথা-ঐতিহ্য থেকে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ যে-সমাজ যত বেশি ব্যক্তিমুখী এবং ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বীমুখী, পুরাতন সামাজিক প্রথা-ঐতিহ্যমুখী নয়, সেই সমাজ স্বভাবতঃই আন্তর্ব্যক্তিক কর্মপ্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে তত বেশি মানুষের কৃতিত্বপ্রবণতা জাগিয়ে তোলে। ঐতিহ্যমুখী সমাজকে অন্তর্মুখী (inner-directed) এবং ব্যক্তিমুখী সমাজকে বহির্মুখী বলা যায়। এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্বন্ধে ম্যাকক্লেল্যাণ্ড লিখেছেন :[৫৬]

> "The major proposition supported by these findings is that in societies which subsequently develop rapidly economically, the force which holds society together has shifted from tradition, particularly impersonal institutional tradition, to public opinion which helps define changing and functionally specific interpersonal relationships.
>
> "...an other-directed society should be one in which ego is not motivated to interact by traditional institutional pressures but by pressures from others, particularly peers..."

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber) ধর্মগত মনোভাবের সঙ্গে আর্থনীতিক মনোভাবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলেছেন

যে খ্রীস্টধর্মের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্টিজম্ ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা "helped to deliver the 'spirit' of modern captalism, its specific *ethos* : the ethos of the modern *bourgeois middle classes*."[৫৭]

প্রোটেস্ট্যান্টিজ্‌ম ধর্মজীবনে ব্যক্তিগত কঠোরতা ও বিশুদ্ধতা এবং দেবতার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাগতিক জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে এরিখ ফ্রম (Erich Fromm) তাঁর *The Fear of Freedom* গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করেছেন। ক্যথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :[৫৮]

> "In the Catholic Church the relationship of the individual to God had been based on membership in the Church. The Church was the link between him and God, thus on the one hand restricting his individuality, but on the other hand letting him face God as an integral part of a group. Protestantism made the individual face God alone....Psychologically this spiritual individualism is not too different from the economic individualism. In both instances the individual is completely alone and in his isolation faces the superior power, be it of God, of competitors, or of impersonal economic forces. *The individualistic relationship to God was the psychological preparation for the individualistic character of man's secular activities.*"

ভারতীয় ধর্ম (হিন্দুধর্ম) সম্বন্ধে ম্যাকস্ হ্বেবার বলেছেন যে—"Indian religiosity....is the cradle of those religious ethics which have abnegated the world, theoretically, practically, and to the greatest extent. It is also in India that the 'technique' which corresponds to such abnegation has been most highly developed."[৫৯] এই ধরনের আধ্যাত্মিক ধর্মভাবাপন্ন সমাজে ইহজাগতিক

বুদ্ধির প্রাখর্য প্রত্যাশা করা যায় না। ম্যাকস্ হেবার-এর এই অভিমত প্রত্যক্ষ সামাজিক অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের দ্বারা যাচাই করে ম্যাকলেল্যাণ্ডও এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন—"that other-worldly religions like Hinduism and Buddhism stress values that would hardly be expected to lead parents to behave in ways that would induce high n Achievement in their sons."[৬০]

যে-দেশের প্রধান ধর্ম মানুষের মন পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বৈষয়িক ভোগ-লালসার প্রতি বিমুখ করে তোলে, সে-দেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বকামী উদ্‌যোগী পুরুষের সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে প্রধানত ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে—যেমন জৈন, বৈষ্ণব, পার্সী প্রভৃতি—শিল্পোদ্‌যোগী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। তার কারণ এই সব ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের ছোট ছোট প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মগোষ্ঠীর মনোভাবের সাদৃশ্য আছে।[৬১] জাপানেও দেখা যায়, উনিশ শতকে শিল্পোদ্‌যোগী ব্যবসায়ীশ্রেণীর বিকাশ বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ রূপের (Zen) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ধর্মের ক্ষেত্রে Zen-ধর্ম ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপন্থী, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানপন্থী নয়।[৬২]

বাংলাদেশে প্রচলিত আচারপ্রথাসর্বস্ব হিন্দুধর্মের প্রতিবাদে যে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ হয়েছিল, পাশ্চাত্ত্য প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মান্দোলনের সঙ্গে অনেক দিক থেকে তার একটা আত্মিক সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্মের বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ হিন্দুধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানবাহুল্য, পুরোহিতশাসন, পৌত্তলিকতা, অন্ধপ্রথানুগত্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ঠিক প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের মতো ব্রাহ্মধর্মেরও লক্ষ্য ছিল লোকচিত্তকে ধর্মের ক্ষেত্রে বহির্মুখী (objective) না করে অন্তর্মুখী (subjective) করা। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ধর্মের সঙ্গে বৈষয়িক জীবনের কোন মৌল বিরোধ ছিল না, উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সেতুবন্ধন বেশ দৃঢ় ছিল।[৬৩] ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের জীবনে এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো তাঁর প্রধান অনুগামীদের জীবনে ধর্ম ও বৈষয়িক চিন্তার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তিকেন্দ্র বাংলাদেশে, অন্তত ব্রাহ্মধর্মপন্থীদের মধ্যে, অর্থনীতিক্ষেত্রে বেশ কিছু 'achievement-oriented' শিল্পোদ্‌যোগী ব্যক্তির বিকাশ হল না কেন, তা

বাস্তবিক অনুধাবনযোগ্য। তা না হবার একাধিক কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথম কারণ, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্মের অনুভূমিক (horizontal) বিস্তার ব্যাপক নয়, খুবই সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্মের ethos বা মূলতত্ত্ব হিন্দুধর্মের ethos-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়া তো দূরের কথা, তার গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারেনি। কাজেই বাংলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্মের আত্মিক প্রভাব খুব উপরের একটি সংকীর্ণ স্তর ছাড়িয়ে সমাজের গভীরে একেবারে প্রবেশ করতে পারেনি। রামমোহন রায় অথবা তাঁর অনুগামীরা কেউ Luther বা Calvin-এর মতো ব্যাপক ধর্মান্দোলনও গড়ে তুলতে পারেননি। ধর্ম ও কর্ম উভয়ক্ষেত্রেই তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অগ্রদূত হয়েও ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে সেই মনোভাব সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হল, হিন্দুসমাজে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়ে ব্রাহ্মধর্মীরা ক্রমেই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একটা sectarian মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দুসমাজ চিরদিনই বিভিন্ন ধর্মীয় sect-এর প্রতি যেমন সহনশীল, তেমনই উদাসীন। সুতরাং পরবর্তীকালেও ব্রাহ্মধর্মের ethos হিন্দুসমাজে বিশেষ কোন প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি। তৃতীয় কারণ, রামমোহন-দ্বারকানাথের যুগে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী যাঁরা হয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন জমিদারশ্রেণীভুক্ত। প্রাচীন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তি তাঁদের এত প্রবল ছিল যে রামমোহনের সান্নিধ্য অথবা ব্রহ্মোপাসনার ফলে তার মূল বিশেষ শিথিল হয়নি। হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণে পুরো হিন্দুত্ব বজায় রেখে চলতেন। রামমোহনের পরে অন্তর্বিরোধের ফলে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন ক্রমে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের আবর্তে সেই দৌর্বল্য কাটিয়ে ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই কারণে ব্রাহ্মধর্মের "individualistic relationship to God" আমাদের সমাজে "individualistic character of man's secular activities"-এর জন্য (Erich Fromm) উপযুক্ত মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেনি। তাই ব্রাহ্মদের মধ্যেও, একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ছাড়া, উনিশ শতকে আর কারও কর্মজীবনে শিল্পোদ্যমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মদের মতো 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কথাও উল্লেখ করা যায়। 'ইয়ং বেঙ্গল' ধনিক বাঙালীদের মুচ্ছুদ্দিগিরি ও বেনিয়ানিকর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন

এবং স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের পথে তাঁদের নির্ভয়ে অগ্রসর হতে বলেছেন অথচ তাঁদের নিজেদের মধ্যে কেউ, একমাত্র রামগোপাল ঘোষ ছাড়া, নিশ্চিন্ত চাকরি ভিন্ন স্বাধীন শিল্পবাণিজ্য পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পরে, উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে, বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে যখন খ্রীস্টধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিতে থাকেন, তখন 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ তাঁদের কারও জীবনে মানসক্ষেত্র ছাড়া অর্থনীতিক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিশেষ দেখা যায় না। অথচ বাঙালী খ্রীস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রায় সমান। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, হিন্দুসমাজের তথাকথিত অনুচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে তো বটেই, বহুকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও যাঁরা খ্রীস্টান হয়েছেন, তাঁরা অনেকেই পুরো খ্রীস্টান হতে পারেননি, 'হিন্দু-খ্রীস্টান' হয়েছেন। কাজেই খ্রীস্টধর্ম, এমন কি প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীস্টধর্মও, প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে আর্থনীতিক কর্মজীবন অনুপ্রাণিত করতে পারেনি।

বংশগত বৃত্তির সঙ্গে এবং পিতামাতার বৃত্তির সঙ্গে যে-কোন ব্যক্তির কর্মজীবনের বাস্তবরূপের একটা সম্পর্ক আছে দেখা যায়। আমাদের দেশে এটা আরও বিশেষভাবে দেখা যায় তার কারণ কুলগত বৃত্তির বন্ধন আমাদের সমাজে যথেষ্ট দৃঢ়। ব্রিটিশ আমলে নানাবিধ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এই বন্ধন খানিকটা শিথিল হলেও একেবারে ভেঙে যায়নি। উত্তরপুরুষের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই যে বংশগত বৃত্তির একটা প্রবণতা সঞ্চারিত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কর্মকার স্বর্ণকার তন্তুবায় বণিক প্রভৃতির কুলবৃত্তি তাঁদের বংশধরদের স্বভাবতঃই কুলবৃত্তিমুখী করে তোলে। সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজে এই কুলবৃত্তি-প্রবণতা আজও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ সজাগ রয়েছে দেখা যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের কাজও করছেন। ফ্রেজার (T. M. Fraser) পশ্চিম-উড়িষ্যার কয়েকটি গ্রামে এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে তেলি জাতির (ফ্রেজারের মতে "the only real 'entre-

preneurial' caste in this section of rural India") বংশধরদের মধ্যে achievement-বোধ অনেক বেশি জাগ্রত, বংশানুক্রমিক কৃষিজীবীদের তুলনায়। ক্রেজারের এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করে ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড মন্তব্য করেছেন :[৬৪]

> "One would have to predict on the basis of our theory, that fathers engaged in the production and sale of commodities would have higher n Achievement than those engaged exclusively in traditional agriculture. And the fact that their children have higher n Achievement tends to confirm the prediction that the parents do and also the inference that the parents have managed to bring up their children in a way to give them the same higher level of n Achievement that they have."

বাংলাদেশেও সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করলে প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসক ও বণিকদের প্রধান আর্থনীতিক কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ এবং সকল জাতি-বর্ণের বাঙালীরা (প্রধানত হিন্দু) নতুন কর্ম-বৈচিত্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে যথেষ্ট লাভবানও হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বর্ণের বাঙালী হিন্দুরা, বেশ খানিকটা কুলবৃত্তির বন্ধন আলগা করে, সর্বতোভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিশেষ কুণ্ঠিত হননি। এদিক থেকে সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) কিছুটা যে বাংলাদেশে কলকাতার নাগরিক সমাজে অন্তত সঞ্চারিত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে সামাজিক জীবনের এই সাময়িক উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্য কিছুটা থিতিয়ে আসার পর পেশা বা বৃত্তি ক্রমেই কুলানুগামী হয়ে উঠছে। বিভিন্ন বর্ণস্তর থেকে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার গুণে যাঁরা সামাজিক সোপান অতিক্রম করে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁদের বংশধরদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ পুরাতন কুলবৃত্তি গ্রহণ করেননি, সামাজিক মর্যাদাহানি হবে মনে করে, কিন্তু সমাজের সাধারণ কর্মজীবনের ঝোঁক যে পুরাতন বংশানুক্রমিক বৃত্তিমুখী হয়েছে তাও বোঝা যায়। যেমন হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের গণ্ডির বাইরে যাঁরা ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে নতুন

সামাজিক মর্যাদা (social status) লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁদের বংশধরদের মানসিক গতি ছেলেবেলা থেকে চাকরি বা শিক্ষাভিমুখী করে তুলেছেন। উনিশ শতকের উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর পারিবারিক ইতিহাস থেকে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে একটা নতুন কুলবৃত্তির প্রচলন হয়েছে দেখা যায়। কাজেই নতুন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী তাঁদের বংশধরদের মধ্যে 'n Achievement'-বোধ জাগিয়ে তোলেন বটে, কিন্তু সেই বোধ প্রধানত service-education-oriented হয়ে থিতিয়ে যায়।

উনিশ শতকের প্রতিষ্ঠিত বাঙালীদের পারিবারিক ইতিহাস অনুশীলন করলে আরও একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে আঠার ও উনিশ শতকে যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাঁদের বংশধররা পরবর্তীকালে পূর্বপুরুষের বাণিজ্যবৃত্তির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ক্রমে চাকরি ও শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের ছেলেদের লেখাপড়া না শিখলে যে কোন উপায় নেই একথা প্রায় প্রত্যেক উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দু পরিবারের মা-পিসিমা-ঠাকুরমাদের মুখ থেকে শোনা যায়। রামদুলাল দে (সরকার), মদন দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের পারিবারিক ইতিহাস তার সাক্ষী।[৬৫] পরিষ্কার বোঝা যায়, উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ঘটনাচক্রে কেউ উদ্‌যোগী ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও, তাঁদের বংশধররা ক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যকে তাঁদের কুলমর্যাদার উপযোগী বৃত্তি বলে মনে করেন নি।

পশ্চিম-উড়িষ্যায় তেলিজাতির মধ্যে ফ্রেজার ও ম্যাকক্লেল্যাণ্ড যে বংশগত বাণিজপ্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন বণিকজাতির মধ্যেও তাই লক্ষ্য করা যায়। সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক তাম্বুলিবণিক তন্তুবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বাঙালী বণিকজাতির মধ্যে বংশগত বাণিজ্যপ্রবণতা বেশ প্রবল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গে—বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জেলায় দেখা যায়, ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঙালী বণিকজাতির আধিপত্য অন্যান্য জাতিবর্ণের তুলনায় অনেক বেশি।[৬৬] এমন কি কলকাতা শহরেও দেখা যায় যে শেঠ বসাক রক্ষিত লাহা পাল দত্ত মল্লিক দাঁ কুণ্ডু সাহা প্রভৃতি বিভিন্ন বণিকজাতির

মধ্যে শুধু ব্যবসাবাণিজ্য (trade and commerce) নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোগুম পর্যন্ত অনেকাংশে সীমাবদ্ধ।[৬৭] এই সব বণিক-পরিবারের বংশধরদের মধ্যে ম্যাকক্লেল্যাণ্ড বর্ণিত 'n Achievement' অনেক বেশি সজাগ। বাঙালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য পরিবারের বংশধরদের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর বা রামদুলাল দে'র বংশধরদের মধ্যে দেখা যায় যে দ্বারকানাথের শিল্পোগুম অথবা রামদুলালের বাণিজ্যস্পৃহা তেমনভাবে সঞ্চারিত হয়নি। কিন্তু বাঙালী বণিকবংশের মধ্যে যদিও তা সঞ্চারিত হয়েছে, তাহলেও তাঁদের পুরুষানুক্রমিক রক্ষণশীল, অতিসাবধানী অনুদার ঐতিহ্যাবদ্ধ মনোভাব যেহেতু আধুনিক শিল্পযুগের উপযোগী নয়, সেই হেতু বাংলাদেশে প্রকৃত ধনতান্ত্রিক শিল্পোদ্‌যোগী বিচিত্রকীর্তি পুরুষের আবির্ভাব তাঁদের মধ্যেও হয়নি।

নির্দেশিকা

প্রথমে পৃষ্ঠা সংখ্যা, পরে বন্ধনীর মধ্যে সূচকসংখ্যা

৯৮ (১) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, পৃষ্ঠা ৯১

৯৯ (২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা

৯৯ (৩) G. M. Trevelyan : *English Social History*, London May 1948, pp 478-81.

৯৯ (৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃষ্ঠা ৪৯২-৯৩।

৯৯ (৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, পৃষ্ঠা ৬৮-৫৯।

১০১ (৬) Michael Kidron : *Foreign Investments in India*, London 1965, p 14

১০২ (৭) D. R. Gadgil : *Industrial Evolution of India*, London 4th ed, Reprint 1946 pp 48-52, 76-80.

P. P. Pillai : *Economic Conditions in India*, pp 9-14

Vera Anstey : *The Economic Development of India.*

D. H. Buchanan : *The Development of Capitalistic Enterprise in India*, N. Y. 1934.

১০২ (৮) Lovat Fraser : *Iron and Steel in India*, Bombay 1919, p 6.

১০২ (৯) Fraser : op. cit, pp 11-12

Frank Harris : *Life of Jamshedji Tata*, pp 151-52.

১০২ (১০) D. R. Gadgil : op. cit, pp 270-279.

১০৩ (১১) D. R. Gadgil : op. cit p 271.

১০৩ (১২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৫৫

১০৪ (১৩) "...the first published reference to the mining of coal dates back to the year 1774 when shallow mines are reported to have been developed in the Raniganj field."—Report of the Indian Coalfields' Committee, 194 , I, P 19.

১০৪ (১৪) Report of the Indian Coalfield's Committee, I, P 19.

১০৪ (১৫) Op. cit. Ch. III.

১০৫ (১৬) The Hindoo Patriot, 16 April 1857.

১০৬ (১৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃষ্ঠা ৩৫৭

১০৭ (১৮) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৮ শক, কার্তিক-অগ্রহায়ণ—'দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি' সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর আলোচনা। Kissory Chand Mittra : *Memoir of Dwarkanath Tagore* (Originally read at the 27th Hare Anniversary Meeting Held at the Town Hall on the 1st June 1870) Calcutta 1870.

The Calcutta Gazette, 15 January 1848

The Bengal Hurkaru, 5 April 1848 : কার-ট্যাগোর কোম্পানির পাওনাদারদের সভার বিবরণ আছে।

১০৮ (১৯) Board of Revenue Sadar, Misc. Proceedings 1839, No, 210,

১১০ (২০) দ্বারকানাথ ঠাকুর ও 'কার-ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ Board of Revenue Proceedings, 1821-50 এবং Board of Custom, Salt and Opium Proceedings, 1821-34-এর মধ্যে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের ব্যাঙ্কিং-এর আদিপর্বের ইতিহাসে, বিশেষ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ইতিহাসে অনেক উপকরণ আছে।

১১৪ (২১) Grish Chunder Ghose: Ramdoolal Dey, the Bengalee Millionaire—A lecture delivered at the hall of the Hooghly College on 14 March 1868. রামদুলাল সম্বন্ধে অধিকাংশ বৃত্তান্ত ও তথ্য এই রচনা থেকে গৃহীত।

Lokonath Ghosh: *The Modern History of Indian Chiefs etc*, Part II The Native Aristocracy and Gentry, Calcutta, 1881.

১১৮ (২২) সমাচার দর্পণ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০।

ব্রজেন্দ্রনাথ: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃষ্ঠা ২৬৯।

১১৯ (২৩) সমাচার দর্পণ, ১৪মে ১৮২৫।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃষ্ঠা ২৯৭।

১১৯ (২৪) সমাচার দর্পণ, ২০ অক্টোবর, ১৮৩৮।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃষ্ঠা ৫৪৩।

১২০ (২৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ১ম, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩।

১২১ (২৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ১ম, পৃষ্ঠা ৬৭-৭০।

১২২ (২৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ১ম, পৃষ্ঠা ৯৭।

১২২ (২৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ১ম, পৃষ্ঠা ১১৩।

১২২ (২৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ১ম, পৃষ্ঠা ৪০৮-৯।

১২২ (৩০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ২য়, পৃষ্ঠা ১৮২।

১২৩ (৩১) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ২য়, পৃষ্ঠা ২৪৮।

১২৩ (৩২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৩য়, পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৬।

১২৪ (৩৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪।

১২৫ (৩৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৮।

১২৬ (৩৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৩০-৩৪।

১২৭ (৩৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৪১-৪৩।

১২৮ (৩৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৫৬-৬০।

১২৮ (৩৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৮০৭-৮।

১২৮ (৩৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৮০৮-১০।

১৩০ (৪০) Gunnar Myrdal: *Economic Theory and Under-developed Regions*, London 1959, pp 57-60.

১৩২ (৪১) Douglas Hall: *Ideas and Illustrations in Economic History*, U.S.A. 1964: p 15.

১৩২ (৪২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১২০-২২।

১৩৩ (৪৩) The Proceedings and Transactions of the Bethune Society, November 1859 to April 1869: Calcutta 1870.

১৩৪ (৪৪) Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose: Ed. by M. N. Ghosh, Calcutta 1912, pp 664-67.

১৩৪ (৪৫) A. Mitra: Census of India 1951, Vol. V, West Bengal etc. Part—I-A-Report, p 152.

১৩৬ (৪৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৮০-৮৯

১৩৯ (৪৭) Report of the Land Revenue Commission of Bengal, vol I, pp 35-39.
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: বোম্বাই চিত্র, কলিকতা ১২৯৫, পৃষ্ঠা ৪৪৭-৮

১৪৩ (৪৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩১৮-২২

১৪৪ (৪৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৪৯

১৪৪ (৫০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: ২য়, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৭৭

১৪৪ (৫১) *The Hindu Sea-Voyage Movement in Bengal:* Published by the Standing Committee on the Hindu Sea-Voyage Question, Calcutta 1894.

১৪৭ (৫২) দুর্গাচরণ রক্ষিত: কুশদ্বীপ কাহিনী, ১৩০৮
বিনয় ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

১৪৮ (৫৩) J. A. Schumpeter: *The Theory of Economic Development*, Harvard 1934.

১৪৯ (৫৪) David C. McClelland: *The Achieving Society* (Princeton 1961), Chapter 6, p. 205.

১৫০ (৫৫) McClelland: op. cit, p. 46.

১৫১ (৫৬) McClelland: op. cit, p. 192, p. 198

১৫২ (৫৭) Max Weber: 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism': From Max Weber, *Essays in Sociology*. London 1947, p. 321

১৫২ (৫৮) Erich Fromm: *The Fear of Freedom*, London 1955, pp. 93-94.

১৫২ (৫৯) Max Weber: op. cit, p. 323.

১৫৩ (৬০) McClelland: op. cit, p. 357.

১৫৩ (৬১) H. B. Lamb: 'The Indian Merchant' in *Journal of American Folklore*, 1958.
McClelland: op. cit, p. 364.

১৫৩ (৬২) D. T. Suzuki: *Zen and Japanese Culture*, New York 1959.
McClelland: op. cit, pp. 380-381.

১৫৩ (৬৩) বিনয় ঘোষ: সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য়, সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা ২৭-৩০

১৫৬ (৬৪) McClelland: op. cit, pp. 380-81 (T. M. Fraser; 'Achievement Motivation as a factor in rural development: A report on research in Western Orissa'—Unpublished paper, Haverford College 1961)

১৫৭ (৬৫) Lokenath Ghosh: *op. cit.*

১৫৭ (৬৬) বিনয় ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

১৫৮ (৬৭) দুর্গাচরণ রক্ষিত: কুশদ্বীপ কাহিনী, কলিকাতা ১৩০৮
মদনমোহন হালদারস্য: বসুক অর্থাৎ বসাকাদি উপাধিবিশিষ্ট জাতির পরিচয়, কলিকাতা ১৮৯৫

নগেন্দ্রনাথ শেঠ : কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস। কলিকাতা ১৯১০

নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ

পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী : বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস

নরেন্দ্রনাথ লাহা : সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি, তিনখণ্ড

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়—বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ-পরগণা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ—বহু প্রাচীন 'বণিক'-পরিবারের (তাম্বুলিবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি) বাস আছে। তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে এবিষয়ে আলোকপাত করার মতো অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাংলার আর্থনীতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য সরজমিনে এই ইতিহাস সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক।—লেখক

৪

বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী

ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে মানুষের সমাজের গড়ন (structure) বদলায়। সমাজে মানুষের বিভিন্ন স্তর (stratum) ও শ্রেণী (class) থাকে এবং প্রত্যেক স্তর ও শ্রেণীর সঙ্গে পারস্পরিক একটা বিশেষ সম্পর্কও (relation) থাকে। প্রধানত দেখা যায়, সমাজে উৎপাদন-পদ্ধতির (mode of production) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের উপর সামাজিক শ্রেণীবদ্ধতা (social stratification) ও শ্রেণীগত সম্পর্ক নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণীবদ্ধতা থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীগত মনোভাবও গড়ে ওঠে। এই শ্রেণীগত মনোভাবের সঙ্গে ক্রমে একটা স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদাবোধের বিকাশ হয় এবং পরে অর্থসামর্থ্যের সঙ্গে মর্যাদাও (status) শ্রেণীবিচারের বেশ গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সামাজিক শ্রেণীর সঙ্গে যে অর্থসঙ্গতি, ক্ষমতা, মর্যাদা প্রভৃতি অনেককিছু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একথা তাঁরা স্বীকার করেন। অর্থই (money) যে সামাজিক শ্রেণীবিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়, এ বিষয়ে ইদানীং সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায় দ্বিমত নেই বলা চলে, এমন কি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও।[১] অবশ্য অর্থের গুরুত্ব এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের আগে মধ্যযুগে সামাজিক জীবনের ভারকেন্দ্র ছিল ভূসম্পত্তি (landed property), তাই মধ্যযুগের জীবন ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। প্রত্যেক মানুষের জীবনের কর্তব্যকর্ম ছিল তখন প্রকৃতি-নির্দিষ্ট, অর্থাৎ দেবতা-নিয়ন্ত্রিত। বংশ ও ভূসম্পত্তি—এই ছিল সামাজিক শ্রেণীবিচারের দু'টি প্রধান মানদণ্ড। দু'টি মানদণ্ডই স্থিতিশীল। বংশগতধারা ও ভূসম্পত্তি কোনটারই পরিবর্তন হত না। ভূসম্পত্তির হস্তান্তর হত, হ্রাসবৃদ্ধি হত, কিন্তু তাতে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন হত না। বংশের তো হয়ই না। এই কারণে মধ্যযুগের সমাজের গড়ন ছিল কতকটা নীরেট পিরামিডের মতো স্তরবিন্যস্ত। পিরামিডের মতো স্থিতিশীল সমাজে বাস করার ফলে মধ্যযুগের মানুষের

আচার-ব্যবহার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ, সবই ছিল অত্যন্ত দৃঢ়বিন্যস্ত। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন বলেছেন :[২]

> "The Middle Ages in their social structure as well as in their thought had a rigidly graduated system. There was a pyramid of Estates as well as a pyramid of values. Now these pyramids are about to be destroyed, and 'free competition' is proclaimed as the law of nature. God and blood, the traditional powers, are deposed, and though they maintain some of their importance their dominance is shattered."

দেবতা ও বংশ উভয়েরই মর্যাদা ও অখণ্ড-প্রতিপত্তি যখন খণ্ডিত হল, সমাজে একটা বাধাবন্ধহীন প্রতিযোগিতার পরিবেশ রচিত হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পেল মানুষ, তখন সমাজের পিরামিডের মতো অচল স্তরগুলিতেও ফাটল ধরতে আরম্ভ করল। সমাজের স্তরবিন্যাস, তথা শ্রেণীবিন্যাস বদলাতে থাকল। মধ্যযুগের দৃঢ়স্তরিত সমাজে উর্ধ্বাধ গতিশীলতা (vertical mobility) একরকম ছিলই না বলা চলে। আধুনিক সমাজে এই গতি সঞ্চারিত হল এবং তার ফলে সামাজিক গড়নের, অর্থাৎ স্তরায়নের পরিবর্তনও আরম্ভ হল ধীরে ধীরে।

ব্রিটিশ আমলে আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বাংলাদেশেও সামাজিক স্তরায়নের এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়। আঠার শতকের মধ্যেই দেখা যায়, বর্ধিষ্ণু শহর কলকাতায় যে নতুন নাগরিক অভিজাতশ্রেণীর (urban aristocracy) বিকাশ হয়, তার মধ্যে—অর্থাৎ এই অভিজাতদের আদি-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রাচীন বংশগত মর্যাদা বিশেষ কেউ দাবি করতে পারেন না। কলকাতা শহরের নব্য-অভিজাতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা ('family founders' বলা যায়), বংশপরিচয়ের দিক থেকে তাঁদের অজ্ঞাতকুলশীল বললেও অত্যুক্তি হয় না। শোভাবাজারের রাজ-পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, সিমলার দে-সরকার-পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ-পরিবার প্রভৃতি কলকাতার উচ্চশ্রেণীর পরিবার-প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্বপুরুষরা অধিকাংশই প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে কলকাতা শহরে ইংরেজদের জমিদারী, বাণিজ্য ও শাসনক্রিয়ার ফলে এতরকমের বিচিত্র কাজকর্ম করে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের সুযোগ হয়েছিল যে চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষীরা তখন অর্থের ধান্ধায় নতুন শহর অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন। কলকাতার বাঙালী অভিজাতশ্রেণীর পরিবার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রমুখ উচ্চশ্রেণীর হিন্দু পরিবার-প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই প্রায় ইংরেজদের অধীনে দেওয়ান বেনিয়ান মুনশী খাজাঞ্চী সরকার প্রভৃতি পদে চাকরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, রামদুলাল দে ও গঙ্গানারায়ণ সরকারের মতো দু'চারজন ছাড়া। এঁরা অংশত বাণিজ্যলব্ধ অর্থে ধনী হয়েছিলেন।

শোভাবাজারের রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রেভিনিউ-বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। খিদিরপুর ভূকৈলাসের ঘোষাল-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ মিডলটন ও রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ানী করে প্রতিষ্ঠা পান। কুমোরটুলির মিত্র-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতায় ইংরেজের জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেস্টিংসের সরকার ছিলেন। জোড়াবাগানের রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার পটুয়ার আফিমের এজেন্সির দেওয়ানী করে সমৃদ্ধি লাভ করেন। এরকম আরও অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পরিবারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।[৩] কিন্তু বাঙালী বণিকজাতির মধ্যে অধিকাংশই— শেঠ বসাক মল্লিক লাহা দত্ত বিশ্বাস দাঁ প্রভৃতি—ব্যবসাবাণিজ্য করে আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থ যাঁরা চাকরি করেছেন, তাঁরাও অনেকে একরকমের ব্যবসা করেছেন। এই ব্যবসাটি হল ঠিকাদারী ও ইজারাদারীর ব্যবসা। আঠার শতকে কলকাতা শহরের হাট বাজার ঘাট ইত্যাদির ঠিকাদারী থেকে আরম্ভ করে লবণ আফিম ইত্যাদি দ্রব্যের ঠিকাদারী পর্যন্ত করতে তাঁরা উৎসাহী হয়েছেন এবং তাতে তাঁদের প্রচুর অর্থলাভও হয়েছে।[৪] ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা শহরে এই যেন-তেন প্রকারে অর্থ উপার্জনের ধান্ধার কথা মনে করে বলেছেন :[৫]

"ধন্য ধন্য ধার্মিক ধর্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্ত দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন ।"

ভবানীচরণের এই উক্তির মধ্যে একটু শ্লেষ বেশি থাকলেও এর যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। "অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা" "সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর" যে বাংলাদেশে কলকাতা শহরে উন্মুক্ত করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, যদিও দেশের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি তার ফলে বিশেষ কিছু হয়নি। অর্থনীতিবিদ্ শুম্পিটার বলেছেন যে শ্রেণীগত বাধা অতিক্রম করে উচ্চতর শ্রেণীতে যাত্রার অন্যতম উপায় হল ব্যক্তির দিক থেকে পূর্বনির্দিষ্ট কর্ম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোন কর্ম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করা—"*to do something altogether different* from what is, as it were, ordained to the individual." পারিবারিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ঘটনাচক্রে, দৈব ভাগ্য ও ব্যক্তিগত শক্তির জোরে, অনেকে শ্রেণীসোপানের উচ্চতর ধাপে উঠেছেন, কিন্তু এগুলি ছাড়াও উপরে ওঠার সবচেয়ে বড় উপায় হল "the method of striking out along unconventional paths." সর্বকালে একথা প্রযোজ্য, কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগের মতো কোনকালে এমন ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়—"This has always been the case, but never so much as in the world of capitalism."[৬] শুম্পিটার একথা লিখেছেন প্রধানত ধনতান্ত্রিক যুগের 'entrepreneur'-এর কথা মনে করে। বাংলাদেশে এই entrepreneur আমরা বিশেষ দেখতে পাই না, এবং সেদিক থেকে কেউ নতুন শ্রেণীগত মর্যাদা আঠার-উনিশ শতকে লাভ করেননি (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তবে কলকাতা শহরে যাঁরা নতুন নাগরিক অভিজাতশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে

অনেকে যে সমাজ-নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তি ছাড়া একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজ করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে। এই কর্মতালিকা ভবানীচরণ যা দিয়েছেন তার মধ্যে উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রযোজ্য, যেমন 'বেতনোপভুক সরদারি জুয়াচুরি পোদ্দারী ভাড়ামি দাস্য দৌত্য' প্রভৃতি। এর সঙ্গে আরও যে কয়েকটি কাজ যোগ করা যায় তা হল দেওয়ানী সরকারী মুনশীগিরি বেনিয়ানি মুচ্ছুদ্দিগিরি ঠিকাদারী ইজারাদারী প্রভৃতি। বাণিজ্য-কর্মও আছে, কিন্তু অল্প।

বাংলাদেশে এই নতুন শ্রেণী-রূপায়ণ গোড়া থেকেই কিন্তু সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হয়নি। তার অন্যতম কারণ সনাতন জাতিবর্ণের বিভেদরেখাগুলিকে নতুন গতিশীল টাকা ধূলিসাৎ করতে পারেনি। বর্ণভেদের জন্য আভিজাত্যবোধ হয়ত খণ্ডিত হয়নি, কিন্তু শ্রেণীসংহতি নিশ্চয় ব্যাহত হয়েছে। জাতিবোধ ও শ্রেণীবোধ বাঙালী হিন্দুসমাজে একটা বিচিত্র মিশ্ররূপ ধারণ করেছে। যে সব বাধাবিপত্তির জন্য শ্রেণীগত সীমানা সাধারণত দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তার মধ্যে অন্যতম হল জাতিবর্ণগত বাধা। শুম্পিটার বলেছেন: "This is the case only where ethnic differences exist—the Indian caste system is the outstanding example and has nothing to do with the essential nature of the class phenomenon."[৭] ধনিকশ্রেণী বা নতুন অভিজাতশ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে হয়েছে, গ্রামে ও শহরে, এবং জাতিভেদ সমাজ থেকে লুপ্ত না হলেও, শ্রেণীরূপায়ণের রেখাগুলি তার মধ্যেই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধনিকশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর উদ্‌ভব হয়েছে আধুনিক বাঙালী সমাজে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা

বাংলাদেশে নতুন শ্রেণীরূপায়ণের ফলে সমাজে যে-শ্রেণীর বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই শ্রেণীর, অর্থাৎ মধ্যবিত্তের, সঠিক কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন, কারণ "in modern civilized countries,

the class structure is exceedingly complex, and that any clsssification involving the notion of a 'middle class' or of an identifiable constellation of 'middle classes' is bound to be arbitrary, and to be quite lacking in scientific precision."[৮] মধ্যবিত্তশ্রেণীর বর্তমান আকার (size) যেমন বিশাল হয়েছে, তার রূপও হয়েছে তেমনি জটিল। পৃথিবীর সকল দেশেই হয়েছে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমান কালের মধ্যবিত্তের এই বিপুলতা ও জটিলতা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই মধ্যবিত্তের আবির্ভাব, তার প্রাথমিক বিকাশকাল ও ঐতিহাসিক ভূমিকা আমাদের আলাচ্য বিষয়।

ঐতিহাসিক পোলার্ড (A. F. Pollard) আধুনিক যুগে মধ্যবিত্তের 'role' বা ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছেন :[৯]

> "...feudalism contemplated, roughly only two classes, the lords and their villeins. Now, the industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide ; it requires a middle class and it requires an urban population. Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history. Without commerce and industry there can be no middle class ; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation."

মধ্যবিত্তশ্রেণী ও নগরবাসী না থাকলে আধুনিক যুগের অভ্যুদয় হত না এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের কোন পার্থক্যও কিছু বোঝা যেত না। পোলার্ড বলেছেন যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার না হলে মধ্যবিত্তের অথবা শহর-নগরের বিকাশ হত না, এবং তা না হলে রেনেসাঁস বা রিফর্মেশন কোন কিছুই সম্ভব হত না। পোলার্ডের এই উক্তি ও যুক্তির সমর্থন আধুনিক ইতিহাসের ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রসঙ্গে পোলার্ড বলেছেন :[১০]

> "England...has been for centuries peculiarly the land of the middle classes ; they give the tone to everything English, good or

bad, and English history has been made by its middle class to a greater extent than the history of any other country."

ইংলণ্ডের মতো বাংলাদেশকেও যদি "peculiarly the land of the middle classes" বলা যায়, তাহলে ভুল হয় না। এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে একথাও বলা যায় যে "they give the tone to everything Bengali, good or bad." ইংলণ্ডের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসও প্রধানত মধ্যবিত্তের হাতে গড়া। আমরা আধুনিক ইতিহাসের কথা বলছি, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের নতুন ইতিহাসের ধারার কথা।

বাঙালী মধ্যবিত্তের বিকাশ

১৮২৯ সালে 'বঙ্গদূত' পত্রিকা, বোধ হয় সর্বপ্রথম শ্রেণী হিসেবে বাঙালী মধ্যবিত্তের কথা উল্লেখ করেছেন। মধ্যবিত্তের সামাজিক স্থান নির্দেশ করে 'বঙ্গদূত' লিখেছেন (১৩ জুন, ১৮২৯) : "যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে। এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।"

এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তির আর্থনীতিক কারণ বিশ্লেষণ করে 'বঙ্গদূত' বলেছেন যে গতকয়েক বছরের মধ্যে গৌড়দেশের (বাংলাদেশের) অনেক ধনবৃদ্ধি হয়েছে। 'বঙ্গদূতে'র মতে বাংলাদেশের এই ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধির কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথম কারণ, "পূর্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে"—দ্বিতীয় কারণ, "এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে"—তৃতীয় কারণ, "অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে"। এই কারণগুলি এত সহজে প্রত্যক্ষ যে, 'বঙ্গদূতে'র মতে তার ভূমিকারও প্রয়োজন নেই, "যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং"। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে : মাত্র ত্রিশ বছর আগেও

যে সমস্ত জমির মূল্য ছিল ১৫ টাকা, এখন (১৮২৯-৩০) তার মূল্য হয়েছে অন্তত ৩০০ টাকা। "এমতে ভূম্যাদির মূল্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে"। দশবছর আগে কলকাতা শহরে যে লোক মাসে 'দুই তঙ্কা' বেতন পেত, সে এখন 'চারি পাঁচ তঙ্কা' বেতন পেয়েও সন্তুষ্ট নয়। পূর্বে যে সূত্রধর ৮ টাকা বেতনে কাজ করত, সে এখন ২০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পায়। শ্রমের মূল্যও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে—"পূর্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না।" আগে শালিভূমির এক বিঘে রাজস্ব ছিল একটাকা, এখন জমির মালিকরা বাড়িয়ে তিন-চার টাকা করেছেন। আগে যে চাল প্রতি মণ আট আনায় বিক্রি হত, এখন তার মূল্য গড়ে দুই টাকা হয়েছে। "অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।"

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও 'বঙ্গদূত' আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন যা আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হবে। কারণটি হল, অর্থের সচলতা (mobility of money)। 'বঙ্গদূত' লিখেছেন : "ফলিতার্থ এ প্রকার এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যে হেতুক ধন আর সার মৃত্তিকা ইহা রাশিকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।" সারমৃত্তিকার সঙ্গে এখানে অর্থের তুলনা করে বলা হয়েছে যে, সার যেমন একস্থানে স্তূপীকৃত করে রাখলে তাতে কোন ফল পাওয়া যায় না, অর্থ বা টাকাও তেমনি সিন্দুকে স্তূপাকার করে সঞ্চয় করে রাখলে তার দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় না। উপমাটি সুন্দর। সমাজবিজ্ঞানী সিমেলের (Simmel) আধুনিকযুগের টাকা সম্বন্ধে বিখ্যাত উক্তির কথা মনে হয়—"There is no more apt symbol than money to show the dynamic character of this world : as soon as it lies idle it ceases to be money in the specific sense of the word ; the function of money is to facilitate motion."[১১]

বাণিজ্যকর্মের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও বিস্তারের ফলে বাংলার সমাজে অর্থের সচলতা দেখা দিয়েছে এবং যে-অর্থ একসময় "এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল" তা বহু লোকের হাতে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের বিস্তৃত স্তরে টাকার এই চলাচলের প্রত্যক্ষ ফল হল বাংলাদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ। 'বঙ্গদূতে'র মতে "গৌড়রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে।"[১২] ১৮২৯ সালের উক্তি। এই উক্তি থেকে মনে হয় যে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে নতুন বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা অনেকটা সচ্ছল ছিল। শহরের মধ্যবিত্ত, যাঁরা চাকরি ও নানারকমের ব্যবসাবাণিজ্য করতেন, এবং গ্রামের মধ্যবিত্ত যাঁরা প্রধানত জমিদারীর উপস্বত্ব-ভোগী ছিলেন, তাঁরা তখনও পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রে, শহরে বা গ্রামে, স্বশ্রেণীর (মধ্যবিত্তের) সংখ্যাধিক্যহেতু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হননি। কাজেই 'বঙ্গদূত' তখন বাঙালী মধ্যবিত্তের মতো 'সুস্থ সন্তুষ্ট' লোক এদেশে আর কোথাও দেখতে পাননি। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পর্বের মধ্যেই (১৮৭৫-১৯০০) বাঙালী মধ্যবিত্তের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, শহর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রেই, তার 'সুস্থ সন্তুষ্ট' রূপও দ্রুত বিকৃত হতে থাকে।

বাংলার গ্রাম্য মধ্যবিত্তের কথা আমরা আগে বলেছি (প্রথম অধ্যায়)। আমরা দেখেছি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর আশি বছরের মধ্যে—অর্থাৎ প্রায় তিন পুরুষের মধ্যে—বাংলাদেশের প্রত্যেক জমিদারীতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যে জমিদারীর সংখ্যা হয়েছিল প্রায় দেড়লক্ষের বেশি। তার মধ্যে পাঁচশো একরের ছোট ক্ষুদ্র জমিদারীর সংখ্যা তের লক্ষের বেশি (পৃষ্ঠা ২৭-২৮)। শুধু মধ্যস্বত্বভোগীদের এই চেহারা দেখে গ্রাম্য মধ্যবিত্তের গতি ও পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। ক্ষুদে জমিদার-পত্তনিদার গাঁতিদার প্রভৃতি আমলাবর্গ, নায়েব-গোমস্তা-তহশীলদার প্রভৃতি গ্রামের কারুজীবী, কোর্ট-কাছারীর কর্মচারী, দারোগাবাবু ও তাঁর সেপাই সামন্ত, অবস্থাপন্ন চাষী এবং অন্যান্য যাঁদের নিয়ে গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাঁদের কারও আর্থিক অবস্থা বা পদমর্যাদা উনিশ শতকের গোড়ায় যা ছিল, শেষদিকে তা ছিল না। না থাকার প্রথম কারণ হল মধ্যবিত্তের কলেবরবৃদ্ধি এবং এক শতাব্দীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে নাগরিক প্রভাবের ক্রমবিস্তার। গ্রামে নাগরিক জীবনের প্রভাব বিস্তারের ফলে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্রমে

'absentee' ভূস্বামীশ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। নাগরিক ভোগবিলাসের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা একদিকে যেমন গ্রাম্যসমাজের প্রতি চরম ঔদাস্যে তার অবনতির পথ পরিষ্কার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের আর্থিক দুরবস্থার পথও মসৃণ করেছেন (পৃষ্ঠা ৪৯-৫১)। শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব অনুযায়ী গ্রামের অবনতি হয়েছে দেখা যায়। অনেকটা বৈজ্ঞানিক সূত্রের মতো বলা যায়, শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব যত কম, গ্রামের অবনতি তত বেশি; এবং গ্রামের দূরত্ব যত বেশি, অবনতি তত কম। চব্বিশ-পরগণা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় কলকাতা শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলি—এমনকি প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রামগুলিও দেখলে একথা যে কতদূর সত্য তা বোঝা যায়।[১৩] গ্রামের আর্থিক দুর্গতির ফলে সাধারণ গ্রাম্য মধ্যবিত্তের তো বটেই, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদেরও আর্থিক বিপর্যয় হওয়া স্বাভাবিক।

মধ্যবিত্তের মুখপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথমে মধ্যবিত্তের গুণকীর্তন করে, পরে তার এই অবস্থা-বিপর্যয়ের কথা বলেছেন। ১৮৬৯ সালে তাঁরা লিখেছেন:[১৪]

> "মধ্যবিত্ত লোকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ইহাদের ধনাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না, অথচ গুণটি থাকে। ইহারা দরিদ্রগণের স্থায় অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না, অথচ কর্মঠ হন, সুতরাং ইহারা যেরূপ আত্মোৎকর্ষের সুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বীয় উন্নতির প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ইহারা সেইরূপ প্রবলভাবে অনুভব করেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিক উপকারী রূপে পরিগণিত হন। এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যত রূপ শুভ সূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য। কিন্তু এদেশে ক্রমে এই সমস্ত লোক অপলোপ প্রাপ্ত হইতেছেন।"—৯ ডিসেম্বর ১৮৬৯।

বাংলাদেশে উনিশ শতকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে তা অনেকাংশে সত্য, যদিও "সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব" মধ্যবিত্তের লক্ষ্য নয়, কর্মও নয়। তবে বাংলাদেশে নবযুগের ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি যে প্রধানত মধ্যবিত্তেরই কীর্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৮৬৯-৭০ সালের মধ্যেই যে মধ্যবিত্তের

আর্থিক অবস্থা কতদূর শোচনীয় হয়েছিল তা উক্ত পত্রিকার এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। "মধ্যবিত্ত লোকের দুইটি জীবনোপায় ভূমিসম্পত্তি এবং চাকুরী এবং ইংরেজ শাসন প্রভাবে দুইটিই ক্রমশঃ অন্তর্ধান করিতেছে।" বাংলার গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে পত্রিকা যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার অনেকটাই বাস্তব সত্য ঃ

"মধ্যবিত্ত লোকগণ প্রায়ই গাঁতিদার। পূর্বে জমিদার প্রজায় আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি ছিল, সুতরাং উভয় উভয়ের দুঃখ দরদ বুঝিতেন। জমিদারের অবস্থার তারতম্য হইলে প্রজা তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থদ্বারা সাহায্য করিতেন ও প্রজার অবস্থার ভালমন্দ হইলেও জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহার দুরবস্থা বুঝিতেন। রাজ-পুরুষগণের ১০ আইনে জমিদার প্রজায় এই শুভকর সম্বন্ধটি উচ্ছেদ করিয়াছে। ইহাতে উভয় প্রজা ও জমিদারকে পরস্পর স্বাধীন করিয়াছে। অথচ পরস্পর পরস্পরকে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা উভয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। জমিদারগণ প্রবল, সুতরাং প্রজাগণ এরূপ বন্দোবস্তের হিতকর ফলে উপভোগী না হইয়া প্রত্যুত এক্ষণ পদে পদে অনিষ্টকর ফলে জর্জরিত হইয়াছে। ১০ আইনের নিমিত্ত গাঁতিদারগণ একপ্রকার উচ্ছন্ন গিয়াছেন এবং যাঁহারা বজায় আছেন, তাঁহারা জমিদারগণের সম্পূর্ণ কৃপার অধীন। মনে করিলে মুহূর্ত মধ্যে তাঁহারা গাঁতিদারগণকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। যশোর ও নদীয়ায় সৌভাগ্যশালী গাঁতিদার অতি কম আছেন। এমন কি অনেককে এক্ষণ অন্নকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

"এদেশে পল্লীগ্রাম মাত্রেই দুই এক জন মধ্যবিত্ত লোকের বাস, এবং যিনি কখন ইতিমধ্যে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ইঁহাদের কেমন ভগ্নদশা। প্রায় অনেকের গৃহ ইষ্টক নির্মিত, এমন কি অনেকের গৃহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, কিন্তু সকলই প্রায় ভগ্ন হইয়া পতিত হইতেছে। বট বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বনাকীর্ণ হইতেছে। বাটীতে আর লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয় না, অপিচ অপরিষ্কার বন, পুতিগন্ধ সম্বলিত প্রাসাদ, প্রভৃতি দারিদ্র্য দশার চিহ্ন লক্ষিত হয়। যাঁহাদের পিতামহগণ দান ধ্যানে দেশমান্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের হয়ত দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার সংগ্রহ হওয়া কঠিন। অনেকেই দুর্দশান্বিত হইয়া কখন কখন ঘৃণাস্কর জীবিকা দ্বারা উদর পুর্তি করিতেছেন। অনেক সময় অবস্থা দৃষ্টে অনেকে তাঁহাদের নিজ পরিচয়ও বিশ্বাস করে না। ফলে উভয় দিক হইতে মধ্যবিত্ত লোকদিগের শোণিত শোষণ করিয়া জমিদার ও দরিদ্র প্রজাগণ পুষ্টি বর্ধন করিতেছে এবং ক্রমে সমাজের এরূপ হিতকর সম্প্রদায়ী অন্তর্হিত হইতেছে।"

বাংলার গ্রাম্য মধ্যবিত্তের জীবনের এই বাস্তব চিত্রের মধ্যে কোন অতিরঞ্জন

নেই। গ্রামাঞ্চলে দরপত্তনিদার ও গাঁতিদাররা মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ। একদিকে কৃষকদের দুর্দশা, অন্যদিকে জমিদারী উপস্বত্বের বহুবিভাগের ফলে এই মধ্যবিত্তের জীবন ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এদিকে নাগরিক সমাজে 'ভদ্রলোক'-রূপে পরিগণিত হবার আকর্ষণে যত তাঁরা নগরাভিমুখী হয়েছেন, তত গ্রামের প্রতি তাঁদের অনাদর-অবজ্ঞা বেড়েছে এবং বাংলার গ্রাম্যসমাজ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্তের গ্রাম্য ঘরবাড়ির যে দৃশ্য পত্রিকায় আঁকা হয়েছে, তা উনিশ শতকের শেষদিকে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এমন কি বিংশ শতকের প্রথম পর্বেও বাংলার গ্রামের এই করুণ দৃশ্যের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী

বাংলাদেশে আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে প্রধানত কলকাতা শহরের আর্থিক কর্মজীবন কেন্দ্র করে। কলকাতার আর্থিক কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রিক ছিল—"the cities of underdeveloped countries are commercial and administrative rather than industrial centres."[১৫] তার ফলে কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে কেবল একধরনের কর্মজীবনের বিস্তার হয়েছে ও বৈচিত্র্য বেড়েছে, সেটি হল 'services' বা চাকরি। রাষ্ট্রসংঘের 'বিশ্বসমাজ-সমীক্ষা'র রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শিল্পানুন্নত দেশে এইটাই হল আর্থিক-সামাজিক জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য—"The so-called 'services' are the only broad category of employment showing any general increase with urbanization."[১৬] শিল্পোন্নত দেশেও চাকরির ক্ষেত্রের বিস্তার হয়, কিন্তু সেখানে সেটা শিল্পায়নের গতির 'over-head' হিসেবে গড়ে ওঠে, কিন্তু অনুন্নত দেশে তা হয় না। প্রকৃত যন্ত্রায়ন (mechanization) হলে এবং শিল্পায়নের সংশ্লিষ্ট উপশিল্পের বিস্তার হলে নানারকমের কাজকর্ম পর্যাপ্ত অনভিজ্ঞ মানবিক শ্রম (unskilled human labour) নিয়োগ করে করার দরকার হয় না। কিন্তু অনুন্নত দেশে যেহেতু যন্ত্রায়ন ও শিল্পায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, সেইজন্য যন্ত্রের কাজ সাধারণ মানুষের মেহনত দিয়েই করা

হয়। এই সমস্ত দেশে নাগরিক রূপায়ণের অগ্রগতির সঙ্গে তাই দেখা যায়, শহরে খুচরা ব্যবসায়ী, ভেণ্ডার, নানারকমের কর্মচারী, কুলিমজুর এবং বিচিত্র সব কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত (যাকে 'activities not defined' বলা যায়) লোকের সংখ্যা ক্রমে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'activities not defined' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে "street-hawkers, porters, surplus servants, lottery ticket sellers, beggars, odd-jobs men, and various others who sit about much of the day, waiting for the chance to gain a little money.' ১৭ কলকাতা শহরের আর্থিক জীবনের বিকাশ অনেকটা এই ধারাতেই হয়েছে। কুলিমজুর, হকার, পোর্টার, ভিক্ষুক, চাকর প্রভৃতি 'non-productive' প্রলেটারিয়েট-শ্রেণীর কথা বাদ দিলে যাঁদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মধ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বিচিত্র রকমের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব কর্মচারী।

চাকরির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালীর যে প্রতিমূর্তি (image) চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে, সেটি হল 'কেরানীর মূর্তি'। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, দেশের আর্থিক জীবনের বিচিত্র আবর্তের মধ্যেও, মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই কর্মমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সেকালে 'কেরানী' বহুনামে অভিহিত হতেন—'writer' 'clerk' 'copyist' ইত্যাদি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন ইংরেজিশিক্ষার তেমন প্রচলন বা বিস্তার হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেকার কালে, তখনও কলকাতার সদাগরী ও বে-সরকারী আফিসে বাঙালী কেরানীদেরই সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি ছিল বেশি। তৎকালে পর্যটকদের বৃত্তান্ত থেকে এই কেরানীদের কাজ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বেতন সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করা যায়। ১৮৪০-এর গোড়ার দিকে জনৈক বিদেশী পর্যটক কলকাতা শহরে ককারেল কোম্পানির আফিসের কেরানীদের সম্বন্ধে লিখেছেন :১৮

"In the lobby of the office, there are probably eight or a dozen native writers, some of them are seated on the ground with legs across, and having little books on their knee or on a small box before them, others are seated at desks; some of these Bengalees are writing in their own language, others in English,

their wages are from four to ten rupees monthly. In the common room, there are say five or six East-Indian 'writers', having salaries of and from sixty to one hundred rupees, and generally there are about a dozen native writers, who have from eight to twenty rupees a month. On the upper floor are the European partners' and European clerks' rooms."

এই পর্যটক লিখেছেন যে কলকাতার বিদেশের সদাগরী আফিসগুলির বাইরের চেহারা খুব 'showy' এবং আফিসের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় হলঘরটি সেটি হল "The sanctum sanctorum of the merchant." এছাড়া আফিসের পিছনে একটি বিশাল ঘেরা বারন্দা থাকে যেখানে সাহেব-বণিক তাঁর সাহেব-সহকারীদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে চিন্তাক্লান্ত বা কর্মক্লান্ত হয়ে পায়চারি করেন। গ্রীষ্মকালে বড়সাহেব ও ছোটসাহেবদের মাথার উপর অবিরাম টানাপাখা চলতে থাকে। বাঙালী কেরানীদের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যাঁরা নিম্নশ্রেণীর কেরানী (আজকালকার lower division-এর মতো) তাঁরা নিচতলায় মাটিতে আসন পেতে বসে কাজ করতেন। পুরো 'বাবু' হয়ে বসতেন এবং কেউ হাঁটুর উপর, কেউ বা একটি বাক্সের উপর খাতা রেখে লেখার কাজ করতেন। বাংলা লিখতেন, ইংরেজিও লিখতেন। বেতন পেতেন মাসে ৪৲ টাকা থেকে ১০৲ টাকা। 'ইস্ট-ইণ্ডিয়ান' বা ফিরিঙ্গি কেরানীরা বেতন পেতেন মাসে ৬০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা, এবং উচ্চশ্রেণীর ('upper division'-এর মতো) বাঙালী কেরানীরা বেতন পেতেন মাসে ৮৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকা। এই বর্ণনাটুকু দিয়ে পর্যটক লিখেছেন :

"The native writers are a numerous class, and always form the majority in mercantile offices, their dress is made of white muslin, and is flowing and graceful; they are tasteful but very slow in writing..."

বাঙালী কেরানীদের "a numerous class" বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশী ও দেশী সদাগরী আফিসে, সরকারী ও বে-সরকারী আফিস মিলিয়ে বাঙালী কেরানীর সংখ্যা কলকাতা শহরে উনিশ শতকের চল্লিশের মধ্যে যে বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল তা বোঝা যায়। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খাঁটি

বাঙালীর মতো, সাদা ধুতি-চাদর-বেনিয়ান, এবং পূর্বোধৃত 'flowing' কথা থেকে বোঝা যায়, বাঙালী কেরানীবাবুরা ধুতি পরতেন বেশ লম্বা করে কোঁচা ঝুলিয়ে। নাগরিক মধ্যবিত্তের একটা বেশ বড় অংশ ছিলেন কলকাতার এই বাঙালী কেরানীবাবুরা।

কেরানীবাবুদের পাশাপাশি বাঙালী মধ্যবিত্তের (প্রধানত নাগরিক) আর একটি মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটি হল উমেদারীপটু 'সরকার-বাবু'র মূর্তি। এঁরা আফিসের 'সরকার' নন, বিদেশী পরিবারের 'সরকার', এবং 'সরকার' মানে দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপারের সর্বময় কর্তা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্যানি পার্কস তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন :[১৯]

> "A very useful but expensive person in an establishment is a Sircar ; the man attends every morning early to receive orders, he then proceeds to the bazaars, or to the Europe-shops, and brings back for inspection and approval, furniture, books, dresses, or, whatever may have been ordered : his profit is a heavy percentage on all he purchases for the family."

বাঙালী সরকারবাবুর বেতন মাসিক ১০৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকার বেশি নয়, কিন্তু আসল আয়, মনিবভেদে, তার দশ-বিশ গুণ বেশি। মনিব যদি কলকাতার 'native aristocracy'-র কেউ হন, তাহলে বেতন ও দস্তুরির 'রেট' দুই-ই কম হবার সম্ভাবনা। তবে সম্ভ্রান্ত বাঙালী হিন্দু পরিবারে দোল দুর্গোৎসব, পুজো-পার্বণ, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালাক্রমে চলতেই থাকে, কাজেই কেনা-কাটা ও খরচপত্রের বহর সেখানে অত্যন্ত বেশি। সরকারবাবুর দস্তুরির হার সেখানে অল্প হলেও তিনি তা পূরণ করে নেবার সুযোগও সেখানে পেতেন অনেক বেশি। বিদেশী মনিবদের কাছে এতরকমের সুযোগ পাওয়া যায় না, খরচপত্রের ব্যাপারেও তাঁরা অনেক বেশি নিয়মানুগত ও সংযত। সরকারের দস্তুরির হার সেখানে একটু বেশি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমতী ফ্যানি বলেছেন যে সরকারের দস্তুরি টাকায় দু'আনা। তাতেও নাকি সরকারবাবু রীতিমত "expensive person", যদিও "useful." সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল উমেদারী ও মোসাহেবীকে চারুকলার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যিনি তা পারেন তিনি কৃতী তো বটেই, মনিবের কাছেও অপরিহার্য

হয়ে ওঠেন। সরকার-চরিত্রের এই গুণটি পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্রের একটি বিশিষ্ট উপাদানে পরিণত হয়েছে।

এই হল ইংরেজিশিক্ষার প্রথম পর্বের চাকরিজীবী বাঙালী নাগরিক মধ্যবিত্তের ছবি। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (১৮১৭-৫৭) ইংরেজিশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। এই সময়ের মধ্যে হিন্দুকলেজ ছাড়াও ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী ইংরেজি ভাষা সরকার-অনুমোদিত আধুনিক শিক্ষার বাহন-রূপে গৃহীত হয়। তার ফলে ইংরেজির মর্যাদা বাড়ে, বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে, এবং ইংরেজিশিক্ষার আগ্রহও বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকে। গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও এই সময় কলকাতা শহরাভিমুখে যাত্রা করতে থাকে, কিছু ইংরেজিশিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার আশায়। চাকরির মধ্যে সরকারী চাকরি বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু হয়ে ওঠে। আজকের দিনেও এ-কামনার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। কলকাতা শহর ইংরেজ শাসকদের প্রধান প্রশাসনকেন্দ্র ছিল বলে সর্বপ্রকারের সরকারী আফিস শহরে স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে নানারকমের সাধারণ চাকরির সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। ইংরেজিশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যবিত্তরাই যেহেতু গোড়া থেকে অগ্রগামী হয়েছিলেন, এবং কলকাতা শহর বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, সেইজন্য শিক্ষিত বাঙালীরাই প্রধানত এই চাকরির ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-দেওয়া শিক্ষা প্রবর্তনের আগে শুধু এই সরকারী চাকরির ক্ষেত্র কলকাতা শহরে যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, এবং তার কাজকর্ম ও বেতনের যে কত বৈচিত্র্য ছিল, তার পরিচয় থেকে দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের নগরকেন্দ্রিক কর্মসুযোগের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে যতদূর সম্ভব এই পরিচয়টি আমরা তথ্যসহযোগে দেবার চেষ্টা করছি:[২০]

সেক্রেটারির আফিস, গবর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া (ফিনান্স) এসপ্লানেড রো

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট	বেতন (টাকা)
মোট ৩৬ জন	২০০।১৫০।১২০।১০০।৯০।৮০।৭০৲ টাকা
বাঙালী হিন্দু ২৬ জন	৬০।৫০।৪৫।৪০।৩৫।৩০।২৫।২২।২০৲ টাকা

সেক্রেটারিয়ে আফিস, গবর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া (ফিন্যান্স) এসপ্লানেড রো

কপিস্ট — বেতন

মোট ৩২ জন — ৬০।৫০।৪০।৩০।২০।১৬৲ টাকা

বাঙালী হিন্দু ২৬ জন

সেক্রেটারিয়ে আফিস, বৈদেশিক বিভাগ (ফার্সী)

সহকারী মুনশী — বেতন

মোট ৪ জন — ৬০।৫৫।৫০।৪০৲ টাকা

বাঙালী হিন্দু ১

ট্র্যানস্লেটার

১ জন—বাঙালী হিন্দু ১২৫৲ রী ১।৩০৲ নাগরী লেখক ১—ঐ ২০৲

তোষাখানা

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ১—বাঙালী হিন্দু ২০০৲ ডেপুটি ১—ঐ ১০০৲

সেক্রেটারিয়ে আফিস, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, গবর্নমেণ্ট প্রেস। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট

বিবিধ বিভাগ

মোট ৩ জন হিন্দু বাঙালী ২—ইনডেক্সার ২০০৲ অ্যাঃ রেকর্ড কীপার ৫০৲

সেকশান রাইটার

মোট ২৯ জন ভারতীয় ৯ বাঙালী হিন্দু ৯ বেতন উল্লেখ নেই

সেক্রেটারিয়ে আফিস, সামরিক বিভাগ
১৩ চৌরঙ্গী রোড

সাধারণ বিভাগ—আফিস

মোট ৪৫ জন ভারতীয় ১১ বাঙালী হিন্দু ১০ বেতন ৮০৲ থেকে ১০৲

কপি বিভাগ

মোট ২০ জন	ভারতীয় ৯	বাঙালী হিন্দু ৯	বেতন ১৩০৲ থেকে ৪৫৲
মোট ৬ জন	ভারতীয় ৫	বাঙালী হিন্দু ৫	বেতন ৪০৲
মোট ১০ জন	ভারতীয় ৪	বাঙালী হিন্দু ৪	বেতন ৩৫৲
মোট ১০ জন	ভারতীয় ২	বাঙালী হিন্দু ২	বেতন ৩০৲
মোট ৭ জন	ভারতীয় ৫	বাঙালী হিন্দু ৫	বেতন ২৫৲
মোট ১৩ জন	ভারতীয় ৬	বাঙালী হিন্দু ৬	বেতন ২০৲

সেক্রেটারির আফিস, পাবলিক ওআর্কস, ৪ চৌরঙ্গী রোড

অ্যাকাউন্ট ও অডিট

মোট ৩ জন	ভারতীয় ২	বাঙালী হিন্দু ২	বেতন ৫০৲ ও ৩০৲

ড্রয়িং

মোট ৪ জন	ভারতীয় ৩	বাঙালী হিন্দু ১	বেতন ৩০৲

কপিং

মোট ১০ জন	ভারতীয় ৭	বাঙালী হিন্দু ৫	বেতন ২০৲ থেকে ৪৫৲

পাবলিক ইনস্ট্রাকশান বিভাগ
৮ মিডলটন স্ট্রীট

বেতন ২৫০০৲ থেকে ২০০৲	মোট ৬ জন	ভারতীয় ১ (বাঙালী)

এই বাঙালী হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক, বেতন ২০০৲। উচ্চবেতনের কর্মচারী সকলে ইংরেজ।

আফিস

মোট ৫ জন	ভারতীয় ৪ (বাঙালী হিন্দু)	বেতন ১০০৲ থেকে ৫০ টাকা

বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট সেক্রেটারির আফিস, ৬—৯ স্ট্র্যাণ্ড

আফিস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট

প্রথম শ্রেণী ৬ জন	ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু)	৩০০৲
দ্বিতীয় শ্রেণী ৬ জন	ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু)	২০০৲
তৃতীয় শ্রেণী ১২ জন	ভারতীয় ৫ (বাঙালী হিন্দু)	১৫০৲
চতুর্থ শ্রেণী ১২ জন	ভারতীয় ৬ (বাঙালী হিন্দু)	১২০৲—১০০৲
পঞ্চম শ্রেণী ১২ জন	ভারতীয় ৫ (বাঙালী হিন্দু)	৫০৲

কপিস্ট

তৃতীয় শ্রেণী ১৮ জন	ভারতীয় ৮ (বাঙালী হিন্দু)	৪০৲
চতুর্থ শ্রেণী ২০ জন	ভারতীয় ১২ (বাঙালী হিন্দু)	৩৫৲
পঞ্চম শ্রেণী ২০ জন	ভারতীয় ১৩ (বাঙালী হিন্দু ১১)	৩০৲
ষষ্ঠ শ্রেণী ১০ জন	ভারতীয় ৭ (বাঙালী হিন্দু)	২৫৲
সপ্তম শ্রেণী ৯ জন	ভারতীয় ৯ (বাঙালী হিন্দু ৮)	২০৲
ড্রাফটস্‌ম্যান ২ জন	ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু)	৫০৲

সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত, আলিপুর

উকিল

রমাপ্রসাদ রায়, সিনিয়ার গবর্নমেণ্ট উকিল বেতন ৩০০৲

শম্ভুনাথ পণ্ডিত, জুনিয়ার গবর্নমেণ্ট উকিল বেতন ২৫০৲

এছাড়া বাঙালী হিন্দু উকিল ১৩ জনের নাম আছে।

আফিস (সাধারণ ১)

মোট ১৬ জন ভারতীয় ৫ (বাঙালী হিন্দু) ১০০৲ থেকে ৭৩৲

আফিস (সাধারণ ২)

মোট ৯ জন ভারতীয় ৯ বাঙালী হিন্দু ৭ ৪৫৲ থেকে ১০৲

ট্র্যানশ্লেটার

প্রসিডিংস : শ্যামচরণ সরকার ২৫০৲

সহকারী : রামগোপাল ঘোষ ১৫০৲

সহকারী : নারায়ণচন্দ্র মুখার্জী ১০০৲

ডেপুটি রেজিস্ট্রার : আনন্দচন্দ্র বসু ৫০০৲

সেরিস্তাদার : শ্যামাচরণ সেন ২০০৲

ডেপুটি ঐ : কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ৫০৲

ডেপুটি ঐ : আনন্দমোহন মজুমদার ৫০৲

ওড়িয়া দোভাষী : ৫০৲

ইন্‌স্পেক্‌টরের আফিস (জেলখানার)

তৃতীয় ক্লার্ক চ্যাটার্জী ৩৫৲

চতুর্থ ক্লার্ক রায় ৩০৲

সদর রেভিনিউ বোর্ড, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট

আফিস

মোট ২০ জন ভারতীয় ৬ (বাঙালী হিন্দু) ১৫০৲ থেকে ৪০৲

আমলা (সেরিস্তাদার, কারকুন, মহাফেজ, মুনশী, মুহরী প্রভৃতি)

মোট ৬ জন বাঙালী হিন্দু ৫ বেতন ১৫০৲ থেকে ৩০৲

কাস্টমস

মোট ১০ জন ভারতীয় ৬ (বাঙালী হিন্দু) ৯৫৲ থেকে ৪০৲

লবণ

মোট ৮ জন ভারতীয় ৬ (বাঙালী হিন্দু) ১০০৲ থেকে ৩৫৲

আফিস

মোট ৬ জন (বাঙালী হিন্দু) ১৫০৲ থেকে ৩৫৲

সাধারণ

মোট ৩ জন বাঙালী হিন্দু ২ ৫০৲ ও ৩৫৲

আমলা

মোট ৩ জন (বাঙালী হিন্দু) ১৫০৲, ৫৫৲, ৪০৲

ক্যাশ

ট্রেজারার বাঙালী হিন্দু : ৭৫৲

পোদ্দার ঐ : ১৫৲

কপিস্ট

মোট ২৭ জন ভারতীয় ২২ (বাঙালী হিন্দু) বেতন উল্লেখ নেই

স্ট্যাম্প ও স্টেশনারী আফিস, ২ চার্চ লেন

স্ট্যাম্প বিভাগ

বাঙালী হিন্দু ১ জন তহশীলদার : ২৬০৲

আরও ১৩ জন বাঙালী হিন্দু কর্মচারী আছেন, বেতন ৭৩৲।৫০৲।৪০৲।৩০৲।২৫৲ ২০৲

৩২ জন কাউন্টিং সরকার : ১৬৲।১৪৲।১২৲

স্টেশনারী বিভাগ

মোট ৭ জন বাঙালী হিন্দু ৫ ৬৫৲ থেকে ১৬৲

কেরানী ৬ জন প্রত্যেকে ১৬৲

কণ্ট্রোলার—নিমক চৌকি, কয়লাঘাট স্ট্রীট

বাঙালী হিন্দু সেরিস্তাদার ১০০৲

দ্বিতীয় সহকারী ৬০৲

সহকারী 'সুপার' ১৮০৲

অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল আফিস, গবর্নমেন্ট প্রেস

আফিস

মোট ৭ জন ভারতীয় ৩ (বাঙালী হিন্দু) ২৫০৲।২২০৲ ৮০৲

সামরিক বিভাগ

মোট ১৩ জন ভারতীয় ৪ (বাঙালী হিন্দু) ১৮৮৲।১১০৲।৮৫৲।৮০৲

ঋণ বিভাগ

মোট ১০ জন ভারতীয় ৫ (বাঙালী হিন্দু) ৪০০৲।৮০৲।৬০৲।৫৫৲।৫০৲

কেরানী ১৪ জন বেতন উল্লেখ নেই

সুদ বিভাগ

মোট ৭ জন ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু) ৮০৲

কেরানী ১৯ জন বেতন উল্লেখ নেই

রেমিট্যান্স ও পে বিভাগ

মোট ১৩ জন ভারতীয় ১২ (বাঙালী হিন্দু) ৬০৲ থেকে ১৬৲

অ্যাসাইনমেণ্ট ও বিল

মোট ৪ জন ভারতীয় ২ (বাঙালী হিন্দু) ৪৫৲ ও ২০৲

ইনএফিসিয়েণ্ট ব্যালান্স বিভাগ

মোট ৪ জন ভারতীয় ৩ (বাঙালী হিন্দু) ৪০৲।৩৫৲।৩০৲

বিবিধ

কপিস্ট মোট ১৫ জন বাঙালী হিন্দু ১৩ ২৫৲ থেকে ১৫৲

অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট, ট্রেজারি বিল্ডিং ও ২ লার্কিন্স লেন

অ্যাডজাস্টমেণ্ট বিভাগ

মোট ১৯ জন বাঙালী হিন্দু ১৯ ২০০৲।১০০৲।৭০ থেকে ২০৲

রেমিট্যান্স বিভাগ

মোট ৪ জন বাঙালী হিন্দু ৪ ৩:৲ থেকে ২০৲

মাসিক রেজিস্টার বিভাগ

মোট ২ জন বাঙালী হিন্দু ২ ৪৫৲, ৩৫৲

ট্রেজারি অ্যাকাউণ্টেণ্ট

মোট ১১ জন বাঙালী হিন্দু ১১ ২৫০৲, ৮০৲ থেকে ৪০৲

জুনিয়ার একসামিনার, ট্রেজারি অ্যাকাউণ্টস

মোট ৫ জন বাঙালী হিন্দু ৫ ২৫৲ থেকে ২০৲

রেমিট্যান্স চেকার

মোট ৪ জন বাঙালী হিন্দু ৪ ২৫৲

রেভিনিউ অ্যাণ্ড জুডিসিয়াল ডিপোজিট্স

মোট ১৩ জন বাঙালী হিন্দু ১২ ৩০৲ থেকে ২০৲

অ্যাবস্ট্রাকটার ১ বাঙালী হিন্দু ৩০৲

ল্যাণ্ড রেভিনিউ

১১ জন বাঙালী হিন্দু ১৩০৲।১০০৲।৮০৲ থেকে ২৭৲

স্টেটমেণ্টস্

মোট ৯ জন বাঙালী হিন্দু ৮ ৮২৲ থেকে ২০৲

নিমক ও আফিম বিভাগ

মোট ২৬ জন ভারতীয় ২৪ (বাঙালী হিন্দু) ১৮০৲।৭০৲ থেকে ১৫৲

রেকর্ড কীপার

মোট ৪ জন বাঙালী হিন্দু ৪ ৪৬৲ থেকে ১০৲

লেটার রিসিভার

মোট ২ জন বাঙালী হিন্দু ২ ২৫৲।১৫৲

ডেসপ্যাচার ১, বাঙালী হিন্দু ১৭৲

মুনশী ২, বাঙালী হিন্দু ২০৲, ১০৲

ফার্সী দফ্‌তর ২, বাঙালী হিন্দু ২ ৩৫৲

নৌ বিভাগ

মোট ১১ জন বাঙালী হিন্দু ১০ ১০০৲।৫০৲ থেকে ১৬৲

সিবিল অডিটারের আফিস, এসপ্লানেড রো

আফিস

মোট ৭ জন ভারতীয় ২ (বাঙালী হিন্দু) ৩৫০৲, ১৩৬৲

জেনারল ট্রেজারি, ২ গবর্নমেণ্ট প্লেস

আফিস

মোট ১৫ জন ভারতীয় ২ (বাঙালী হিন্দু) ১০০৲, ৬০৲

ক্যাশ

মোট ৩ জন বাঙালী হিন্দু ৩ খাজাঞ্চি ৬০০৲, ডেপুটি ২০০, সহকারী ?

সিবিল পে-আফিস

মোট ৫ জন ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু) ৫০৲

গবর্নমেণ্ট এজেনিস, ১ গবর্নমেণ্ট প্লেস

আফিস

মোট ৫ জন ভারতীয় ২ (বাঙালী হিন্দু) ২০০৲, ৯৫৲

গবর্নমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক, ১ গবর্নমেণ্ট প্লেস

বাঙালী হিন্দু অ্যাক্‌চুয়ারি ৩৫০৲, ডেপুটি ২০০৲,
অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ৭০৲, সহকারী ৩ (৬০৲, ৬০৲, ৫০৲)

কলেক্টর অফ ক্যালকাটা, ২ চার্চ লেন

ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ক্যানাল টোল্

মোট ৩ জন বাঙালী হিন্দু ২ ৬০৲।৪০৲

স্ট্যাম্প

মোট ১ জন, বাঙালী হিন্দু ২০০৲

লাইসেন্স ও ডিস্টিলারি

মোট ৭ জন ভারতীয় ৪ (বাঙালী হিন্দু) ৮০৲ থেকে ৫০৲

আউটডোর ডিস্টিলারি

মোট ৩ জন ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু) ২৪৲

ক্যানাল টোল্ চৌকি

মোট ৪ জন বাঙালী হিন্দু ৪ ১০০৲।৭৫৲।৫৫৲।৪৫৲

কাস্টম হাউস, ট্যাঙ্ক স্কয়ার

অ্যাসিস্ট্যান্ট কলেক্টর

মোট ৬ জন ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু) ?

কলেকটর্স বিভাগ

মোট ৬ জন ভারতীয় ৩ (বাঙালী হিন্দু) ২৫৲।২৫৲।১২৲

ক্যাশ

কীপার ২০০৲, ডেপুটি ৫০৲—দুজনেই বাঙালী হিন্দু।

আমদানি বিভাগ

মোট ১১ জন ভারতীয় ৭ (বাঙালী হিন্দু) ১০০৲।৮৫৲।৪৫৲ থেকে ২০৲

ক্যালকুলেটারস ডিঃ

২১ জন বাঙালী হিন্দু ৪০৲ থেকে ১২৲

অ্যাকাউণ্ট ইত্যাদি

মোট ১৩ জন ভারতীয় ৯ (বাঙালী হিন্দু) ১০০৲।৬০৲ থেকে ৩০৲

১১ জন বাঙালী হিন্দু কেরানী বেতন উল্লেখ নেই

হোয়াফ

মোট ১৪ জন ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু) ৮০৲

কাস্টম্স প্রিভেন্টিভ সার্ভিস

কেরানী ভারতীয় ৩ জন (বাঙালী হিন্দু)। ৪০৲।৩০৲।২৫৲

উচ্চবেতনের চাকরিগুলি বিদেশীদের জন্য।

পোস্ট আফিস, ১০ হেয়ার স্ট্রীট

আফিস

মোট ৩ জন ভারতীয় ৩ (বাঙালী হিন্দু ৬০৲।৪০৲।৪০৲

ইন্‌স্পেকটিং পোস্টমাস্টারস আফিস

মোট ৬ জন ভারতীয় ৪ (বাঙালী হিন্দু) ২০০৲, ৭৫৲, ২০৲, ১০৲

অ্যাকাউন্ট্‌স
মোট ৪ জন বাঙালী হিন্দু ৪ ২০০৲।৪০৲।৩০৲।৩০৲

ডেপুটি পোস্টমাস্টার
মোট ৯ জন ভারতীয় ৭ (বাঙালী হিন্দু) ১৫০৲।৭৫৲।৫০৲।৩০৲।১৫৲

পাটনার ডেপুটি পোস্টমাস্টার ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, বেতন ১৫০৲

ক্যালকাটা পোস্ট আফিস, ১০ হেয়ার স্ট্রীট

আফিস
মোট ৫ জন ভারতীয় ২ (বাঙালী হিন্দু) ৪৫৲।৩০৲

ডাক বেয়ারা বিভাগ
মোট ১ জন, বাঙালী হিন্দু ৫৲

অ্যাকাউন্টস
মোট ৭ জন বাঙালী হিন্দু ৭ ৮০৲।৪০৲।২৫৲ থেকে ১০৲

বাঙ্গি বিভাগ
মোট ১০ জন ভারতীয় ৭ (বাঙালী হিন্দু) ৩০৲ থেকে ১০৲

শিপিং স্টীম
মোট ১০ জন ভারতীয় ৫ (বাঙালী হিন্দু) ৩০৲ থেকে ১০৲

ডেড্‌ লেটার
মোট ৩ জন ভারতীয় ১ (বাঙালী হিন্দু) ১৫৲

ইনল্যাণ্ড মেইল
মোট ১০ ভারতীয় ৫ বাঙালী হিন্দু ৪ ৩০৲ থেকে ২০৲

লেটার মেইল ডেসপ্যাচ
মোট ৮ জন ভারতীয় ৫ (বাঙালী হিন্দু) ২৫৲

বুলক (বলদ)—ট্রেন বিভাগ
২ জন বাঙালী হিন্দু বেতন ?

রেলওয়ে
মোট ১০ জন ভারতীয় ২ (বাঙালী হিন্দু) বেতন ?

সার্ভেয়র জেনারেল্‌স আফিস, ৩৫ পার্ক স্ট্রীট

ড্রয়িং বিভাগ
সকলে মুসলমান ৬০৲ থেকে ৫০৲

ড্রাফ্‌টস্‌মেন
সকলে মুসলমান বেতন ?
পরে ৪ জন বাঙালী হিন্দুর নাম আছে

কম্‌পিউটিং বিভাগ

মোট ৫ জন বাঙালী হিন্দু ৫ বেতন ৪০০৲।১২৫৲।৭০৲।৬০৲।৫৫৲

চীফ কম্‌পিউটার : রাধানাথ শিকদার : ৪০০৲

অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্‌পিউটার : শ্রীনাথ শিকদার : ১২০৲

আরও ২ জন অ্যাঃ কম্‌পিউটার বাঙালী হিন্দু আছেন, বেতন উল্লেখ নেই।

হেড রাইটার ১, বাঙালী হিন্দু ৪০৲

অবজারভেটারি

সুপারিন্‌টেণ্ড্যাণ্ট : রাধানাথ শিকদার : ২০০৲

মেটারোলজিকাল কম্‌পিউটার : গোপীনাথ সেন : ৬০৲

অবজারভার ৫ জন বাঙালী হিন্দু : ৩০৲ থেকে ২০৲

রাধানাথ শিকদার 'চীফ কম্‌পিউটার' ও 'অবজারভেটারির সুপারিনটেণ্ড্যাণ্ট' দু'টি পদেই নিযুক্ত ছিলেন, বেতন যথাক্রমে ৪০০৲ ও ২০০৲, মোট ৬০০৲

রেভিনিউ সার্ভেয়র জেনারল্‌স আফিস, ৩৫ পার্ক স্ট্রীট

সাধারণ

মোট ৮ জন ভারতীয় ৪ (বাঙালী হিন্দু) ৪০৲।২৫৲।২০৲।২০৲

ড্রয়িং

মোট ৬ জন ভারতীয় ৪ বাঙালী হিন্দু ১ ১০০৲

১৮৫৬ সালে সরকারী চাকরির (Government Services) এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কলকাতা শহর ছিল সরকারী কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র এবং স্বল্পশিক্ষিত থেকে সুশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের (হিন্দু) আধিপত্য ছিল সর্বাধিক এই সরকারী কর্মক্ষেত্রে। বাঙালী মধ্যবিত্তের এই আধিপত্য অকারণে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আঠার শতকের শেষ পর্ব থেকে ইংরেজিশিক্ষার যাবতীয় সুযোগ বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তরা গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত তার সুযোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শিক্ষার গণ্ডিকেও প্রসারিত করেছেন। বাঙালী মুসলমানরা এ-সুযোগ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক কারণে গ্রহণ করেন নি। তাই দেখা যায়, অধিকাংশ সরকারী চাকরিতে বাঙালী হিন্দুরই আধিপত্য। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এই আধিপত্য সরকারী চাকরির নিম্নস্তরেই বেশি, বাঙালী হিন্দুর

সংখ্যা সেখানে প্রায় শতকরা ৯০ জন, এবং বেতন গড়ে ৬০৲ টাকা থেকে ২৫৲-৩০৲ টাকা। ১০৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকার কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। মধ্যস্তরের সংখ্যা (১০০-১৫০৲ টাকা বেতনের) তেমন বেশি নয়, উচ্চস্তরের সংখ্যা (২০০৲-৪০০-৫০০৲) খুবই অল্প। সংখ্যার দিক থেকে নিম্নস্তরের চাকরির সংখ্যা স্বভাবতঃই অনেক বেশি—কেরানী, কপিস্ট প্রভৃতি—এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর (নাগরিক) কলেবর-বৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত এই নিম্নস্তরের চাকরি সম্বল করে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, সামাজিক পরিবেশের অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের চাকরি-জীবনের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যা ও সংকটের মূল কারণও এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সন্ধান করতে হয়। আমরা জানি পরাধীন দেশে স্বাধীন শিল্পোন্নয়ন পদে-পদে ব্যাহত হয় বলে, urbanisation-এর সঙ্গে কেবল 'services' বা চাকরির ক্ষেত্রটিই প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু এই প্রসার সীমাহীন হতে পারে না। যে-হারে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ে, সেই হারে চাকরি বাড়ে না। একসময় সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সমস্যা উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বেই দেখা দিয়েছিল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা পুনরায় এবিষয়টিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাব।

ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী

আঠার শতকে ইংরেজের সংস্পর্শে আসার পর থেকে বাঙালীরা নানারকম কাজকর্মের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার তাগিদ বোধ করতে থাকেন। কিন্তু তখন ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না কলকাতা শহরে। কাজেই তৎকালের বাঙালী বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি দেওয়ান সরকার মুন্শী বাবুরা সাহেবদের মুখ থেকে শুনে কিছু কিছু ইংরেজি বাক্য ও শব্দ মনে রাখতেন এবং যথাকালে সেগুলি ব্যবহার করে নিজেদের কাজ চালিয়ে নিতেন। সামান্য শব্দের স্টক শূন্য হয়ে গেলে তাঁরা মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করে হাবভাবে বক্তব্যবিষয়টি কোনরকমে সাহেবদের বুঝিয়ে দিতেন:[২১]

"What they could not express by words was indicated by signs; and thus many a native contrived by supplementing the inadequacy of his expression with the gesticulations of his body, to make himself intelligible to his European master with no ampler philological resources than the scanty stock of four words 'yes' 'no' 'very well'."

এই চারটি ইংরেজি শব্দ 'yes' 'no' 'very well'-এর জোরে সেকালের বাঙালী বাবুরা ইংরেজদের সাহায্যে অনায়াসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় 'সুপ্রীম কোর্ট' স্থাপিত হবার পর সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু স্কুল বলে তখনও বিশেষ কিছু ছিল না। উৎসাহী বাঙালীরা নিজেরা সামান্য কিছু ইংরেজি শিখে অন্যদের শিক্ষা দিতেন। দু'চার জন ফিরিঙ্গি বাড়িতে ছাত্র নিয়ে শিক্ষা দিতেন এবং প্রয়োজন হলে বড়লোক বাবুদের বাড়িতে গিয়েও পড়িয়ে আসতেন।[২২] ইংরেজি শব্দ নোটবুকে লিখে যাঁরা অন্যদের শিক্ষা দিতেন এবং মাসিক ৪৲ টাকা থেকে ১৬৲ টাকা পর্যন্ত বেতন নিতেন, তাঁদের মধ্যে রামরাম মিশ্র, রামনারায়ণ মিশ্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভবানী দত্ত, ও আরও দু-চারজনকে কেউ কেউ "celebrated as complete English scholars" বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩] ফিরিঙ্গিদের মধ্যে শেরবোর্ন একটি ইংরেজি শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন জোড়াসাঁকোয়। এই স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষালাভ করেছিলেন। মার্টিন বৌলের (Martin Bowl) স্কুল ছিল আমড়াতলায়, শীল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এখানে শিক্ষা পান। আরাতুন পিত্রুসের (Aratoon Petroos) স্কুলে ৫০।৬০ জন বাঙালী ছেলে ইংরেজি শিখত। "The best of the pupils became teachers in turn—like the blind Nittyanand Sen in Colootola, and lame Udytchurn Sen, who was the tutor of the millionaire Mulliks."

ইংরেজিশিক্ষার আদিপর্বেই নবযুগের একটি নতুন সামাজিক লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিত্ত (money) ও বিদ্যা (learning) কুলবৃত্তিগত বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিনের ভাষায় বলা যায়:[২৪]

"Commerce and knowledge had emancipated themselves : no longer should there be any superior authority, human or otherwise, to keep them in leading strings. Men felt that they had at last attained their majority in matters economic, political and intellectual."

বাণিজ্য ও বিদ্যা সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রথার সমস্ত বন্ধন থেকে যেন মুক্ত হয়েছে মনে হয়। শাস্ত্র বা শাসন কারও নিষেধাজ্ঞা এই দুই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বহুকাল পরে মানুষ আর্থনীতিক রাজনীতিক ও মানসিক বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে সাবালক হয়েছে। তাই সুপ্রিমকোর্টের ইংরেজ অ্যাটর্নিদের বাঙালী কেরানী যাঁরা বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজিশিক্ষক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কনৌজ ব্রাহ্মণ থেকে কায়স্থ বণিক নাপিত সকল জাতির লোককেই দেখা যায়। বৈদ্যসন্তান হয়েও অন্ধ নিত্যানন্দ সেন এবং খোঁড়া উদিতচরণ সেন স্কুল খুলে ইংরেজিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উদিতচরণ ছিলেন লক্ষপতি মল্লিকদের শিক্ষক। বাংলাদেশে বিত্তের তুলনায় বিদ্যা, বিশেষ করে ইংরেজি-বিদ্যা যে কুলবৃত্তিগত বন্ধন বেশি পরিমাণে শিথিল করে সামাজিক মর্যাদা লাভের নতুন পথ খুলে দেবে, ইংরেজিশিক্ষার প্রারম্ভেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে প্রকৃত ইংরেজিশিক্ষার সূচনা হয় বাংলাদেশে ১৮১৭ সালে কলকাতায় 'হিন্দুকলেজ' স্থাপিত হবার পর। আলেকজাণ্ডার ডাফ.বলেছেন, "it was the very first English seminary in Bengal, or even in India, as far as I know."[২৬] ব্রিটিশ আমলে নবযুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর (Bengali intelligentsia) প্রথম ও প্রধান উৎপত্তিস্থল হিন্দু কলেজ। উনিশ শতকের তিরিশ থেকে পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের বুদ্ধি ও চিন্তার পথ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে দেয়। লালবিহারী দে লিখেছেন :[২৭] "The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkeley, of Hume,

of Reid, and of Dugald Stewart. A thorough revolution took place in their ideas··· they began to reason, to question, to doubt." বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ মনীষী ও চিন্তানায়কদের রচনা পাঠ করে হিন্দুকলেজের ছাত্ররা এক নতুন জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পান। তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। কোন বিষয় তাঁরা আর অন্ধবিশ্বাসে মেনে নিতে পারেন না, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে তাঁরা সব বিচার-বিশ্লেষণ করতে চান। সংশয় ও প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগতে থাকে। ১৮৩০ সালে বিখ্যাত মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে হিন্দুকলেজ "had begun to put forth some of its ripest fruits"—এবং হিন্দুকলেজের ছাত্ররা "had learnt to think and to discuss all subjects with unshackled freedom."[২৮] ১৮৩০ সালে হিন্দুকলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩৬, এবং ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে, ১৩ বছরে, অন্তত ১০০০/১২০০ ছাত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে ধরা যেতে পারে। ডাফসাহেব এই অবস্থা দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেন অন্য কারণে। প্রথাবদ্ধ ও সনাতন শাস্ত্র-শৃঙ্খলিত বুদ্ধির দাসত্ব থেকে এদেশে ইংরেজিশিক্ষিত তরুণরা মুক্তি পাচ্ছে দেখে তিনি যতটা না আনন্দিত হয়েছিলেন, তারচেয়ে বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন এই তরুণদের কাছে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রশস্ত সুযোগ দেখে। তার কারণ হিন্দুকলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে তিনি বলেছেন "The very *beau-ideal* of a system of *education without religion*"[২৯]

রবার্ট মিচেলসের (Roberto Michels) ভাষায় বলা যায় যে "it would be wrong to define intellectuals in terms of academic examinations"[৩০]—এবং বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইমের ভাষায় বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় এইভাবে[৩১]—"In every society there are social groups whose special task it is to provide an interpretation of the world for that society. We call these the 'intelligentsia'." প্রত্যেক সমাজে এমন কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত কিছু লোক থাকেন যাঁদের কাজ হল সেই সমাজের মানুষের কাছে বাইরের জগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা। যাঁরা সমাজের এই

জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করেন, তাঁদেরই আমরা 'বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী' বলতে পারি। যাঁরা অনেক পরীক্ষায় পাস করেছেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেয়েছেন, তাঁরা কেবল ডিগ্রীর জোরে 'intellectual' বলে গণ্য হতে পারেন না। মিচেলস্ বলেছেন, তাঁদের 'priestly qualities' ও 'priestly functions' থাকা দরকার। এই পুরোহিতের গুণ ও কর্তব্য কি? প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতের কাজ ছিল সমাজের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা। তেমনই আধুনিক বিদ্বৎসমাজের কর্তব্য হল আধুনিক মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা। এদিক থেকে বিচার করলে হিন্দুকলেজের ইংরেজিশিক্ষিত তরুণদের একাংশকে আধুনিক বাংলার, তথা আধুনিক ভারতের, প্রথম বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী (intelligentsia) বলে অভিহিত করা যায়। কারণ ধর্মচিন্তা, সমাজচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে এই ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী তরুণরাই সর্বপ্রথম নতুন একটি বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এঁদের কারও কিন্তু তখন পরবর্তী-কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিশিক্ষিতদের মতো ডিগ্রী ছিল না, অথচ অনেকেই আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যায় রীতিমত সুশিক্ষিত ছিলেন এবং প্রকৃত intellectual-এর priestly qualities ও priestly functions সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতনও ছিলেন। অন্তত ইয়ং-বেঙ্গল বা ডিরোজীয়ানদের এই চেতনা যে অত্যন্ত প্রখর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক-মেকলের উদ্‌যোগে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সরকারীনীতি হিসেবে গৃহীত হবার আগেই দেখা যায়, বাংলাদেশে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশ হয়েছিল। গড়ে বছরে ২০০ করে ছাত্র ধরলেও আঠার বছরে ৩৬০০, ডাফ সাহেবের স্কুল ও অন্যান্য ইংরেজিশিক্ষার স্কুল ধরলে সব মিলিয়ে ৪০০০-৫০০০ হবে। তাছাড়া এঁদের ভিতর থেকে আধুনিক intelligentsia-র অন্তত একটি স্তরেরও (stratum) বিকাশ হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের এই স্তরটি তখন অবশ্য খুবই সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু সামাজিক কর্তব্যকর্মে সক্রিয়তা ও উদ্দীপনার দিক থেকে বিচার করলে এই স্তরটির ঐতিহাসিক দান অসামান্য।

মিচেল্‌স বুদ্ধিজীবীদের 'priestly functions'-এর সঙ্গে 'political activity' কথাটিও যোগ করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি যেসমস্ত

সামাজিক কর্মে প্রয়োগ করবেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক কর্ম একটি। উনিশ শতকে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম রাজনৈতিক কর্ম ছিল দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উদ্‌বোধন। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের জাগরণে ও প্রসারণে ইংরাজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সকলের পুরোভাগে ছিলেন। "The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawur to Chittagong..."[৩২] হেনরি কটনের এই উক্তির মধ্যে পরিষ্কার তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সমাজসংস্কারকর্মেও অগ্রণী হয়েছিলেন বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা। সমাজের জাতিবর্ণভেদ-ব্যবস্থার বিরোধিতা সম্বন্ধে রেভারেণ্ড শেরিং বলেছেন যে ভারতের ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণীই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষিত বাঙালীরাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী কর্মী। "Bengalees occupy the van in this movement. To their honour, be it said, they have long been the leaders of public opinion in India. It is they who first formed it; it is they who chiefly sustain it. In them we perceive an amount of active patriotism and genuine earnestness not met with in any other Indian nationality..."[৩৩] এই দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করার কারণ হল, সমাজবিজ্ঞানীদের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সামাজিক ভূমিকা ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীরা উনিশ শতকে যথেষ্ট উদ্‌যোগী হয়েই গ্রহণ করেছিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথমদিকে কোন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। টোল-চতুষ্পাঠী-মাদ্রাসা নিয়ে এদেশের পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আঠার শতকে কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক টোল-চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকেও অনেকদিন পর্যন্ত এগুলি লোপ পায়নি। উইলিয়ম অ্যাডামের দেশীয় শিক্ষাসংক্রান্ত বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৩৫।১৮৩৮) তার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮১৩ সালের অ্যাক্টে প্রথম ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ

টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ১৮৩৩ সালের অ্যাক্টে এই ব্যয় বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা হয়। এই টাকা কি ধরনের শিক্ষার জন্য খরচ করা হবে—অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা, না পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা—তাই নিয়ে দেশী-বিদেশী বিদ্যোৎসাহীদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়। এই বাদানুবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় ১৮৩৫ সালে, বেন্টিঙ্ক-মেকলের ইংরেজিশিক্ষার আদর্শ সরকারী নীতি হিসেবে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার পর।[৩৪]

বাংলাদেশে শিক্ষার ইতিহাসে এই সময় আরও একটি ঘটনা ঘটে। বেন্টিঙ্ক ও মেকলে ছাড়াও আরও একজন শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—তিনি উইলিয়াম অ্যাডাম (William Adam)। তদানীন্তন বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অ্যাডাম সরজমিনে তদন্ত করেন, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য। এই তদন্তের গুরুদায়িত্ব বেন্টিঙ্কই তাঁর উপর অর্পণ করেন (Minute, dated the the 20th January 1835), তাঁর ইংরেজিশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতি গ্রহণের মাত্র দু'মাস আগে। অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্ট দাখিল করেন ১জুলাই ১৮৩৫, দ্বিতীয় রিপোর্ট ২৩ ডিসেম্বর১৮৩৫ এবং তৃতীয় রিপোর্ট ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। এদেশের হিন্দু-মুসলমানের দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এরকম প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট পরবর্তীকালে আর প্রকাশিত হয়নি। দেশীয় শিক্ষার প্রতি, বিশেষ করে মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষার প্রতি অ্যাডামের অনুরাগ নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য এবং যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি দেশীয় শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু অ্যাডাম এদেশের টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও মক্তব-মাদ্রাসার মৌলবীদের সামাজিক দৃষ্টি ও মানসতা সম্বন্ধে যে উচ্চাশা পোষণ করতেন, অথবা সেকালের এই শিক্ষিতশ্রেণীর আধুনিক কালোপযোগী জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি জাতীয়শিক্ষার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তা অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। প্রিন্সেপ-উইলসনের মতো ইংরেজপণ্ডিতরা প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তি অবতারণা করেছিলেন অ্যাডামের যুক্তি প্রায় তারই প্রতিধ্বনি বললে ভুল হয় না। অ্যাডাম লিখেছেন:[৩৫]

"There is no class of persons that exercises a greater degree of influence in giving native society the tone, the form and the

character which it actually possesses than the body of the learned, not merely as the professors of learning, but as the priests of religion; and it is essential to the success of any means employed to aid the moral and intellectual advancement of the people that they should not only co-operate but also participate in the progress."

এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা যদি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ না রাখেন, অথবা রাখতে তাঁদের উৎসাহিত না করা যায়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হবে, এই ছিল অ্যাডামের ধারণা। কিন্তু এ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি তাঁর সুদীর্ঘ রিপোর্টে রচিত হয়নি। মুসলমানদের সম্বন্ধে অ্যাডাম বলেছিলেন :[৩৬]

"Learned Musalmans are in general much better prepared for reception of European ideas than learned Hindus."

অ্যাডামের এই বিস্ময়কর উক্তি যে অনেকাংশে ভ্রান্ত তা আমাদের দেশে মুসলমানদের আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার ইতিহাস থেকে বোঝা যায়। সবার উপরে লক্ষণীয় হল. অ্যাডাম সাহেব মেকলের মতোই বিখ্যাত 'filtration theory'-র সমর্থক ছিলেন। তিনি রিপোর্টে লিখেছিলেন :[৩৭]

"Instead of beginning with schools for lower grades of native society, a system of Government institutions may be advocated, that shall provide, in the first place, for the higher classes on the principle that the tendency of knowledge is to descend, not to ascend···."

জ্ঞানবিদ্যা সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে আরোহণ করে না, উচ্চ থেকে নিম্নস্তরে অবরোহণ করে, কতকটা জলের ধারার মতো, এই ছিল ইংরেজিশিক্ষার প্রবক্তা মেকলের মতো জাতীয়শিক্ষার প্রবক্তা অ্যাডামেরও ধারণা। এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান থেকে অ্যাডাম এই উচ্চ থেকে নিম্নগামী শিক্ষাপ্রবাহের নীতির উপর কি কারণে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা বাস্তবিকই বোঝা যায় না। মেকলে করতে পারেন, কারণ ইরেজিশিক্ষার আভিজাত্যবোধ থেকে তাঁর শিক্ষাপ্রবাহনীতি উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু অ্যাডামের কোথা থেকে হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল তা জানা যায় না।

মেকলে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিটে' (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫) একটি প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিয়েছেন, এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রত্যকটি যুক্তি খণ্ডন করে। প্রশ্নটি এই—"The whole question seems to me to be—which language is the best worth knowing?" উত্তরে তিনি বলেছেন, ইংরেজি ভাষা। তার কারণ, ইংরেজি ভাষায় যে জ্ঞানসম্পদ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সম্পদের চেয়ে তা অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, ইংরেজি ভাষা ভারতের শাসকশ্রেণীর ভাষা, উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের ভাষা এবং বাণিজ্যের অন্যতম ভাষা :

"Nor is this all. In India, English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives at the seats of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East···Whether we look at the intrinsic value of our literature, or at the particular situation of this country, we shall see the strongest reason to think that, of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjects."

মেকলের এই 'মিনিটে'র শেষে বেন্টিঙ্ক মন্তব্য করেন—"I give my entire concurrence to the sentiments expressed in this 'Minute'", এবং পরবর্তী প্রস্তাবে (৭ মার্চ ১৮৩৫) ইংরেজিশিক্ষার সমর্থনে বলেন :[৩৮]

"His lordship in Council is of opinion that the object of the British Government ought to be the promotion of European literture and science among the natives of India; and that *all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.*" (*Emphasis* added)

ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ১৮১৭ সালে হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৩৫ সালের মধ্যে তার আকার খুব বড় না হলেও, একেবারে নগণ্য ছিল না। ধনিক ও মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের সন্তানরা প্রধানত হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতেন। মেকলে তাঁর 'মিনিটে' যে ইংরেজিশিক্ষিত "higher class of natives at

the seats of Government" সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তা প্রধানত বাংলাদেশে কলকাতা শহরের হিন্দুকলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করে। প্রথমদিকে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীরা ছিলেন উচ্চ-মধ্যশ্রেণীভুক্ত (upper middle-class)। তাই থাকাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে কোন শিক্ষাই লাভ করা তখন সম্ভব ছিল না, হিন্দুকলেজের শিক্ষা তো নয়ই। মেকলে বলেছিলেন যে তাঁর শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হল এমন একটি ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তোলা—"who may be interepreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect." মেকলের স্বপ্ন ছিল, ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী বিদেশী শাসক ও এদেশী শাসিতদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন, অর্থাৎ সেকালের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতো একালের ইংরেজি পণ্ডিতরা ব্রিটিশ শাসকদের শাসনশাস্ত্রের টীকাকার হবেন দেশের সাধারণ মানুষের কাছে। চামড়ার রং ও দেহের রক্তের দিক থেকে তাঁরা যদিও পুরোপুরি ভারতীয় থাকবেন, তাহলেও রুচি মতামত নীতিবোধ ও মনীষার দিক থেকে তাঁরা হবেন খাঁটি ইংরেজ। এরিক স্টোকস (Eric Stokes) এই শিক্ষানীতি সম্বন্ধে লিখেছেন যে—"Substantially it represents the permanent Liberal attitude to India which survived intact to the end of British rule" এবং মেকলে ছিলেন এই উদারপন্থীদের সুযোগ্য প্রতিনিধি, বেনথাম্-মিলের প্রকৃত শিষ্য—"The most eloquent expression of this English liberalism is to be found in Macaulay."[৩৯]

মেকলের নিকট-আত্মীয় চার্লস ট্রেভেলিয়ন খুব চমৎকার ভাষায় এই শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই দুটি দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব এত বেশি যে ভারতের উপর ইংলণ্ডের শাসনকর্তৃত্ব কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ভবিষ্যতে একদিন ভারতবাসীরা স্বাধীনতা দাবি করবে এবং তা অর্জনও করবে। এই স্বাধীনতা লাভের দুটি পথ খোলা থাকবে—একটি বিপ্লবের (revolution) পথ, আর একটি সংস্কারের (reform) পথ। দ্বিতীয় পথটি ইংরেজ শাসকদের কাম্য হওয়া উচিত। তার জন্য যদি ভারতীয়দের ইংরেজিশিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে—"The educated

classes, knowing that the elevation of their country on these principles can only be worked out under our protection, will naturally cling to us···" দেশের এই উন্নতি নির্ভর করবে "in acquiring and diffusing European knowledge" এবং "in naturalising European institutions."[৪০] ইউরোপীয় জ্ঞানবিছার প্রসারণে এবং ইউরোপীয় ইনস্টিটিউশনের জাতীয়করণে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও অগ্রণী হবেন স্বভাবতঃই ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিও সহজে বীতশ্রদ্ধ হবেন না। মেকলে তাঁর পিতাকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন (১২ অক্টোবর ১৮৩৬) যে ইংরেজিশিক্ষা প্রবর্তিত হলে পরবর্তী তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে একজনও পৌত্তলিক খুঁজে পাওয়া যাবে না ("there would not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence···")[৪১] বাংলার সামাজিক জীবনের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাঙালী বিদ্বৎসমাজ সম্বন্ধে মেকলের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তব সত্যে পরিণত হয়নি (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পৌত্তলিকতা তো দূরের কথা, নানারকমের সামাজিক কুসংস্কার আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীরা শেষ পর্যন্ত কতদূর বর্জন করতে পেরেছিলেন, এবং আজও পেরেছেন, তাও ভাববার বিষয়। মেকলের আর-একটি বিখ্যাত উক্তিও অনেকটা মিথ্যা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ভারতের ইংরেজিশিক্ষিতরা এমন এক শ্রেণীতে পরিণত হবেন, যাঁরা দেখতে ভারতীয় হলেও, নীতি-রুচি-মতামত ও মনীষার দিক থেকে হবেন খাঁটি ইংরেজ। বাংলাদেশে ইরেজিশিক্ষার প্রথম তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই সাহেবিয়ানার নকলনবিশ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করে কিছু উপভোগ্য ব্যঙ্গসাহিত্য বাংলায় রচিত হয়েছে। কিন্তু রুচি নীতি মতামত ও মনীষার দিক থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খুব বেশি শিক্ষিত বাঙালী 'ইংরেজ-সদৃশ' হতে পারেন নি। শুধু মনোভাবের দিক থেকে তাঁরা খানিকটা পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হয়েছিলেন।

মেকলে "higher class of natives"-এর কথা মনে করে ইংরেজিশিক্ষার পক্ষে আবেগপূর্ণ ওকালতি করেছিলেন এবং এই শিক্ষার ধারা উচ্চ থেকে নিম্নগামী হবে বলে আশা করেছিলেন। তাঁর এই আশাও শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক

হয়নি। ইংরেজিশিক্ষার ধারা উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকেও উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়নি, দেশের সাধারণ জনসমাজ আজও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজিশিক্ষা তাদের কাছে কল্পনাবিলাস মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সমাজে বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীকে প্রধানত তিনটি মানদণ্ডের বিচারে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম বলেছেন :[৪২]

> "If one calls to mind the essential methods of selecting elites, which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished : Selection on the basis of *blood*, *property*, and *achievement*."

'রক্তসম্পর্ক', 'সম্পত্তি' ও 'ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা' বা কৃতিত্ব—এই তিনটি সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিদ্বৎজনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। অভিজাত সমাজে (Aristocratic Society) সাধারণত রক্তসম্পর্ক বা কুলকৌলীন্য, অর্থাৎ পরিবারই ছিল প্রধান মানদণ্ড। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই আভিজাত্যের মানদণ্ডের সঙ্গে ধনসম্পত্তির মানদণ্ড যুক্ত হল। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রথম পর্বে আভিজাত্যের প্রভাব অবশ্য বেশ-কিছুটা বজায় থেকে গেল, পরে ধীরে ধীরে ধনগত প্রভাব বড় হয়ে উঠল। তারপর সমাজ যত গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে থাকল, তত পারিবারিক রক্তসম্পর্ক ও ধনসম্পত্তির প্রভাব ক্রমে কমতে আরম্ভ করল এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও কৃতিত্বের কদর সামাজিক মর্যাদা লাভের দিক থেকে বাড়তে থাকল। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য তিনটি মানদণ্ডেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা ও গোষ্ঠীমর্যাদা নির্ধারিত হয়, যদিও '*achievement*' বা কৃতিত্বের গুরুত্ব বেশি বৃদ্ধি পায়। ধনবৈষম্যজনিত শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে পরিবার ও ধনসম্পত্তির প্রভাব কখনও ব্যক্তিজীবনে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভের পথে বেশ বড় রকমের অন্তরায় হয়ে ওঠে। প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে বহু প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয় না, এমনকি ব্যক্তিগত কৃতিত্বেরও যোগ্য সমাদর হয় না। অথচ পারিবারিক কৌলীন্যের এবং আর্থিক ক্ষমতার জোরে অনেকে যোগ্যতাবিচারে যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পান। তার কারণ, জোসেফ শুম্পিটার

বলেছেন, "there is an *automatic increment* to a position once elevated."[৪৩]

আধুনিক যুগে বিদ্যার ক্ষেত্রে achievement বা কৃতিত্ব সাধারণত বিত্তের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। হবেই যে এমন কোন কথা নেই, তবে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনা স্বভাবতঃই উনিশ শতকে, ইংরেজিশিক্ষার আদি ও মধ্যপর্বে, অনেক বেশি ছিল, পরবর্তী কালের তুলনায়। বিদ্যার বিত্তনির্ভরতা এবং বিত্তের বিদ্যানির্ভরতা আধুনিক কালের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালে বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার এই প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। আমাদের দেশে ইংরেজিশিক্ষা বিত্ত ও বিদ্যার ঘনিষ্ঠতাকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিতরা বিদ্যা, এবং বিদ্যার বেসাতিলব্ধ বিত্ত, উভয় মানদণ্ডের জোরে তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা 'স্টেটাস' উন্নত করতে সমর্থ হন। সামাজিক শ্রেণীসোপানে আরোহণ-অভিলাষী যাঁরা তাঁদের কাছে ইংরেজিশিক্ষা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সকলশ্রেণীর লোকের কাছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্তের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। লক্ষ্যটা হয় এইরকম ঃ
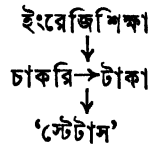
ইংরেজিশিক্ষা
↓
চাকরি → টাকা
↓
'স্টেটাস'

সামাজিক প্রতিষ্ঠা একবার লাভ করলে তার 'automatic increment' (শুম্পিটার) কিছু পাওয়া যায় এবং দু-এক পুরুষ পর্যন্ত অন্তত তার দ্বারা উপকৃতও হতে পারে। অমুক পরিবারের ছেলে, অমুকের নাতি, এরকম পরিচয় দিলে যে-কোন প্রতিষ্ঠিত পরিবারের বংশধরেরা সমাজে খানিকটা সুবিধা পেয়ে থাকেন। সামাজিক মানমর্যাদাও তাঁরা অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পান। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজিশিক্ষার সুযোগ স্বভাবতঃই অনেকটা উচ্চশ্রেণীর বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শোভাবাজারের দেব পরিবার, রামবাগান হাটখোলার দুই দত্ত পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার, মল্লিক-লাহা-শীল পরিবারদের মধ্যে কেউ-কেউ, এবং এরকম আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবার উনিশ শতকে বেশ কিছুকাল প্রায় পুরুষানুক্রমে

কলকাতার এবং বাংলার বিদ্বৎসমাজে প্রভুত্ব করেছিলেন।[88] এদের ক্ষেত্রে শুম্পিটার-কথিত 'automatic increment' নীতি কিছুটা কার্যকর হয়েছিল দেখা যায়। সেটা অবশ্য শুধু উচ্চশিক্ষা বা বিদ্যার জন্য নয়, প্রভূত বিত্তের জন্যও। এই সমস্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা প্রথমে নানাবিধ কাজকর্ম করে (বিদ্যা-সংশ্লিষ্ট নয়) প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন এবং কলকাতার নাগরিক অভিজাতগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিত্তলব্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁদের আগে থেকেই ছিল, তার সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল বিদ্যালব্ধ প্রতিষ্ঠা। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যা যুক্ত হলে আধুনিক যুগে সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়, তার বিপরীত হলে ততটা পায় না।

বিপরীত পথে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে, তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ তাঁরা প্রথমে বিদ্যা অর্জন করে পরে তার বিনিময়ে বিত্ত অর্জন করেছিলেন। কেউ কেউ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু নিজেরা ইংরেজিবিদ্যায় বিদ্বান হবার পর ভাল চাকরি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। উনিশ শতকে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা প্রধানত বিদ্যার দৌলতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে একথা বোঝা যায়। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি এখানে :

মধুসূদন গুপ্ত
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রসিককৃষ্ণ মল্লিক
রাধানাথ শিকদার
রামগোপাল ঘোষ
প্যারীচাঁদ মিত্র
কিশোরীচাঁদ মিত্র
রাজেন্দ্রলাল মিত্র
শিবচন্দ্র দেব
হরচন্দ্র ঘোষ
প্যারীচরণ সরকার
দিগম্বর মিত্র
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাজনারায়ণ বসু
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মধুসূদন দত্ত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণদাস পাল
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ লাহা
কেশবচন্দ্র সেন
শিবনাথ শাস্ত্রী
উমেশচন্দ্র দত্ত
বিপিনচন্দ্র পাল

নামের তালিকা নিশ্চয় আরও অনেক দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু এই কয়েকজনের পারিবারিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মোটামুটি ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্রেণীরূপায়নের যুগবৈশিষ্ট্যটি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, পুরাতন ঐতিহ্যপন্থী পরিবারের সন্তানও কিভাবে অর্জিত বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়েছিলেন, তা আমরা জানি। কলকাতার তথা বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে একদা তিনি অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য কেবল বিত্ত বা বিদ্যা নয়, তাঁর অখণ্ড পৌরুষ ব্যক্তিত্ব ও দুঃসাহসিক সমাজসংস্কারকর্মও তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল। সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো স্বল্পবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও বিদ্যার বিনিময়ে বিত্ত এবং উভয়ের সমন্বয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এরকম ব্যক্তির সংখ্যা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খুব অল্প ছিল না। সংখ্যার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা গরিষ্ঠ না হলেও, সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে এই ইংরেজিশিক্ষিতরা বেশ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী ছিলেন।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকে ইংরেজিশিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে থাকে এবং সাধারণ মধ্যবিত্তের শিক্ষালাভের আগ্রহ ও সুযোগও ক্রমে বাড়তে থাকে। আগ্রহ বাড়ে এইজন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত শিক্ষার বাজারমূল্য চাকরির ক্ষেত্রে বেড়ে যায়। ১৮৬০ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :[৪৫]

> "প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসরকালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে প্রায় ২১০ জন ইঙ্গরেজী ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি. এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোন উপকার দর্শিয়াছে কি না ?...কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরেজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা।"

'প্রভাকর' মাতৃভাষার অবনতি হচ্ছে বলে দুঃখ করেছেন। কিন্তু উপসর্গটি লক্ষ্য করেছেন ঠিকই। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মধ্যবিত্তের কাছে ইংরেজিশিক্ষা একটি বড় সামাজিক উপসর্গ হয়ে দাঁড়ায়।

কেন ইংরেজিশিক্ষার প্রতি আসক্তি বাড়তে থাকে? তার কারণ ব্যাখ্যা করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (১৮৮১-৮২):[৪৬]

"আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এ চেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতামাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর যত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত শ্রবণ সুখকর ও নয়ন তৃপ্তিকর নহে। সাহেবের সহিত দুটা কথা কহিলে, সাহেব ভাল বলিলে চাকুরে ভাবে গদগদ হইয়া থাকেন। যিনি বড় চাকুরী করেন, যিনি মোটা বেতন পান অধুনা সমাজে তাহাদিগের যত সম্মান, স্বদেশের উপকার সাধন অথবা স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জন করিতেছেন তাঁহার তত সমাদর নহে। যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান তাঁহার পিতা মাতা, বড় চাকুরের পিতা মাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন।"

এরপর 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন যে পরিবারে ও সমাজে চাকরির মানমর্যাদা বেশি হওয়ার জন্য কোন স্বাধীন চিন্তাশীল বা শ্রমের কাজে বাঙালীর আর প্রবৃত্তি হয় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরিপ্রিয়তা তাই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং "সেইকারণে কৃষকেরা পর্যন্ত ভদ্র হইবার প্রত্যাশায় জাতিব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। কর্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্মের মূল্য বাড়িতেছে, কাজেই দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশহাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।"

একটি বিষয় এখানে 'সোমপ্রকাশ' সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলাদেশে ইংরেজ আমলে চাকরি, বিশেষ করে ইংরেজের অধীনে চাকরি, 'social status'-এর সবচেয়ে শক্তিশালী 'elevator' হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে উত্থান মুখ্যত চাকরিনির্ভর হয়। চাকরির পদমর্যাদা দিয়ে সামাজিক মর্যাদা যাচাই হয়। অন্য কোন স্বাধীন কাজকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য-লব্ধ প্রতিষ্ঠা, তা যতই 'অর্থকরী' হোক না কেন, চাকরি-গত মর্যাদার সমতুল্য

তা নয়। কোন বাঙালী ব্যবসায়ী যদি লক্ষপতিও হন, তাহলেও একশত টাকা বেতনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট সরকারী চাকুরের কাছে তাঁর সামাজিক মর্যাদা নগণ্য। অর্থের জোরে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হয়ত তিনি অনেক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা শিক্ষিত চাকুরের মতো তাঁর প্রাপ্য নয়। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজে নয়, সমগ্র বাঙালীসমাজে শিক্ষিতের এই মর্যাদা ইংরেজ আমলে ক্ষুণ্ণ হয়নি। এটা বাঙালীসমাজের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ আমলে শিক্ষা বা বিদ্যা 'commercial' হয়েছে, অর্থকরী হয়েছে, কিন্তু তার জন্য শিক্ষার স্বতন্ত্র মর্যাদা ম্লান হয়নি। শিক্ষার সঙ্গে অর্থ যুক্ত হলে এই মর্যাদা সমাজের চোখে আরও বেড়েছে। নতুন সামাজিক মর্যাদার সোপান বলে এবং চাকরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান পাসপোর্ট বলে বাঙালীর কাছে ইংরেজিশিক্ষার সমাদর ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হল 'social mobility' বা সামাজিক গতিশীলতা। 'সোমপ্রকাশ' তারও ইঙ্গিত করেছেন। কৃষকেরা পর্যন্ত 'ভদ্র' হবার প্রত্যাশায় জাতব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টা করছে, 'সোমপ্রকাশে'র এই উক্তির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। 'সম্বাদ ভাস্কর' আরও রূঢ় ভাষায় লিখেছেন:[৪৭]

> "...ইতর সাধারণ সকলে বিদ্যারসে রসিক হইতেছে, তাহারা আর নীচ কর্ম করিতে চাহেন না। ইহাতেই নিত্য কর্ম সম্পাদক ভৃত্যগণের প্রায় অভাব হইয়া উঠিয়াছে। লিখন পঠন ঘটিত একটি সামান্য কর্মে কোন লোকের প্রয়োজন হইলে এক শত জন বিদ্বান লোক আসিয়া উপাসনা করিলেন কিন্তু তৈল মাখাইতে, কাপড় কোঁচাইতে, হাট বাজার করিতে, পান, তামাক সাজিতে, ইত্যাদি গৃহ কর্ম করিতে জানে এমত ভৃত্যের প্রয়োজন হইলে এক ব্যক্তিও আইসে না ইহাতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকদিগের নিত্য কর্মে ভৃত্যাভাবে অশেষ ক্লেশ হইতেছে পুর্বে যে সকল নীচ লোকের এদেশে রাজ মজুরী করিত এইক্ষণে তাহারা কর্ণিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরানি, বিল সরকার, মেট, দালালাদির কর্মে গিয়াছে। নীচ কর্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে।"

'ভাস্করে'র সমালোচনা শুধু রূঢ় নয়, বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিতও বটে। এখানে যেভাবে ধোপা নাপিত ছুতোর মেথর প্রভৃতি নানাবর্ণের লোক কেরানী, বিল সরকার, দালাল ইত্যাদির কাজে বহাল হচ্ছে বলে বিলাপ করা হয়েছে,

তার অনেকটাই সামাজিক সত্য নয়। এইসব দরিদ্র নিম্নবর্ণের লোকের শিক্ষার সুযোগ কিছু ছিল না, কাজেই চাকরির ক্ষেত্রেও তারা উচ্চবর্ণের প্রতিযোগী হবার অধিকার পায়নি। সমাজের একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতাকে 'ভাস্কর' খুব বেশি মাত্রায় ফাঁপিয়ে বিচার করেছেন। অবশ্য সমাজমনের গতি বিচার করলে 'ভাস্করে'র কথা খানিকটা সত্য বলতে হয়। "ইতর সাধারণ" না হলেও, সমাজের মধ্যশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বর্ণের লোক—অবস্থাপন্ন কৃষক ও কারিগররা—কিছুটা আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি-বাংলা বিদ্যালয় (Anglo-Vernacular Schools) স্থাপিত হবার ফলে শিক্ষার এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে চন্দ্রনাথ বসু এবিষয়ে বলেন : "The rapidly increasing number of Anglo-Vernacular Schools, and the growing popularity of the Calcutta University are year after year bringing a larger and larger number of persons within the influence of education...." গ্রামের কারিগরশ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে অনেকে এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তিনি বলেছেন, এবং একথাও বলেছেন যে "the entire mumber of artizan boys who have received any amount of education are at present candidates for service, or, which is the same thing for admission into the well-known *Keraneedom* of Bengal" কারিগরগোষ্ঠীর শিক্ষিত যুবকরা নিজেদের জাতব্যবসার কথা চিন্তা করে না, কারণ তার সঙ্গে একটা সামাজিক হীনমন্যতা জড়িয়ে থাকে। কর্মকার স্বর্ণকার তন্তুবায় ও অন্যান্যরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের কাছে চিরকাল উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র বলে গণ্য হয়েছেন। কাজেই নতুন শিক্ষা পাবার পর তাঁদের সন্তানদের পক্ষে জীবিকা হিসেবে কুলবৃত্তি গ্রহণ করা অপমানকর' মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন :[৪৮]

"The *educated* youth of the artizan class, who feels himself ashamed of a birth which exposes him to the contempt and derision of all the respectable castes of his country, naturally turns away from the pursuit of a calling which would not only

remind him constantly of his social humiliation, but would also, by excluding him from that enlightened society which he has learnt to regard as a privilege of his education, aggravate the painful feeling of mortification with which he contemplates his position."

ইংরেজিশিক্ষার এই মনোভাব বাংলাদেশের কুলবৃত্তির সমাজবন্ধন কিছুটা শিথিল করেছিল। খুব বেশি শিথিল করতে পারেনি, কারণ ইংরেজিশিক্ষার গতি সমাজের উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরের মধ্যে খুব বেশি অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। ইংরেজি বিদ্যালয়ের অনুভূমিক প্রসারের ফলে (horizontal spread) ইংরেজিশিক্ষার ঢেউ নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যসমাজে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু পুরাতন সমাজবন্ধনের ভিত্ ভেঙে ফেলার মতো বেগ বা শক্তি সেই আলোড়নের মধ্যে ছিল না। অবস্থাপন্ন কৃষক ও কারুজীবীদের মধ্যে যাঁরা ছেলেদের উপযুক্ত ইংরেজিশিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা এত অল্প যে বৃহত্তর সমাজের কাছে তাঁরা কোন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ান নি। তবে অচল কুলবৃত্তিগত সমাজবন্ধনে এই অল্পসংখ্যক শিক্ষিত কারুজীবী ও কৃষিজীবীরাও যে কিছুটা সচলতা (mobility) সঞ্চার করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক শিক্ষা ও গ্রাম্যসমাজ প্রসঙ্গে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় আছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন কারুজীবী, বণিক ও কৃষিজীবীরা কোনদিনও নিজেদের বংশধরদের বেশি শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা তাঁদের সেরকম কাম্য ছিল না। পাছে বংশগত বৃত্তির প্রতি শিক্ষিত ছেলেরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তাই উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁদের একটা ভয় ছিল। গোপালচন্দ্র দত্ত লিখেছেন (১৮৬৯) :[৪৯]

"As a proof that our motive for learning English and the incidental knowledge which it imparts, is purely mercenary, I refer to the fact that those alone who mean to make that knowledge as their stock in trade for earning their livelihood devote the full period of their pupilage to its acquisition :—*the classes who have an independent source of living almost systematically slur*

it over. Refer to the University Calendars for the last ten years or to any previous reports of the Bengal Colleges, you will not find the children of many in independent circumstances of life in the lists of passed candidates for degrees and honors or any similar marks of college distinction." (*emphasis* added)

দত্ত মশায়ের এই উক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অংশটি : যাঁদের স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা অর্জনের উপায় আছে তাঁরা ইংরেজিশিক্ষাকে একেবারেই উপেক্ষা করে যান। স্বাধীন বৃত্তিজীবী বলতে গ্রামাঞ্চলে সাধারণত কৃষক, কারুজীবী ও বণিকজাতির লোকদের বোঝায়। এঁদের ইংরেজিশিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ থাকে না, কারণ এই শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্য টাকা রোজগার করা তা তাঁরা নিজেদের স্বাধীনবৃত্তি ছেড়ে অন্য উপায়ে করতে চান না। একথা যে অনেকটা সত্য তা উনিশ শতকে তো বটেই, আজকের দিনে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও বাংলাদেশের, বিশেষ করে ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, তাম্বুলিবণিক গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক ও অন্যান্য বণিকসম্প্রদায়ের, অথবা সঙ্গতিপন্ন কারুজীবীদের, পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়। এঁদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত যে নেই তা নয়, অথবা খুব যে অল্প তাও নয়, কিন্তু এঁদের বংশগত ঝোঁক শিক্ষার দিকে নয়, স্বাধীনবৃত্তির দিকে। এই স্বাধীন বৃত্তি বাণিজ্য হোক বা কারুশিল্প হোক, তার একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি আছে, যার বাইরে তাঁরা অগ্রসর হতে চান না। বাঙালী বণিক-সম্প্রদায়ের এই রক্ষণশীলতা প্রায় বংশগত (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সে যাই হোক, ইংরেজিশিক্ষা-লব্ধ টাকার চেয়ে এরকম বংশগত স্বাধীন বাণিজ্য-লব্ধ টাকার নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা তাঁদের কাছে অনেক বেশি। সেইজন্য তাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত হলেও, ইংরেজি-শিক্ষিত গোষ্ঠীর বিশেষ কলেবরবৃদ্ধি করেননি। তার ফলে ইারেজিশিক্ষা যতদূর নাগরিক সমাজের সচলতা (urban social mobility) বৃদ্ধি করেছিল, ততদূর গ্রাম্যসমাজের করেনি।

ইংরেজিশিক্ষা গোড়া থেকে 'mercenary' ও 'commercial' হয়ে উঠেছিল বলে ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাংলাদেশে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে, দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। চাকরি হয়ে উঠেছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তাই চাকরিজীবী

মধ্যবিত্তই (salariat middle class) ইংরেজিশিক্ষিতদের প্রধান অংশ। কিন্তু এই চাকরির ক্ষেত্রেও গুরুতর সমস্যা শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই দেখা দিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন (১৮৫৪-৫৫):[৫০] "যে সকল বাঙ্গালির প্রতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি ও ডেপুটি কালেক্টরি অথবা মুন্সেফি কিম্বা সদর আমীনি ইত্যাদি যে যে কার্যে ভার অর্পিত হইয়াছে তত্তাবতই তাঁহারা সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।" কিন্তু তা হলেও মোটা বেতনের চাকরি, যথেষ্ট যোগ্য হলেও, বাঙালীদের প্রায় দেওয়াই হত না। পামার সাহেব যখন সিভিল-অডিটরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর সহকারী ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে উক্তপদে উন্নীত হন, তখন 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে তার তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং পরিষ্কার বলা হয় যে এরকম উচ্চপদে নিযুক্ত হবার মতো যোগ্যতা বাঙালীর নেই। এ বিষয়ে 'হরকরাকে' বিদ্রূপ করে 'প্রভাকর' নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখেন:[৫১]

> "কি গো! শাদারঙের হরকরা দাদা। বড় যে রঙের কথা কহিয়া শঙের মত শাদা মনে কাঁদা মাখিয়াছ? আমারদিগের বাহিরে কালো মিস্‌মিস্ বটে, কিন্তু ভিতরে রাঙা টুকটুক আছে, তুমি হরকরার মত নেকরা কাঁদিয়া ঠুকঠুক্ শব্দ যত করিতে পার কর, তাহাতে আমারদিগের মনে ধুকপুক নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি বিশ্বকর্তার বিশ্বরাজ্যের প্রজা নই? তাহার সন্তানই নই? তিনি কি অস্মদাদিগের মনুষ্যত্ব ও মানসিক ক্ষমতা কিছুমাত্রই প্রদান করেন নাই? দেশ, ধর্ম, বর্ণ ও পাত্র ভেদপূর্বক কেবল তোমাদিগেরই ঐ সমস্ত গুণ 'একচেটিয়া' করিয়া দিয়াছেন? আমরা 'নেটিব' মনুষ্যই নই? আমাদের ক্ষমতাই নাই?"

কিন্তু এ ব্যঙ্গবিদ্রূপে শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোন সুফল ফলেনি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন (১৮৫৬):[৫২]

> "রাজকীয় কর্মের মধ্যে যে সমস্ত পদে অধিক বেতন নির্দিষ্ট আছে, কর্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষেরা প্রায় সে সমস্ত পদ স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। যদিও বর্তমান রাজনিয়মের এপ্রকার অভিপ্রায় নহে যে কোন ব্যক্তি কোন পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলে তাহার জাতি বা বর্ণমর্যাদা বিবেচনা করিয়া তাহাকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে কোন মতে প্রতিবন্ধকতা করা হয়, তথাপি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এদেশের প্রধান পক্ষীয় রাজপুরুষেরা স্বজাতি সত্ত্বে আর পারতপক্ষে কোন উচ্চপদে অন্যজাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন না, তাহারা যদি স্বজাতি দ্বারা কোন কর্ম নিকৃষ্টরূপেও নির্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর সে কর্মে এদেশীয় কোন উপযুক্ত

ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেও ইচ্ছা করেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোক সেই কার্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০।১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' এই উক্তি যে কতটা সত্য তা পূর্বোদ্ধৃত সরকারী চাকরিতে বাঙালীর বেতনের হার বিচার করলেই বোঝা যায় (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। এমন অনেক চাকরি আছে যেখানে বড়সাহেবের বেতন হয়ত ১০০০৲ টাকা থেকে ২০০০৲ টাকা, সেখানে তাঁর পরবর্তী বাঙালী সহকারীর বেতন ২০০৲—২৫০৲ টাকা। 'সোমপ্রকাশ' ১৮৮৪-৮৫ সালে "এদেশীয়েরা কি উচ্চতর পদলাভের অযোগ্য" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বড় বড় সরকারী চাকরির একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়ে প্রশ্ন করেছেন, "উপরি পরিগণিত উচ্চতম পদগুলিতে এদেশীয় কয়জন অধিকার লাভ করিয়াছেন? আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিম্নপদে এদেশের যে সকল লোক নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা যখন প্রশংসার সহিত স্বকর্তব্যকার্য সম্পাদন করিয়া কার্যশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, তখন তাঁহারা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে স্বকর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। কেবল কতগুলি অনুন্নতমনা ইংরাজের অভিমানই এদেশীয়দিগের উচ্চতম পদলাভের বিরোধী হইয়াছে।"[৫৩] একাধিক রচনায় 'সোমপ্রকাশ' এই সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করেছেন।[৫৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের মধ্যে (১৮৫৭-৮১) বাংলাদেশে ইংরেজিশিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ কতদূর পর্যন্ত হয়েছিল এবং তার ফলে শিক্ষিতের কর্মক্ষেত্রে কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার বিচার করা দরকার। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪৪,৯৩৫ জন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, ২০,৫০৩ জন উত্তীর্ণ হয়, অর্ধেকের কম। উত্তীর্ণদের মধ্যে বাংলাদেশের সংখ্যা (আসাম-সহ) ১৬,২৯২ জন। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর সংখ্যা ১৮৮১ সনে পর্যন্ত প্রায় ষোলো হাজার দাঁড়ায়, গড়ে বছরে ৬৪০ জন। পরবর্তী উনিশ বছরে গড়ে ৭৫০ জন করে ধরলে, ঊনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত

(১৮৯৯-১৯০০) মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর সংখ্যা হয় প্রায় তিরিশ হাজার।

মধ্যবর্তী স্তরে (Intermediate Stage) 'ফার্স্ট আর্টস' (F. A.) পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৬১-১৮৮১ সালের মধ্যে মোট এফ. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ১১,৮৯৪ জন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৪৭২৪ জন, প্রায় আড়াই ভাগের এক ভাগ। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও আসামের সংখ্যা ৩৮৭৭ জন অর্থাৎ বাঙালীর সংখ্যা প্রায় ৩৭০০ জন।

বি. এ. (B. A.) পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৫৮ সালে। ১৮৫৮-১৮৮১ সালের মধ্যে মোট বি. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ৪১১৫ জন, উত্তীর্ণ হয় ১৭১২ জন। এর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ১৪৯৪ জন। ১৮৬১ সাল থেকে এম. এ. (M A.) পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সালে একজন এবং ১৮৬২ সালে ৩ জন এম এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। প্রথম এম. এ. পাশ করেন ৬ জন ১৮৬৩ সালে। ১৮৮১ সালের মধ্যে মোট ৬৭৮ জন এম. এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। উত্তীর্ণ হন ৪২৩ জন, তাঁদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ৩৪৪ জন।

স্তরে স্তরে ইংরেজিশিক্ষার এই অগ্রগতির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষার্থীর ক্রমিক সংখ্যাহ্রাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মাধ্যমিক স্তরের পর সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের পক্ষে উচ্চশিক্ষা বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল। এফ. এ. স্তরে প্রায় অর্ধেক (৫০%) কমে যায়, বি. এ. স্তরে আরও কমে, এম. এ.-র সংখ্যা তো খুবই অল্প। অ্যাশলে ইডেন (Ashley Eden) ১৮৮০-৮১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার রিপোর্ট প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি জানি বাঙালী মধ্যবিত্তের আর্থিক সঙ্গতি কত অল্প এবং এও জানি যে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলেরাই উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে পড়তে যায়।' গ্রামের দিকে ইংরেজি বিদ্যালয়ের যতটুকু প্রসার হয়েছিল, কলেজের তা হয়নি। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার পর ছাত্রদেব উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রাম থেকে দূরে কোন টাউনের কলেজে পড়তে যেতে হত। তার জন্য তখনকার দিনে খুব কম করেও প্রত্যেক ছাত্রের খরচ লাগত মাসিক ১৫।২০ টাকা। এই খরচ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে বহন করা সম্ভব হত না, একাধিক ছেলের জন্য তো নয়ই। সেইজন্যই দেখা যায়, শিক্ষার উচ্চতর ধাপে ক্রমেই শিক্ষার্থীর

সংখ্যাহ্রাস পেয়েছে। এই সংখ্যাহ্রাস প্রবেশিকা পরীক্ষার পর প্রথমেই কলেজের স্তরে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আজ পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে উচ্চশিক্ষার এই গতির বিশেষ উল্লেখ্য কোন পরিবর্তন হয়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর (প্রবেশিকা পরীক্ষা) পর্যন্ত বিচার-করলে উনিশ শতকের শেষে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিরিশ হাজারের মতো। গ্র্যাজুয়েটদের যদি উচ্চশিক্ষিত ধরা যায়, তহেলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছরে ১৭১২ জন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী ১৯ বছরে এই হারে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা যোগ করলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৩০০০-এর কিছু বেশি। এই ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল চাকরি, এখনও তাই আছে। ১৮৮১ সালে মাত্র ১৭০০ গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে এই চাকরির ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা এই হিসেব থেকে বোঝা যায়ঃ

(গ্র্যাজুয়েট)

গবর্নমেণ্ট সার্ভিস	:	৫২৮
প্রাইভেট সার্ভিস	:	১৮৭
বেকার	:	৬৩৫
খবর জানা নেই	:	৩২০
মৃত	:	৪২

এই হল ১৮৮১ সালে গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির অবস্থা, প্রায় অর্ধেক বেকার।[৫৫] ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীদের অন্যতম কর্মক্ষেত্র হল যেমন চাকরি, তেমনি প্রধান কর্মস্থল হল কলকাতা শহর। আমরা আগে দেখেছি, ঔপনিবেশিক বা বিদেশী শাসকের অধীনে নগর-রূপায়ণ (urbanisation) সাধারণত শিল্পায়নের (industrialisation) ফলে হয় না, এবং তা হয় না বলে 'চাকরি' বা 'service'-এর ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত হয় (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চাকরির বিস্তার স্বভাবতঃই কখনও সীমাহীন হতে পারে না। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী বলে যদিও শিক্ষিত বাঙালীদের, অন্তত উনিশ শতকে, সরকারী চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার অনেক বেশি সুযোগ ছিল, এবং সেই কারণে বাংলার বাইরে উত্তরভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁরা খানিকটা ছড়িয়েও পড়েছিলেন, তাহলেও এক্ষেত্রে সমস্যা ক্র

সংকটের প্রধান কারণ হল, উচ্চবেতনের ভাল চাকরিগুলি প্রধানত ছিল বিদেশী ইংরেজদের একচেটিয়া। যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত সুযোগ্য পাত্র হলেও উচ্চবেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে বাঙালী নিয়োগ অথবা ভারতীয় নিয়োগ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বলা চলে। নগরকেন্দ্রিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত উনিশ শতকের শেষ দিকেই তাই কঠিন কর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'Service-oriented urbanisation'-এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল 'Service-oriented education' এবং তার ফলাফল শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তদের যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর কুফল দেখা দিয়েছিল। শিক্ষার লক্ষ্য যদি কিছু অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব করা হয় তাহলে প্রকৃত জ্ঞানসাধনার আদর্শ থেকে তা বিচ্যুত হতে বাধ্য। দুঃখের বিষয় গোড়া থেকেই আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার এই আদর্শবিচ্যুতি ঘটেছে। তার প্রতিফল হয়েছে, অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার প্রতি আকর্ষণ। ১৮৭৬ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন :[৫৬]

"বর্তমানকাল অল্পবিদ্যার কাল। পূর্বকালে বিদ্যার্থীরা একটি বিশেষ বিদ্যাকে আপনার অনুশীলনের বিষয় করিতেন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতেন সুতরাং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেন।··· বর্তমানকালে যে বিশেষ বিদ্বান ব্যক্তি নাই তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অপ্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন।···অধিকাংশ ব্যক্তিই চঞ্চল ষটপদের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া কোন পুষ্পেতেই সন্তুষ্ট হয় না।···অতএব কোন বিষয়েতেই ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না।···

"বর্তমানকাল লঘুচিত্ততার কাল। অধিকাংশ লোকই কোন প্রগাঢ় বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করে না। অধিকাংশ লোকই কেবল সংবাদপত্র উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া থাকে, ইহাতে তাঁহাদের চিত্ত লঘু হইয়া পড়ে। গুরুতর বিষয়ের অনুশীলন জন্য যে প্রকার মানসিক পরিশ্রম অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা এমনি পরিশ্রম ও অভিনিবেশবিমুখ যে, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি গুরুতর বিদ্যা বিষয়ক সংবাদ তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইলে তাহা তরল ও লোকরঞ্জন আকারে প্রদান করিতে হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন উপন্যাসের আকারে না পরিণত করিলে তাহা তাহাদিগের গ্রাহ্য হয় না।"

পরীক্ষা দেওয়া,পরীক্ষায় পাস করা এবং পাস করে চাকরি করা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহলে তা অন্তঃসারশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক। অল্পবিদ্যা ও

লঘুচিত্ততা যদি উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বেই শিক্ষিতের মধ্যে এরকম প্রকট হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষিতের বিপুল কলেবর বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে অত্যন্ত লঘু পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে তার কি ভয়াবহ রূপ হতে পারে, তা বর্তমানে শিক্ষিতদের অধ্যয়নরুচির চরম বিকৃতি থেকে বোঝা যায়। মনে হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যেন দিব্যদৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক রুচিবিকৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আরও লেখেন :[৫৭]

"পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিতে বল, সঙ্ সাজিতে বল, গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় চলিতে বল, শুকপক্ষীর ন্যায় কথা কহিতে বল, তোমার কথাগুলিকে মস্তকের উপরে স্থান দিব ; কিন্তু যদি স্বাধীনরূপে বুদ্ধি চালনা করিতে বল, যদি আপনার দেশের পূর্বাপরের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে বল, যদি দেশ কাল পাত্র বিবেচনাপূর্বক বিদ্যাকে কার্যে প্রয়োগ করিতে বল, এককথায় এই যে, যদি জীবন্ত মনুষ্য হইতে পার, তবেই সর্বনাশ। বিদ্যাশিক্ষার ফল কি এই।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বলেছেন যে এখন যদি কোন ব্যক্তির শিক্ষা সাঙ্গ হল তাহলে তিনি হয় ডাক্তারি, না হয় ওকালতি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং—এই তিন-রকমের ব্যবসায়ে উদযোগী হন। যাঁদের যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংস্থান আছে, তাঁরা "ওকালতির মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হন", এবং সেই পাথেয় যখন শেষ হয়ে আসে তখন বিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে আরম্ভ করেন। যাঁরা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁরা "অবিরল-নিপতিত সংবাদপত্রধারায় অবগাহন করতঃ রাজনীতিজ্ঞ মণ্ডলীর মধ্যে" গণ্য হতে ইচ্ছা করেন।[৫৮]

শিক্ষিত বাঙালীর স্বাধীন বৃত্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হল ওকালতি, ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু এই বৃত্তির ক্ষেত্রেও তখনকার প্রয়োজন অনুপাতে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে দাঁড়াল। "এক্ষণে উকীল ও ডাক্তার ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ঐ সকল ব্যবসায়ে নতুন প্রবৃত্ত লোকের অন্ন হওয়া সুকঠিন।"[৫৯] কাজেই এই স্বাধীন বৃত্তি ছেড়ে অনেকে শিক্ষকের চাকরি করেন। আর যাঁদের বেশ আর্থিক সঙ্গতি আছে, ঘরে অন্নচিন্তা নেই, তাঁরা রাজনীতি মণ্ডলীভুক্ত হতে হান। একথাও যে অনেকটা সত্য তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। এই আন্দোলনের গোড়া থেকে, উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে,

ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের আধিপত্য তো ছিলই, কর্তৃত্ব ছিল প্রধানত আইন-ব্যবসায়ীদের, অর্থাৎ উকিল-ব্যারিস্টারদের।

উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৩-৯৫, ১৮৯৫-৯৭ ও ১৮৯৭-৯৯ সালে বাংলাদেশের সংসদের (Legislative Council) নির্বাচিত সদস্যদের বৃত্তি (occupation) এদিক দিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো :

	১৮৯৩-৯৫	
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কলিকাতা কর্পোরেশন
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আইনজীবী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
লালমোহন ঘোষ	আইনজীবী	পৌরপ্রতিষ্ঠান-প্রেসিডেন্সি বিভাগ
মৌলবী সিরাজ-উল-ইস্‌লাম খান বাহাদুর	আইনজীবী	জেলা বোর্ড, চট্টগ্রাম বিভাগ
মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর (দ্বারভাঙ্গা)	জমিদার	জেলা বোর্ড-পাটনা বিভাগ
মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়	জমিদার	পৌরপ্রতিষ্ঠান-রাজশাহী বিভাগ
	১৮৯৫-৯৭	
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কলিকাতা কর্পোরেশন
আনন্দমোহন বসু	আইনজীবী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ঈশানচন্দ্র মিত্র	আইনজীবী	পৌরপ্রতিষ্ঠান-রাজশাহী বিভাগ
মধুসূদন দাশ	আইনজীবী	পৌরপ্রতিষ্ঠান—উড়িষ্যা বিভাগ
গুরুপ্রসাদ সেন	আইনজীবী	জেলা বোর্ড—ঢাকা বিভাগ
	১৮৯৭-৯৯	
নরেন্দ্রনাথ সেন	আইনজীবী	কলিকাতা কর্পোরেশন
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আইনজীবী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শালিগ্রাম সিং	আইনজীবী	পৌরপ্রতিষ্ঠান-পাটনা বিভাগ
যাত্রামোহন সেন		পৌরপ্রতিষ্ঠান-চট্টগ্রাম বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		জেলা বোর্ড-প্রেসিডেন্সি-বিভাগ

রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে আইনজীবীদের আধিপত্য কতদূর ছিল তা ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত (এবং তার পরেও) এই

দেশের সংসদ-সদস্যদের বৃত্তি-পরিচয় থেকে বোঝা যায়। মনে হয় যেন বক্তৃতায় ও বাকচাতুর্যে যাঁরা দক্ষ তাঁরাই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক গুণের অধিকারী।

বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্রুত প্রসারের ফলে ক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানে তাঁদের আধিপত্য বাড়ছিল। উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-স্কুলমাস্টার—এঁরাই ক্রমে দেশের রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠছিলেন। এঁদের সঙ্গে মধ্যশ্রেণীভুক্ত ছোট ছোট জমিদার ও ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সাধারণ মধ্যবিত্তের এই প্রসারে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন অভিজাত জমিদারশ্রেণী ও ধনিকরা। ১৮৯২ সালের Indian Councils Act পাস হবার পর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বাংলা-গবর্নমেন্টের কাছে যে আবেদনপত্র পেশ করেন তার মধ্যে অভিজাত জমিদার-শ্রেণীর ক্ষমতালোপ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। আবেদনপত্রে তাঁরা লিখেছেন :

> "The Committee submit that the rules do not in any way provide for the adequate representation of important native interests in the Council. Any scheme of representation which does not recognise *the claims of wealth, property and social position* is radically defective."—*emphasis* added.

কৌন্সিল অ্যাক্টে কণামাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির ফলে ধনসম্পত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হবে, এই আশঙ্কা আবেদনের মধ্যে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির উল্লেখ করে কমিটি বলেছেন : "A cursory glance at the reports will show that these bodies are mainly composed of small land-holders and traders, vakils, mukhtears, school-masters and medical practitioners." এই প্রসঙ্গে বড় বড় জমিদাদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—"If by chance any of the large land-holders offer themselves as candidates for election to a seat in the Council *they are sure to be defeated by a combinatian of vakils, mukhtears, small traders, money-lenders and school-masters.*"—(*emphasis* added)

আবেদনপত্রটি আগাগোড়া পড়লে দেখা যায় যে বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে উকিল মোক্তার ও স্কুলমাস্টারদের সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষীয় সভা'র ভয় সবচেয়ে বেশি। তারমধ্যে আবার উকিল মোক্তার ব্যারিস্টারদের সম্বন্ধে ভয় অত্যধিক :

"The District Boards and Mafassil Municipalities, and even the Calcutta Corporation and the University, have as a rule elected pleaders and members of the other branches of the legal profession. They have also occasionally elected representatives of that section of the educated middle class, which so strongly imbued with Western radical ideas, has necessarily no sympathy with either land-owners or ryots, and which is out of touch with the bulk of what is after all a purely agricultural community."

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাঙালী আইনজীবীদের একচ্ছত্র প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করে 'ভারতর্ষীয় সভা' ইংরেজিশিক্ষিতদের সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা এত বেশিমাত্রায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন যে এদেশে জমিদার বা কৃষক কারও প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি নেই। অথচ দেশটা যখন প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ তখন জমিদার ও কৃষকদের কথাই বেশি করে চিন্তা করা উচিত। তারজন্য দেশের বড় বড় সম্ভ্রান্ত জমিদারদের যে-কোন প্রতিনিধিসভায় সর্বাগ্রে স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।[৬০]

দুঃখের বিষয়, 'ভারতবর্ষীয় সভার' এই আবেদনের সুরের সঙ্গে তখন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ছন্দের কোন সঙ্গতি ছিল না। ইতিহাসের চলার গতি ছিল তখন মধ্যবিত্তমুখী। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রসারও তখন প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। যদিও তার কলেবর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খুব বেশি স্ফীত হয়নি, তাহলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৫-৭ সালের মধ্যে গড়ে প্রত্যেক বছরে ১৯৩৫ জন 'গ্র্যাজুয়েট' হয়েছে। এই গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে গড়ে প্রায় ৫৪০ জন ওকালতিবৃত্তি গ্রহণ করেছেন (শতকরা ২৫ জনেরও বেশি)।[৬১] এরমধ্যে বাঙালীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে সর্বাধিক। কাজেই উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে আইনজীবীরাই তখন প্রায়

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বাঙালী আইনজীবীদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। আইনব্যবসা বৃত্তিটাই (এবং অনেকটা ডাক্তারও) স্বাধীন এবং তার জন্য রাজনীতিক্ষেত্রে আইনজীবীদের বিচরণের সুযোগও বেশি। এই সুযোগই মধ্যবিত্তশ্রেণীর আইনজীবীরা তখন গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙালী মুসলমান ও ইংরেজিশিক্ষা

বাংলার মুসলমানরা পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা ও ইংরেজিশিক্ষার প্রতি প্রথম থেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। মনে হয় যেন রাজক্ষমতাচ্যুত হয়ে তাঁরা কিছুতেই ইংরেজিভাষাকে সম্মান দিতে চাইছিলেন না। মনে মনে তাঁরা একটা ক্ষোভ ও বিদ্রোহভাব ইংরেজিশিক্ষার বিরুদ্ধে পোষণ করতেন। এ ক্ষোভ ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের থাকা স্বাভাবিক। আরবী-ফার্সী ও মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষার প্রতি তাঁদের প্রায় অন্ধ অনুরাগ ছিল। কলকাতা মাদ্রাসার (১৭৮০) এবং হুগলী মহসীন কলেজের (১৮৩৬) ইতিহাস থেকে তা বোঝা যায়। ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক-মেকলের প্রস্তাবে যখন ইংরেজিভাষাই উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে সরকারী অনুমোদন লাভ করে, তখন কলকাতার প্রায় ৮০০০ মুসলমান তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একটি আবেদনপত্র পাঠান। ১৮৩৬ সালে চুঁচুড়ায় হুগলি মহম্মদ মহসীন কলেজ স্থাপিত হলে তিনদিনের মধ্যে ইংরেজিবিভাগের ছাত্র হয় ১২০০, প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগে ৩০০। ইংরেজিবিভাগে মুসলমান ছাত্র হয় ৩১ জন, হিন্দু ৯৪৮ এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগে মুসলমান ১৩৮, হিন্দু ৮১। হান্টার তাঁর *The Indian Mussalmans* গ্রন্থে (১৮৭১) লিখেছেন, "The staff of clerks attached to the various offiices, the responsible posts in the courts, and even the higher offiices in the police are recruited from the pushing Hindu youth of the Government School." ১৮৭১ সালে প্রাদেশিক (বাংলা) সরকারী চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা কি অনুপাতে ছিল তারও একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন :

	ইউরোপীয়	হিন্দু	মুসলমান	মোট
অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনর :	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কলেক্টর :	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬

	ইউরোপীয়	হিন্দু	মুসলমান	মোট
আয়কর অ্যাসেসার :	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ :	৩৩	২৫	২	৬০
ছোট আদালতের জজ, সাবঅর্ডিনেট জজ :	১৪	২৫	৮	৪৭
মুনসেফ :	১	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিস বিভাগ (গেজেটেড) :	১০৬	৩	০	১০৯
পূর্ত বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং) :	১৫৪	১৯	০	১৭৩
পূর্ত বিভাগ (সাবঅর্ডিনেট) :	৭২	১২৫	৪	২০১
পূর্ত বিভাগ (অ্যাকাউণ্টস) :	২২	৫৪	০	৭৬
মেডিকাল বিভাগ :	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
ডি. পি. আই. (শিক্ষা) :	৩৮	১৪	১	৫৩
কাস্টমস, সার্ভে ইত্যাদি :	৪১২	১০	০	৪২২

'কভনন্টেড সিভিল সার্ভিস' ও 'বিচারবিভাগে' (নন-রেগুলেশন জেলা) যথাক্রমে ২৬০ ও ৪৭ জন ইয়োরোপীয় অফিসার নিযুক্ত, হিন্দু বা মুসলমান একজনও নেই। মোট ২১১১ জন কর্মচারীর মধ্যে ইয়োরোপীয় ১৩৩৮, হিন্দু ৬৮১ ও মুসলমান ৯২ জন। ইয়োরোপীয়-হিন্দু-মুসলমানের সরকারী চাকরির আনুপাতিক হারের এই হিসেব দিয়ে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন :

"A hundred years ago, the Musalmans monopolized all the important offices of state. The Hindus accepted with thanks such crumbs as their former conquerors dropped from their table, and the English were represented by a few factors and clerks. The proportion of Muhammadans to Hindus, as shown above, is now less than one-seventh. The proportion of Hindus to Europeans is more than one-half : the proportion of Musalmans to Europeans is less than one-fourteenth. The proportion of the race which a century ago had the monopoly of Government, has now fallen to less than one-twentythird of the whole administrative body···and, infact, there is now scarcely a Government office in Calcutta in which a Muhammadan can hope for any post above the rank of porter, messenger, filler of inkpots and menders of pens."

উনিশ শতকের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের এই সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার অন্যতম কারণ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাচ্যুতির ফলে জাতিগত অভিমান, আধুনিকতা ও পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের প্রতি ধর্মগোঁড়ামি-জনিত বিরূপ মনোভাব এবং হিন্দুদের তুলনায় নিজেদের পশ্চাদ্‌গতির ফলে নৈরাশ্য ও হীনমন্যতাবোধ। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই অবস্থার উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়নি। ১৮৮১-৮২ সাল পর্যন্ত দেখা যায়, উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে ও কলেজে বাংলাদেশে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম ঃ

১৮৮১-৮২ সালে বাংলাদেশে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা

	মোট ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	শতকরা
কলেজ-ইংরেজি :	২৭৩৮	১০৬	৩'৮
কলেজ-প্রাচ্যবিদ্যা :	১০৮৯	১০৮৮	৯৯'৯০
উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় :	৪৩,৭৪৭	৩৮৩১	৮'৭
মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় :	৩৭,৯৫৯	৫০৩২	১৩'২ .
উচ্চ-ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় :	১৮৪		
মধ্য-ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় :	৩৪০	৪	১'১

লক্ষণীয় হল, মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অন্ধ অনুরাগ বিগত শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় একরকমই ছিল। আধুনিক শিক্ষার উচ্চতর স্তরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যার দ্রুত হ্রাস থেকে বোঝা যায়, ইংরেজিশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তাঁদের বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ বাড়েনি। বিশ শতকে পৌঁছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে প্রায়, বাংলার মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে যেন অকস্মাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন ঃ[৬২]

> "We now reach a period in the history of Mahomedan education which may go to posterity as a landmark of epoch-making importance. In 1905, the memorable year of partition, the Mahomedans by a stroke of administrative pen were in a jerk suddenly brought to their full consciousness."

কিন্তু এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ হিন্দু ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাদেশিকতার তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধি করে। উদীয়মান শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী তার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিদ্বেষের পথে

অগ্রসর হতে থাকেন। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে পদে পদে সংঘাত ও বিরোধ থেকে তাঁরা এই বিভেদের প্রেরণা পান। রাজনীতিক্ষেত্রে তার বিষময় ফল ফলতে আরম্ভ করে। সে-ইতিহাস স্বতন্ত্র। উনিশ শতকে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার ইতিহাসে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের এই পারস্পরিক সামাজিক দূরত্ব অনেকদিক থেকে বাঙালী জীবনে পরবর্তীকালে যে দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

ইংরেজিশিক্ষার অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে উল্লেখ্য হল—পাশ্চাত্ত্যভাব (Westernisation) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individuality) বিকাশ। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের ফলে এদেশে ইংরেজিশিক্ষিতদের মন ক্রমেই সমাজের ঐতিহ্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল—প্রধানত হিন্দুসমাজের, কারণ উনিশ শতকে শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই ছিল বেশি। হিন্দুসমাজের চিরাচরিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রথা-সংস্কার ঐতিহ্য—এগুলির প্রতি ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীরা ক্রমেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতিও তাঁদের উদাসীনতা, কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা, প্রকাশ পাচ্ছিল। ধর্মের প্রতি শিক্ষিতদের মনোভাব প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন :[৬৩]

> "শিক্ষিতদলের মধ্যে অনেকে যে ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আছেন তাহা একবিধ কারণে নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রচলিত ধর্মই তাঁহাদের উন্নত অবস্থার উপযুক্ত নহে। অনেকে ধর্মের নাম অত্যন্ত বিবাদাস্পদ দেখিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গ ভয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। কেহ কেহ ধর্মের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে অনেকের নিকট এদেশের ধর্মসংস্কার বিষয়ে আশানুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।"

ধর্মীয় মনোভাবের এই পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছিল, তারও একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।' শিক্ষিত স্বামী তাঁর স্ত্রীর অর্থহীন ধর্মাচরণে অশান্তি ভোগ করেন, স্ত্রীও ধর্মের প্রতি স্বামীর অশ্রদ্ধাভাবে শান্তি পান না। তরুণ

পুত্র, বিদ্যালয়ের ছাত্র, হয়ত আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়, পিতা ও মাতা কারও সঙ্গে তার মতের মিল হয় না। পরিবারের গুরু-পুরোহিতরাও বিশ্বাসশূন্য যজমানের কর্মানুষ্ঠানে স্বস্তি পান না। "বৃদ্ধের সহিত যুবার মিল নাই, স্ত্রীর সহিত স্বামীর মিল নাই, পিতার সহিত পুত্রের মিল নাই। ইহা কি শান্তির চিহ্ন?"[৬৪] সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ইংরেজিশিক্ষিতদের এই উভয়সংকট সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন (১৮৬৮-৬৯):[৬৫]

> "সমাজ সম্বন্ধেও কৃতবিদ্যদিগের বিষম সংকট উপস্থিত হইয়াছে। উপধর্ম দূষিত হিন্দুসমাজের নানা দোষ ইহাদিগের নয়নপথে উপনীত হইতেছে। ইহারা সেগুলির নিকটে মস্তক নত করিতে পারিতেছেন না। সমাজ সম্বন্ধে কর্তব্যের ব্যাঘাতভয়ে সমাজ পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থা কি ক্লেশকর নয়? ইংরাজী শিক্ষা কি এই অসুখের কারণ নয়? ইহারা যদি ইংরাজী না শিখিতেন, সেই বাল্যবিবাহ, সেই বহুবিবাহ, সেই কৌলীন্য কি ইহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিত না? অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ সকলে যেরূপ অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করিতেছেন, ইহারাও কি সেইরূপ করিতেন না? এক ইংরাজী শিখিয়া ইহাদিগের তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল সব গেল।"

ইংরেজিশিক্ষিতদের পাশ্চাত্যভাব বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে এবং মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনে যে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, তার স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস 'সোমপ্রকাশ' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এই আলোচনা থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী। তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রেরণার মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য ছিল, এমন কি ইংরেজিশিক্ষিত একাংশের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামিও কম ছিল না। তাছাড়া ইংরেজিশিক্ষিত নন, সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এরকম সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিলেন। যেমন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকে। পাশ্চাত্যভাব শুধু যে ইংরেজি বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা নয়, তার বাইরে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। নতুন জীবনদর্শন ও সামাজিক আদর্শ তাই বাংলার পাশ্চাত্যপন্থী (Westernized) ও

(Sanskritized) উভয় শ্রেণীর শিক্ষিতদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তবে এই বিদ্বৎগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজিশিক্ষিতদের সংখ্যা যে বাংলাদেশে বেশি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজসংস্কার আন্দোলনে কমবেশি উভয়গোষ্ঠীরই দান ছিল (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ইংরেজিশিক্ষার আর একটি বড় দান হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism)। এটিও পাশ্চাত্ত্যভাবের একটি বিশিষ্ট উপাদান। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (১৮৬৮-৬৯):৬৬

> "ইংরাজী শিক্ষা সেই গর্বিত ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহাদিগেরই মন অন্যপ্রকার হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ইংরাজদিগের দোষগুণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। ইংরাজেরা কি পদার্থ বুঝিতে পারিতেছেন; তাঁহারা দেবতার ন্যায় আমাদিগের আরাধ্য কিনা তাহা বুঝিতেছেন, অনুমাত্র দোষ দর্শন করিলেই স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছেন; সর্বতোভাবে সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ লইয়া বিবাদ করিতেছেন ..."

ইংরেজিশিক্ষিতরা ইংরেজের প্রভুত্ব আর নির্বিচারে মেনে নিতে রাজী নন, তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তাঁরা ইংরেজের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করেন, স্পষ্টভাষায় দোষের সমালোচনা করেন, শাসক-শাসিতের প্রভুভৃত্য সম্পর্ক স্বীকার করেন না, সর্বক্ষেত্রে সমকক্ষের মতো ব্যবহার করেন, তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ নিয়ে বিবাদ করতেও দ্বিধা করেন না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছে বোঝা যায়। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাই দেখা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তরা অগ্রণী হয়েছেন এবং সর্বভারতে জাতীয় চেতনার সম্প্রসারণে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

'বঙ্গদূত' পত্রিকা ১৮২৯ সালে লিখেছিলেন যে গৌড়দেশে, অর্থাৎ বাংলাদেশে যখন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যবর্তী মধ্যশ্রেণীর উদ্‌ভব হল, তখন অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণী স্বাধীনতাও লাভ করবে। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকেই ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীরা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হন। তারপর জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৮৫)। এই সময় জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনা প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তারপর ধীরে ধীরে তা ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

জাতীয় জীবনে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেশাত্মবোধ উদ্‌বোধনে সহায় হয়েছে, পারিবারিক জীবনে হয়েছে তা নানারকমের সংঘাত, সংকট ও ভাঙনের কারণ। এই সমস্যা ও সংকটের ইঙ্গিত আগে করা হয়েছে। প্রকৃত শিল্পায়ন ও শিল্পমুখী নগর-রূপায়ণের অভাবে বাংলাদেশে (এবং সারা ভারতবর্ষেও) আর্থনীতিক বিকাশ কালোপযোগী হয়নি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। তার ফলে সামাজিক ইনস্টিটিউশনের মধ্যে যৌথ পরিবার বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। কিন্তু তার জন্য পারিবারিক শান্তি বা স্থৈর্য বৃদ্ধি পায়নি। নাগরিক ভাবধারা ও ইংরেজিশিক্ষাজনিত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাতে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের আভ্যন্তরিক 'tension' ক্রমে বেড়েছে, এমন কি গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারও এই বিচ্ছিন্নপ্রায় মানসতা থেকে মুক্তি পায়নি (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যদিকে আর্থিক পরাধীনতা, এই দুয়ের বিপরীতমুখী টানে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে।

নির্দেশিকা

প্রথমে পৃষ্ঠা সংখ্যা, পরে বন্ধনীর মধ্যে সূচকসংখ্যা।

১৬৩ (১) Arnold W. Green : *An Analysis of Life in Modern Society*, N. Y, 1964,
Karl Mannheim : *The Sociology of Culture*
Karl Mannheim : *Diagnosis of our Time*
C. Wright Mills : *White Collar*
Roy Lewis & Angus Maude : *The English Middle Classes*
G. D. H. Cole : *Studies in Class Structure*

১৬৪ (২) Alfred Von Martin : *Sociology of the Renaissance*, London 1945. Introduction, p. 2

১৬৫ (৩) Lokenath Ghosh : *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc*, Part II Calcutta 1879.

Foreign Department Records 1839-এ তদানীন্তন কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে (ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন : 'ভারতবর্ষ', শ্রাবণ ১৩৪১)।

১৬৫ (৪) Sterndale : History of The Calcutta Collectorate.

১৬৫ (৫) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : নববাবুবিলাস, কলিকাতা আঃ ১৮২৩, 'অথ অঙ্কুর খণ্ড'।

১৬৬ (৬) Joseph Schumpeter : *Social Classes*, Merdian Books, U.S.A. 1955 pp. 132-33

১৬৭ (৭) Op. cit, Ibid

১৬৮ (৮) G. D. H. Cole : *Studies in Class Structure*, London 1955, Ch. IV 'The Conception of Middle Class'.

১৬৮ (৯) A.F. Pollard : *Factors in Modern History*, 3rd ed. London 1932, Ch. III pp. 43-44.

১৬৮ (১০) Op. cit, p. 44,

১৭০ (১১) Martin : Op. cit, p. 15 (উদ্ধৃত)।

১৭১ (১২) 'বঙ্গদূত' : ১৩ জুন ১৮২৯—'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি'।

১৭২ (১৩) বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৫৭

১৭২ (১৪) অমৃতবাজার পত্রিকা : ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬, ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৯ : 'মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অপলোপ'।

১৭৪ (১৫) *Report on the World Social Situation* ; U.N.O. New York 1957 : 'Social Problems of Urbanisation in Economically Underdeveloped Areas' p. 126.

১৭৪ (১৬) Op. cit, Ibid.

১৭৫ (১৭) Op. cit (U.N.O. Report), Ibid.

১৭৫ (১৮) A Griffin : *Sketches of Calcutta* etc, Glasgow 1843, pp. 45-46.

১৭৭ (১৯) Fanny Parkes : *Wanderings of a Pilgrim* etc, London 1850, Vol I, pp. 21-22 Emma Roberts তাঁর *Scenes and Characteristics of Hindostan* (3 Vols, London 1835) গ্রন্থেও 'সরকার' চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন (Vol I, pp. 5-6)।

১৭৮ (২০) মোটামুটি ১৮৪০ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত *Bengal Directory* ও *Calcutta Directory* থেকে এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ১৮৫৬ সালের এই বিবরণটি *The New Calcutta Directory*, 1856, Part III, pp. 109-36 থেকে সংগৃহীত।

১৮৮ (২১) Ramcomul Sen : *English-Bengali Dictionary*, Calcutta 1834, Intro.

১৮৯ (২২) Rev. Lal Behari Day : *Recollections of Alexander Duff*, London 1879, p. 22.

১৮৯ (২৩) Ramcomul Sen : Op. cit, Intro.

১৮৯ (২৪) George Smith : *The Life of Alexander Duff*, 2 vols, London 1879 Vol. I, p. 96.

১৮৯ (২৫) Alfred Von Martin : *Sociology of the Renaissance*, London 1945, p. 39.

১৯০ (২৬) George Smith : Op. cit, Vol I, pp. 99-101 : 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ডাফ সাহেবের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া The Revd. Dr Duff's

letters addressed to Lord Auckland on the Subject of Native Education, 1841 দ্রষ্টব্য।

১৯০ (২৭) Lal Behari Day : Op. cit, p. 28.

১৯১ (২৮) Rev. Alexander Duff : *India and India Missions*, Edin. 1840, pp. 631-32.

১৯১ (২৯) Op. cit, p. 632.

১৯১ (৩০) *Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol 8—'Intellectual' by Robert Michels.

১৯১ (৩১) Karl Mannheim : *Ideology and Utopia*, London 1936, Ch. III, Sec. 4—"The Sociological Problem of the intelligentsia", pp. 136-46। উদ্ধৃতিটি পৃষ্ঠা ৯ থেকে গৃহীত।

১৯৩ (৩২) H.J.S. Cotton : *India in Transition* : London 1885 p. 15.

১৯৩ (৩৩) Rev. M.A. Sherring : *Hindu Tribes and Castes*, London 1881, Vol III p. 279-83 : শিক্ষিত বাঙালীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪ (৩৪) H. Sharp : *Selections from Educational Records*, Part I, 1781-1839, Calcutta 1920 : Anglicist-Orientalist-দের এই বাদানুবাদ সংশ্লিষ্ট সরকারী নথিপত্র, ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ ও মেকলের বিখ্যাত 'মিনিট' (২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫) এবং বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব (৭ মার্চ ১৮৩৫) এই গ্রন্থের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আছে (পৃষ্ঠা ৭৭-১৪২)।

১৯৪ (৩৫) William Adam : *Reports on the State of Education in Bengal* (1835 & 1838), Ed. by Anath Nath Basu, Calcutta University 1941, p. 429.

১৯৫ (৩৬) op. cit, p 441.

১৯৫ (৩৭) op. cit p. 357.

১৯৬ (৩৮) Sharp : op. cit, p. 130.

১৯৭ (৩৯) Eric Stokes : *The English Utilitarians and India*, Oxford 1959, p. 43, p. 45.

১৯৮ (৪০) C. E. Trevelyan : *The Education of the People of India*, London 1838, pp. 192-5.

১৯৮ (৪১) G. O. Trevelyan : *Life and Letters of Lord Macaulay*, 1908 ed, pp. 329-30. Eric Stokes-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৬।

১৯৯ (৪২) Karl Mannheim : *Man and Society*, London 1940, 'Selection of Elites' pp. 88-96.

২০০ (৪৩) Joseph Schumpeter : *Social Classes*, (Meridian Books) N.Y. 1955 : 'The Rise and Fall of Families within a Class' শিরোনামে শুম্পিটার এবিষয়ে আলোচনা করেছেন।

২০১ (৪৪) Lokenath Ghose : *The Modern History of Indian Chiefs Rajas, Zamindars etc*, Vol. II Calcutta, 1881 এই গ্রন্থে বিভিন্ন পরিবারের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

বিনয় ঘোষ : 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' (চতুরঙ্গ, কার্তিক—পৌষ, ১৩৬২), 'বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্যা' (চতুরঙ্গ, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৬৪)।

Buckland : *Dictionary of Indian Biography*.

২০২ (৪৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : প্রথম, পৃ ৩৮০-৮১।

২০৩ (৪৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : চতুর্থ, পৃ ১৪১-৪৩।

২০৪ (৪৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : তৃতীয়, পৃ ৪৪৬-৪৭।

২০৫ (৪৮) Chunder Nath Bose : 'Thoughts on the Present Social and Economical Condition of Bengal and its Probable Future'—Paper read on January 1869, Bengal Social Science Association, Transactions 1869.

২০৬ (৪৯) Gopal Chandra Dut : 'The Educated Natives of Bengal'—Paper read on 18 February 1869 (Bethune Society Proceedings 1869).

২০৭ (৫০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : প্রথম, পৃ ৩৫৫।

২০৮ (৫১) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র প্রথম, পৃ ২৫৮-৫০

২০৮ (৫২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয়, পৃ ১৮৩।

২০৯ (৫৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র চতুর্থ, পৃ ১৭১-৭৬।

২০৯ (৫৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র চতুর্থ, পৃ ১৩৮, ১৯৩।

২১১ (৫৫) Krishna Ch. Roy : High Education and the Present Position of the Graduates in Arts and Law of the Calcutta University. (Reprinted with corrections from *The Hindoo Patriot* of the 23rd October 1882).
Convocation Addresses, University of Calcutta, Vol. I 1858-1879
Convocation Addresses, do Voi, II 1880-1898.

২১২ (৫৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : দ্বিতীয়, পৃ ২৬২-৬৩।

২১৩ (৫৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয়, পৃ ৪৪২-৫১।

২১৩ (৫৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয়, পৃ ৪৪৪।

২১৩ (৫৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয়, পৃ ৪৫৩।

২১৬ (৬০) India Home Proceedings, Vol 5414, pp. 2327-32, India Office Library (C.H. Philips ed. *Selected Documents* of *The History of India* etc., London 1962, Vol. IV, pp. 130-33)

২১৬ (৬১) Progress of Education in India, 1902-7, Vol. I, pp. 34-5.

২১৯ (৬২) M. Azizul Huque : *History and Problems of Moslem Education in Bengal*, Calcutta 1917 : W. W. Hunter : *The Mussalmans, Calcutta*—1945 (Reprint).

২২০ (৬৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : দ্বিতীয়, পৃ ৪৩৫-৪০।

২২১ (৬৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : দ্বিতীয়, পৃ ৪৩৬।

২২১ (৬৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৫২১-২৩।

২২২ (৬৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : চতুর্থ, পৃ ৫২১।

সামাজিক জীবনের প্রবাহ

বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় মানুষের জীবন অনেকটা বহতা নদীর মতো। জীবনের এই প্রবাহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সমাজের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তনের গতি মন্থর। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আমূল পরিবর্তন মানবসমাজে হয় না। যে-কোন যুগে যে-কোন সময় যদি সমাজে ব্যক্তি-জীবন, পারিবারিক-জীবন ও নানারকমের গোষ্ঠী-জীবনের ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ নতুন বা সম্পূর্ণ পুরনো ধারা বলে কিছু নেই, নতুন-পুরনো একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। চিন্তাধারায় হোক, ধর্মাচরণে হোক, পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা-রীতি-নীতির আবর্তনে হোক, নতুনের সঙ্গে পুরনো মন ও আচরণ সব সময় মিলেমিশে থাকে। সামাজিক জীবনে কোন সময় এমন কোন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে দেখা যায় পুরনো ধারা সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে এবং নতুন ধারা পরিপূর্ণরূপে শুরু হয়েছে। জীবনের বহুমুখী ধারা কখন কোন্‌টি কোথায় শেষ হয় এবং কোথায় শুরু হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।

সামাজিক ইতিহাসবিদ্‌ ট্রেভেলিয়ান তাঁর *English Social History* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন: "In everything the old overlaps the new—in religion, in thought, in family custom. There is never any clear cut; there is no single moment when all Englishmen adopt new ways of life and thought." ইংরেজদের ক্ষেত্রে যা সত্য, বাঙালীর ক্ষেত্রেও তা সত্য, অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও তা মিথ্যা হবার কথা নয়। ইতিহাসের গতিপথে এমন কোন একটি মুহূর্তও খুঁজে পাওয়া যায় না—কোন শতাব্দীতেই না—যখন দেখা যায় বাংলাদেশে প্রত্যেক বাঙালী একই চিন্তাভাবনা ও একই জীবনধারার পথিক ছিল। সমাজের গতির যখন এই বিশেষত্ব তখন তার একশো বছরের ইতিবৃত্ত নির্বাচিত ও শ্রেণীবদ্ধ বিষয়ে ভাগ-ভাগ করে বিচার করলে তার মধ্যে জীবনের সমগ্রতা ও

অখণ্ডতা যথাযথ প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। বহমান ঘটনার আবর্তে জীবনের পরিবর্তনশীল দৃশ্য যেমনভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়—"by a series of scenes divided by intervals of time" (Trevelyan)—কতকটা তেমনিভাবেই তার বর্ণনা করতে হয়।

কালের যাত্রায় যতিচিহ্নও যেখানে খুশি টানা যায় না। যেমন ১৮০০ থেকে ১৮২৫, তারপর থেকে ১৮৫০, অথবা এই ধরনের পর্বভাগ ইতিহাসের ধারাবিচারে অনাবশ্যক মনে হয়। যদিও সমাজের গতিপথে ঐতিহাসিক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (ট্রেভেলিয়ান যে অর্থে ঐতিহাসিককে 'Dry as dust at bottom is a poet' বলেছেন) এই যতিচিহ্ন লক্ষ্য করতে পারেন, তাহলেও তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সঙ্গত বলে মনে হয় না। তথাপি একথাও অস্বীকার করা যায় না যে জীবনের স্রোত একটানা বা মন্দাক্রান্তা নয়, তার জোয়ার-ভাঁটা আছে, ঢেউ আছে, ছোট-বড় ঢেউ—ঘুর্ণী আছে, বাঁক আছে, তীরভাঙা বিক্ষোভ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আবার একটানা কলতানও আছে। যতিচিহ্ন এই গতি-ধারা ইঙ্গিত করে টানা যায়, কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে টানা যায় কিনা সন্দেহ।

১৮০০-২৯

আঠার শতকে কলকাতার নব্য-অভিজাতদের কালে তো বটেই, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও—যখন নবযুগের পথিক রামমোহনের কাল প্রায় আরম্ভ হয়েছে বলা চলে—কলকাতা শহরের রাস্তায় হাতী চলে বেড়াত। হাতী মধ্যযুগের স্থূল ও স্থবির প্রতিমূর্তি। আঠার শতক থেকে কলকাতা শহরের রাস্তায় যখন যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, খোয়াভাঙা রাস্তায় চলন্ত ঘোড়ার চক্রযানের ঘর্ঘর শব্দে যখন কলকাতায় মানুষের ঘুম ভাঙতে আরম্ভ করল, তখন মনে হল মোরগের ডাকে ঘুমভাঙার রাত শেষ হয়ে নতুন দিনের ভোর হচ্ছে—একটি পুরনো যুগ অস্ত যাচ্ছে, আর-একটি নতুন যুগের অভ্যুদয় হচ্ছে। "If the fowls no longer cackled at dawn, the restless stomp of a highbred horse might be heard at night from rear windows: The man on horseback had taken possession of the city." (Lewis Mumford)[১] নতুন যুগের ঘোড়সওয়াররা নতুন

শহর দখল করেছে। তাদের জীবন আলাদা, মন আলাদা, আগেকার যুগের জীবন ও মনের সঙ্গে অনেক জায়গায় মিল নেই—

And this is a city
In name but in deed
It is a pack of people
That seek after meed [gain].
For officers and all
Do seek their own gain
But for the wealth of the Commons
Not one taketh pain.
And hell without order
I may it well call
Where every man is for himself
And no man for all.[২]

(Robert Crowley)

'প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য, পরের জন্য নয়'—এই হল আধুনিক শহরের মানুষ। কলকাতা সেই আধুনিক শহর।

উনিশ শতকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ইতিহাসের মঞ্চে কয়েকটি দৃশ্য দেখা যায়। ১৮০০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' স্থাপিত হয়; শ্রীরামপুরে 'ব্যাপটিস্ট মিশন'-এর প্রতিষ্ঠা হয়; সম্ভবত ডেভিড হেয়ার কলকাতা শহরে ঘড়ির ব্যবসা করতে আসেন। রামমোহন রায় কলকাতা শহরে আসা-যাওয়া করতে আরম্ভ করেন। ১৮০২ সালে (২০ আগস্ট) সাগর দ্বীপে সমুদ্রের জলে দেবতার উদ্দেশে হিন্দুদের সন্তান-উৎসর্গ করার নিষ্ঠুরপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়।[৩] রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কাহিনীকাব্যের মর্মান্তিক দৃশ্য যখন সাগরতীর্থে অনুষ্ঠিত হত, তখন (১৮০১ সাল) বার্টলেট নামে একজন ব্র্যাঞ্চ-পাইলট অন্যান্য ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে এই দৃশ্য দেখতে গিয়ে একটি ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ন্যাসী-ফকিরদের চক্রান্তে ব্যর্থ হন।[৪] সনাতন সামাজিক প্রথায় এদেশে ব্রিটিশ শাসকরা প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত করেন সাগর দ্বীপে হিন্দুদের সন্তান-উৎসর্গ আইনত নিষিদ্ধ করে। যতদূর জানা

যায়, বিদেশী শাসকের এই নিষেধাজ্ঞার জন্য তখন হিন্দুসমাজে বিশেষ কোন আন্দোলন বা প্রতিবাদের কলরব শোনা যায়নি। যদি কোন প্রতিবাদ হয়েও থাকে, তাহলেও তার নির্জন ক্ষীণকণ্ঠের কোন প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি। অথচ ১৮২৯-৩০ সালে যখন একই রকমের নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা 'সতীদাহ' আইনত নিষিদ্ধ করা হয়, তখন ধর্মগোঁড়ামির উগ্রমূর্তি সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতা শহরে গোলাম-পোষণ, গোলাম-নির্যাতন ও গোলাম-ব্যবসা পুরোদমে চলত। ১৭৮৫ সালে উইলিয়ম জোন্স কলকাতায় গোলামের ব্যবসা সম্পর্কিত সুপ্রীমকোর্টের একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে বলেন: "গোলামদের দুরবস্থার কথা যা আমি জানি তা এত নিষ্ঠুর ও বর্বর যে বলতেও আমার সঙ্কোচ হয়। প্রতিদিন বহু গোলাম-নির্যাতনের কাহিনী আমার কানে পৌঁছয়। এই জনবহুল কলকাতা শহরে এমন অবস্থাপন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক খুব কমই আছেন যাঁর অন্তত একটি বালক বা বালিকা গোলাম নেই। কলকাতা শহর সম্প্রতি গোলাম কেনা-বেচার একটি বড় আড়ত হয়ে উঠেছে।" আঠার শতকের শেষ দিকে জোন্স এই কথা বলেন। ১৭৯৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা বাংলাদেশের বাইরে গোলাম-রপ্তানি বন্ধ করার জন্য একটি আদেশ জারী করেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে, এবং কলকাতা শহরে, গোলাম কেনাবেচা নির্বিবাদে চলতে থাকে।

গোলামির প্রতি ইংরেজদের মনোভাব ইংলণ্ডেই বদলাতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্লবের পর। ১৮০৭ সালে ইংলণ্ডে গোলামের ব্যবসা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। বর্বর গোলামিপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করার জন্য যাঁরা ইংলণ্ডে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় পুরুষ হলেন উইলবারফোর্স (Wilberforce)। কিন্তু ইংলণ্ডেও গোলামিপ্রথা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আন্দোলনের পর ফাউয়েল বাক্সটন (Fowell Buxton) প্রমুখ সমাজনেতাদের আন্দোলনের ফলে, ১৮৩৩ সালে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে গোলামিপ্রথা আইনত বিলুপ্ত হয়। এই বছরে উইলবারফোর্স মারা যান। উইলবারফোর্সের মানবমর্যাদার আন্দোলন, ট্রেভেলিয়ান বলেছেন, ইংলণ্ডের শহর-নগর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ফলে ইংরেজ জাতির মধ্যে যেন এক

নবচেতনার উদ্‌বোধন হয়—"English of the best, and something new in the world."[৫]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংলণ্ডের মতো বাংলাদেশে শিল্পবিপ্লবোত্তর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীরও বিকাশ হয়নি তেমন, এবং স্বভাবতঃই তাই উইলবারফোর্সের মতো সমাজনেতারও আবির্ভাব হয়নি। গোলামি-প্রথা বাংলার সামাজিক জীবন কলঙ্কিত করেছে বহুদিন। ১৮২৭ সালে আঠার বছর বয়সে ইংরেজ কবি ক্যাম্পবেলের উক্তি "And as the Slave departs, the Man returns" উদ্‌ধৃত করে ডিরোজিও এদেশের গোলামদের মুক্তি চিন্তা করে লেখেন :[৬]

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be ;
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free !

অথচ এর মধ্যে রামমোহন রায় প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে, স্থায়ীভাবে কলকাতা শহরে বসবাসের সিদ্ধান্ত করেন (১৮১৪), 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন (১৮১৫), কলকাতা শহরে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিন্দুকলেজ' স্থাপিত হয় (১৮১৭), সতীদাহ-সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রচারকার্য শুরু করেন (১৮১৮–১৯), ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র তর্কবিতর্ক আরম্ভ করেন (১৮২৭-২৮), 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২৮) এবং সতীদাহ-নিবারণ আইনও বিধিবদ্ধ হয় (১৮২৯)। কিন্তু গোলামির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন বা আইন কিছুই হয়নি। অপরাধের মধ্যযুগীয় বিচার ও দণ্ডদান, এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত, কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথেই চলেছে। ইতিহাসের এই বিচিত্রমুখী ধারা দেখে বাস্তবিকই বিভ্রান্ত হতে হয় এবং ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় বলতে হয় :[৭] "The pattern of history is indeed a tangled web. No simple diagram will explain its infinite complication." ইতিহাসের এই কুটিল গতি শুধু আমাদের দেশের নয়, ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশেরও বিশেষত্ব। ট্রেভেলিয়ানও তাই প্রশ্ন করেছেন, মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির শেষ কোথায় বলে আমরা ঠিক করব—চোদ্দ, ষোল না আঠার শতকে ? ইংরেজজাতির ইতিহাস প্রসঙ্গেই তাঁকে এই প্রশ্ন করতে হয়েছে।

নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন: "Perhaps it matters little; what does matter is that we should understand what really happened."[৮] রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের সময় থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে, না শিল্পবিপ্লবের পর থেকে? আসল কথা, মানুষের সামাজিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় বটে, কিন্তু অত্যন্ত ধীরে ধীরে বদলায়, এবং সর্বকালে একই গতিতে বদলায় না। আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার বছরের পরিবর্তনের এই গতি উনিশ শতকের একশো বছরের গতির তুলনায় অনেক মন্থর। আবার বিশ শতকে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের পরিবর্তনের গতি আগেকার তুলনায় অনেকগুণ বেশি দ্রুত। বাস্তব জীবনের পরিবর্তনের উপর মানসিক জীবনের পরিবর্তন অনেকাংশে নির্ভরশীল বলে, ইতিহাসে সর্বকালে, এক-একটি শতাব্দীর মধ্যেও, পরিবর্তনের গতির তারতম্য ঘটে, এবং পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ হয় সমাজে। বাংলাদেশে উনিশ শতকেও তাই হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' ও অন্যান্য পত্রিকায় কলকাতার বৌবাজার-লালবাজার অঞ্চলে প্রচুর ট্যাভার্ন-কফিহাউসের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। হার্মনিক, ক্রাউন অ্যাণ্ড অ্যাঙ্কর, ব্রিটিশ কফিহাউস—এইরকম সব নাম। এই ট্যাভার্ন ও কফিহাউসগুলি আমাদের স্বদেশী সমাজের স্বাভাবিক দৃশ্য নয়, আঠার শতকের জনসনের ইংলণ্ডের সামাজিক দৃশ্যের একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র, লণ্ডনের বদলে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে।[৯] সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন; "The Coffee-houses became the first centres of opinion in a partially democratized society."[১০] কলকাতার নগরকেন্দ্রিক বাঙালীসমাজে যদিও গণতন্ত্রের বহুদূর পদধ্বনি উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই শোনা যাচ্ছিল—ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং খানিকটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে—তাহলেও লালবাজার বৌবাজারের ট্যাভার্ন-কফিহাউসের মধ্যে তার কোন প্রতিশব্দই শোনা যায়নি। লক্ষণীয় হল, এইসব ট্যাভার্ন-কফিহাউসের সঙ্গে এদেশের লোকের কোন সম্পর্কই ছিল না। এমনকি হার্মনিকের মতো অভিজাত ট্যাভার্নের কোন সম্ভ্রান্ত বাঙালী, যাঁরা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে খানাপিনা উৎসবে যথেষ্ট মেলামেশা করতেন, তাঁরাও যাতায়াত করতেন না। সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা মেলামেশা করতেন শহরের বাবুদের

সহমরণ সলভিন্স ১৭৯

গঙ্গাযাত্রা সলভিন্স ১৭৯

বৈঠকখানায়, আখড়াই-কবিগানের আসরে, অথবা বটতলায় নিধুবাবুর টপ্পাগানের মজলিসে। "শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন, ঐ স্থানে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত শৌখিন, ধনি ও গুণি লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।" ১১

১৮১৫ সালে রামমোহন রায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করেন। তারও আগে অবশ্য (১৮০৩-৪ সালে) তিনি 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যতে পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্মমতের বীজটি ছিল দেখা যায়। পরে ১৮৮৪ সালে ঢাকা গবর্নমেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেহুল্লা 'A Gift to Deists' নামে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয় (১৮১৫)। তখন বাংলাদেশে বেদ-উপনিষদের অনুশীলন একরকম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। রামমোহন নতুন করে শুধু যে বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন তা নয়, বাংলাভাষায় তিনিই বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার এবং জনসমাজে প্রচারক। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লেখেন, "অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথা সাধ্য প্রকাশ করিলেক।"[১২] এই গ্রন্থ প্রকাশের কি উদ্দেশ্য ছিল তা এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। পশুপক্ষী, মৃত্তিকা-পাষাণ প্রভৃতি বস্তুকে অনেকে উপাস্য দেবতা মনে করেন, তাঁরা দেবতার স্বরূপ কি তা জানেন না। সাধারণ লোকের মধ্যে বেদান্তের প্রচার হয়নি বলে "স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের" বাক্যে এবং নিজেদের পূর্বসংস্কারের জন্য এরকম ধর্মবিশ্বাসের প্রসার হয়েছে সমাজে। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং বেদান্তে তা কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যাতে সাধারণ লোক

নিজেরা পাঠ করে বিচার করতে পারেন, তার জন্যই তিনি বেদান্ত বাংলাভাষায় প্রচার করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রকে রামমোহন বাঙালী সাধারণের কাছে মুক্ত করে দেন। মুদ্রণশিল্পের (Printing) প্রতিষ্ঠা এদেশে না-হলে এই মুক্তিদান অবশ্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি জনসমাজে প্রচার করা যায় না। শুধু সংস্কৃত পুঁথি মুদ্রিত হলেও জনসমাজে তার প্রচার হত না। মাতৃভাষা বাংলায় সংস্কৃত শাস্ত্র প্রচার করে রামমোহন সেই দুরতিক্রম্য বাধাও অপসারণ করেছিলেন। মুদ্রণ ও মাতৃভাষা—এই দু'টি অস্ত্রের সাহায্যে রামমোহন বাংলার জনসমাজে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দূর করেন। আধুনিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তাই মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকার দান অসামান্য। ল্যুইস মামফোর্ড লিখেছেন:[১৩]

> "More than any other device, the printed book released people from the domination of the immediate and the local. Doing so, it contributed further to the dissociation of medieval society."

মামফোর্ড মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে যা বলেছেন, আধুনিক 'ঘড়ি' সম্বন্ধেও সে কথা সত্য। মামফোর্ডের ভাষায় "The clock was the most influential of machines, mechanically as well as socially" এবং আঠার শতকের মধ্যভাগেই এই যান্ত্রিক ঘড়ির পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয়, সমাজে তার প্রচলনও হতে থাকে।[১৪] উনিশ শতকের সূচনাতেই বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুদায়িত্বপূর্ণ আধুনিক শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি ঘড়ির ব্যবসায়ী হয়ে কলকাতা শহরে আসেন। তাঁর নাম ডেভিড হেয়ার। এটা একটা 'strange coincidence' বটে, কিন্তু ইতিহাসে এরকম আশ্চর্য ঘটনার মিলন অনেক সময় ঘটে।

১৮১৬ সালে রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তার ভূমিকায় তিনি লেখেন:

> "By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system."

সামাজিক বাধা নয় শুধু, পারিবারিক নির্যাতন রামমোহনকে অনেক সহ্য করতে হয়, স্বাধীনভাবে তাঁর ধর্মমত মুদ্রিত গ্রন্থাকারে লোকসমাজে প্রচার করার জন্য। তাতে তিনি বিচলিত হননি। ১৮১৫ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে রামমোহন বাংলা ভাষায় প্রায় ২৯ খানি, সংস্কৃতে ৩ খানি, এবং ইংরেজিতে প্রায় ৩৩ খানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করেন।[১৫] অর্থনীতি সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলি তিনি রচনা করেন এবং তার ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের গণ্ডি শ্রেণীগতভাবে যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রামমোহনের রচনা ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে অনেকের রচনা পুস্তকাকারে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং সামাজিক ও নানাবিধ বিষয়ে সাময়িকপত্রও সাধারণের মতামত গঠনে সাহায্য করে।

পুস্তক-পত্রিকার পাশাপাশি উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে বাংলাদেশে (প্রধানত কলকাতা শহরে) স্বাধীন মতামতের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতির (Associations, Societies) প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। নবযুগের সন্ধিক্ষণে "societies of this type became centres of reforming zeal as well as literary and philosophic illumination."[১৬] বাংলাদেশে বাঙালীর উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের সভাসমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫)। প্রথমে 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশন হত রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে, পরে হত তাঁর সিমলার বাড়িতে। কেবল যে রামমোহনের গৃহে সভার অধিবেশন হত তা নয়, অন্যান্য সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত। প্রত্যেক অধিবেশনে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হত এবং নানারকমের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। ১৮১৯ সালের ৯ মে রবিবার সভার সদস্য ব্রজমোহন মজুমদারের গৃহে যে অধিবেশন হয়েছিল তার বিবরণ থেকে সভার উদ্দেশ্য অনেকটা বোঝা যায়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল জাতিভেদ সমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহ ও সতীদাহ বা সহমরণের সমস্যা। সমস্যাগুলি অধিকাংশই সামাজিক। আলোচিত সমস্যাগুলি নিয়ে দেখা যায় পরবর্তীকালে প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে বেশ বড় বড় সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

'আত্মীয় সভা'র সভ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন রামমোহনের বন্ধু বা অনুরাগী। তাঁরা সকলেই প্রায় সম্ভ্রান্ত উচ্চসমাজের লোক ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসের (খিদিরপুর) রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জাস্টিস অনুকূলচন্দ্রের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও আন্দুলের জমিদার রাজা কাশীনাথ। ইউরোপে আধুনিকযুগের প্রথম পর্বে দেখা যায়, প্রগতিশীল সামাজিক ভাবধারার মুখপাত্ররূপে নতুন ধনিক অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বিচিত্র মিলন হয়েছিল, বিত্ত ও বিদ্যার অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। বাংলাদেশেও আধুনিকযুগের প্রথম পর্বে অভিজাতশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের মিলনের পরিচয় পাওয়া যায় 'আত্মীয় সভা'য়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের প্রথমপর্বে ধনিকশ্রেণীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন, "It is essential to note how with the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life."[১৮] আত্মীয় সভার মধ্যে অবশ্য ধনিক ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কিং পরিবারের লোক ছিলেন না, অধিকাংশই ছিলেন নতুন জমিদারশ্রেণীর লোক। এই পার্থক্যের মধ্যে ইংলণ্ডে ও আমাদের দেশের আর্থনীতিক সামাজিক জীবনের মূল পার্থক্য প্রতিফলিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে আদৌ হয়নি, নতুন জমিদারী প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তার ফলে নতুন একশ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল সমাজে। এই নতুন জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ প্রগতিশীল ভাবধারার পোষকতা করতেন। রামমোহনের পার্শ্বচরদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

'গৌড়ীয় সমাজ' স্থাপিত হয় ১৮২৩ সালে, উদ্দেশ্য "এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন।" প্রাচীনপন্থী মধ্যপন্থী ও আধুনিকপন্থী সকলশ্রেণীর বাঙালীর সমাবেশ হয় 'গৌড়ীয় সমাজে'। যেমন 'আত্মীয় সভা'র দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য উদারপন্থী ব্যক্তিরা সমাজের সভ্য ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাধাকান্ত দেব,

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এবং অন্যান্য প্রাচীন ও নব্যপন্থীরা। 'গৌড়ীয় সমাজে'র আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, সভ্যরা প্রধানত উচ্চ-অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, মধ্যবিত্তশ্রেণীরও অনেকে 'সমাজে' যোগ দিয়েছিলেন। 'আত্মীয় সভা'র সভ্যদের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্যের বাঁধন ছিল, 'গৌড়ীয় সমাজে' তা ছিল না। সেখানে নানারকম মতামতের আদান-প্রদান হত, ব্যক্তিগতভাবে সভ্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে কোন বাধা ছিল না।

১৮২৮-২৯ সালের মধ্যে আরও অনেক সভাসমিতি স্থাপিত হয়, অবশ্য প্রধানত ইংরেজদের উদ্‌যোগে। যেমন Literary Society, Oriental Literary Society, Phrenological Society, Agricultural and Horticultural Society, Commercial and Patriotic Association (রামমোহন রায় এই সভার ট্রেজারার ছিলেন), Ladies' Society (বৈদ্যনাথ রায় ও কাশীনাথ মল্লিক এই সভা প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সহযোগী ছিলেন), Calcutta Medical and Physical Society ইত্যাদি। সমাজ সাহিত্য শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যেমন ইংরেজরা তেমনি বাঙালীরা স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময় করতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সভার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, একশ্রেণীর বাঙালীদের সামনে সামাজিক সমস্যাগুলি তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিল।

'সামাজিক জীবনের ধারার মধ্যে তখন অবশ্য প্রাচীন গতানুগতিক ধারারই প্রাবল্য ছিল। উৎসব-পার্বণে, আমোদ-প্রমোদে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বাঙালীসমাজের কোন শ্রেণীর মধ্যেই তেমন উল্লেখ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি। গ্রাম্যসমাজে তো হয়ই নি, কলকাতার নতুন নাগরিক সমাজেও সাংস্কৃতিক উৎসবাদি কোন বিশেষ রূপ ধারণ করেনি। গ্রাম্য উৎসবের ধারা গতানুগতিকই ছিল (যেমন শিব ও ধর্মঠাকুরের গাজন, মনসার ঝাঁপান এবং আরও নানারকমের লোকোৎসব)। কলকাতার সমাজেও এই গ্রাম্য উৎসবের ধারা বেশ প্রবল ছিল। তার সঙ্গে নতুন নাগরিক চালচলন ও রুচির মিশ্রণে নতুন উৎসব-আমোদ-প্রমোদেরও বিকাশ হচ্ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) ও 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) নামে দুটি ব্যঙ্গরচনায় তখনকার বাঙালী সমাজের নক্‌শাচিত্র এঁকেছেন। 'কলিকাতা কমলালয়ে'

বিষয়ী বাঙালী ভদ্রলোকদের তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হল যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, "অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করিয়া থাকেন" এবং "অপূর্ব পোশাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পাল্‌কী বা অপূর্ব শকটারোহণে কর্মস্থানে গমন করেন।" দ্বিতীয়টি হল মধ্যবিত্তরা, "অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন।" জীবনযাত্রা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রায় একরকম, মধ্যবিত্তদের "কেবল দানবৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।" তৃতীয়টি হল "দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক।" এঁদেরও মধ্যবিত্ত বলা যায়, তবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত। এঁদের জীবনযাত্রার মধ্যেও বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না, "কেবল আহার ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম করিয়া থাকেন।" "অসাধারণ ভাগ্যবান" বলে আর একশ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, "ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমিদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্‌বৃত্ত হয়।" বোঝা যায়, এঁরা হলেন শহরের নতুন বাঙালী অভিজাতশ্রেণী। 'নববাবুবিলাসে' এই নব্য-অভিজাতদের সামাজিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে "ইহারা অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিত পরিসেবিত।"

শহরের বাঙালী অভিজাতরা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। দুর্গোৎসবে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে, পানভোজনের মজলিসে শহরের গণ্যমান্য ইংরেজরাও আমন্ত্রিত হতেন, তাঁদের জন্য বিশেষ নাচগান ও আতসবাজির ব্যবস্থা করা হত। নাচগানের মধ্যে হিন্দুস্থানী সুর ও ভঙ্গির সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি সুরও ভঙ্গি মিশিয়ে একটি বিচিত্র বস্তু সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশন করা হত। বিদেশী পর্যটকদের বৃত্তান্তে এবং সমসাময়িক পত্রিকায় অভিজাত বাঙালীগৃহের এই সব উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[১৯]

আঠার শতকে কলকাতার বাঙালী নব্য-অভিজাতরা যে বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের উৎকট ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তা উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা, এমন কি রামমোহন ও দ্বারকানাথের মতো নতুন চিন্তাধারার পথপ্রদর্শকরাও এই বিলাসের

উত্তরাধিকার বহন করে চলেছিলেন। অথচ বাংলার সমাজ-জীবনে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা প্রবর্তনের পথে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা তখন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। 'আত্মীয় সভা' ও কয়েকটি পত্রিকার ভিতর দিয়ে রামমোহন তখন কিভাবে সামাজিক জীবনে নতুন পথ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। তিনি যে নতুন ধর্মচিন্তা করছিলেন, সমাজে তখন তারও খানিকটা প্রচার হয়েছিল তাঁর বেদান্ত-উপনিষদের বাংলা ভাষ্য থেকে। তাঁর ধর্মমতের বিরুদ্ধে তখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বেশ জোর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল রক্ষণশীলদের প্রধান মুখপত্র।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁর ধর্মমতের সংঘাত যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, খ্রীস্টান সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে এবং খ্রীস্টান পাদরিদের বিরুদ্ধে রামমোহন সমানে তাঁর ধর্মমত নিয়ে তর্কবিতর্ক করেন (১৮২০-২৮)। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বাইবেলের মূল পুরাতন পাঠ অধ্যয়ন করার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা পর্যন্ত শিখেছিলেন। কিন্তু খ্রীস্টান শাস্ত্রে পরবর্তীকালে যে সমস্ত নৈতিক সমাচার অলৌকিক কাহিনীসহ সংযোজিত হয়েছে তার অভ্রান্ততা তিনি স্বীকার করতেন না, এবং যীশুখ্রীস্টকে অবতার বলেও বিশ্বাস করতেন না। মানুষের চরিত্র ধর্মবুদ্ধি বিবেক ও মন উন্নত করার জন্য যীশু যে সমস্ত কথা বলে গিয়েছেন, সেইগুলিই তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে হত। এই সম্পদের সন্ধান এদেশের লোকদের দেবার জন্য তিনি যীশুর বাণীর একটি সংকলন প্রকাশ করেন ইংরেজিতে—*The Precepts of Jesus* (১৮২০)। তারপর ১৮২০-২১ সালের মধ্যে যখন এই সংকলন ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রীস্টান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন খ্রীস্টানদের কাছে তাঁর দুটি আবেদন প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ সালে এই বিষয়ে তাঁর *Final Appeal to the Christian Public etc* প্রকাশিত হয়। রামমোহনকে কেন্দ্র করে গোঁড়া খ্রীস্টান ও গোঁড়া হিন্দুদের বাদ-প্রতিবাদ যখন বেশ তীব্র হয়ে ওঠে, সমাজে যখন রীতিমত দলাদলি আরম্ভ হয়, তখন আত্মীয়-সভার সভ্যরা অনেকে ভয় পেয়ে সভায় আসা বন্ধ করে দেন। আত্মীয় সভার সভ্যদের যে শ্রেণীগত পরিচয় আগে দিয়েছি (জমিদারশ্রেণী) তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমাজের

ভয়ে ভীত হওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। জমিদাররা যতই উদার হন, সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করার মতো সংসাহস তাঁদের প্রায় ছিল না বললে ভুল হয় না। কাজেই আত্মীয় সভা ১৮২১-২২ সালের পর থেকে কেবল নামেই টিকেছিল বলা চলে।

আত্মীয় সভায় যখন সংকট দেখা দিল তখন রেভারেণ্ড অ্যাডামের সহযোগিতায় রামমোহন 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি' নামে একটি সভা স্থাপন করেন (১৮২১)। এই সভায় ইউনিটেরিয়ান খ্রীস্টান মতে উপাসনা হত। তারপর রামমোহন তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সভা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সভার নাম হয় 'ব্রাহ্মসমাজ'। ২০ আগস্ট ১৮২৮ 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। তখন সাধারণত লোকে এই সভাকে 'ব্রহ্মসভা' বলত। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় কলকাতায়, চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামে এক ভদ্রলোকের বাইরের বৈঠকখানা ভাড়া করে। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় সভায় ব্রহ্মোপাসনা হত। দু'জন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন, পরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করতেন। অবশেষে সঙ্গীতের পর সভার কাজ শেষ হত। সঙ্গীত করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী ও পাখোয়াজ বাজাতেন গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান।[২০] ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হবার পর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে রামমোহন-বিরোধিতা ক্রমে আরও তীব্রতর হতে থাকে। বাইরের লোক অনেকে কৌতূহলী হয়ে ব্রাহ্মসভার সাপ্তাহিক সান্ধ্য অধিবেশনে যাতায়াত করতে থাকেন। উপাসনার পদ্ধতি ও উপাসকদের আচার-ব্যবহার দেখে তাঁদের মনে হত, এ বোধ হয় খ্রীস্টান গীর্জা-উপাসনার এদেশীয় অনুকরণ। তাঁরা এই কথা ভেবে শঙ্কিত হন যে রামমোহনের দল দেশীয় পদ্ধতিতে ব্রহ্মোপাসনার নাম করে এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারেই অগ্রসর হয়েছেন। লোকে তাঁকে খ্রীস্টান বলে উপহাস করতেও কুণ্ঠিত হত না। রামমোহনের কার্যকলাপ নিয়ে পথে-ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায় সর্বদা তখন কটূক্তি বর্ষিত হত।

(আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদির কার্যকলাপে বাইরের হিন্দুসমাজ যখন বিক্ষুব্ধ, তখন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনও কয়েকটি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবল আকার ধারণ করে। রামমোহন ১৮১৮ সালে 'সহমরণ

অন্তর্জলী (১৮১৫ ?) আশুতোষ-সংগ্রহ

উ সব (গাজন) সলভিন্স ১৭৯৯

ঝাঁপান (মনসার)

সলভিনস ১৭

A DOORGA POOJA

গাপুজা

সলভিনস ১৭

বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮১৯ সালে এ বিষয়ে তাঁর 'দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশিত হয়। ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন। শোনা যায় ১৭৮৬ সালে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সতীদাহের সংবাদ পুণার রেসিডেন্ট ম্যালেট সাহেব ১৭৮৭ সালে ইংলণ্ডে পাঠান।[২১] তারপর রামমোহন যে সময় থেকে আন্দোলন আরম্ভ করেন প্রায় তখন থেকেই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হতে থাকে। এই সমস্ত বিতর্কের বিবরণের মধ্যে সতীদাহ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।[২২] যেকোন কারণেই হোক, বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে সতীদাহের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বিলেতের 'পার্লামেণ্টারি পেপারে' সতীদাহের সংখ্যার যে হিসেব পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই ভয়াবহ। যেমন ঃ

বাংলাদেশে সতীদাহের সংখ্যা

(কলকাতা ঢাকা মুর্শিদাবাদ পাটনা বেরিলি বানারস)

১৮১৭	:	৭০৭
১৮১৮	:	৮৯৩
১৮১৯	:	৬৫০
১৮২০	:	৫৯৭
১৮২১	:	৬৫৪
১৮২২	:	৫৮৩
১৮২৫	:	৬৩৯
১৮২৬	:	৫১৮

ফাউয়েল বাক্সটন ১৮২৫ সালে কমন্স সভায় বলেন যে পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সহমৃত সতীর সংখ্যা হয় ৩৪০০ জন। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যা এই হলেও, আসল সতীদাহের সংখ্যা অনেক বেশি, প্রায় ১০ হাজারের মতো। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, অধিকাংশ সতীদাহই বাংলা দেশে কলকাতা শহরের আশপাশের জেলাতেই অনুষ্ঠিত হত। ডিভিসন ও জেলা অনুযায়ী ১৮১৮-১৯ সালে সতীদাহের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতা ডিভিসনে ৪২১, ঢাকা ডিভিসনে ৫৫, মুর্শিদাবাদ ডিভিসনে

২৫টি সতীদাহ হয়েছে, তার মধ্যে কলকাতা ডিভিসনে জেলা-প্রতি সংখ্যা এই :

১৮১৮-১৯ সালে সতীদাহের সংখ্যা (কলিকাতা ডিভিসন)

জেলা		সংখ্যা
বর্ধমান	:	৭৫
উড়িষ্যা — কটক	:	১৩
উড়িষ্যা — খুড়দা	:	৯
উড়িষ্যা — পুরী	:	১১
হুগলি	:	১১৫
যশোহর	:	১৬
জঙ্গল মহল	:	৩১
মেদিনীপুর	:	১৩
নদীয়া	:	৪৭
কলকাতার শহরতলী	:	৫২
২৪ পরগণা	:	৩৯
		৪২১

এখানে দেখা যায়, কলকাতার শহরতলি ও পাশাপাশি অঞ্চলে এবং শহরের কাছে হুগলি জেলায় সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। 'সমাচার দর্পণ' লিখেছেন (২৭ মার্চ ১৮১৯) : "অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।" এই পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ১৮১৭ সালে হুগলি জেলাতে "দুইশত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে।" কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল ব্যবধানের মধ্যে চারিদিকে হিন্দুসমাজে কেন এরকম সতীদাহের আধিক্য হয়েছিল, তা সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিষয়। সতীদাহ যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। ১৮১৯ সালে কলকাতা ডিভিসনের সতীদাহের সংখ্যা বর্ণভেদে (caste-wise) ও বয়সভেদে (age-wise) ভাগ করলে মোটামুটি এইরকম

সতীদাহ ১৮১৯

বয়স	ব্রাহ্মণ	বৈদ্য-কায়স্থ	নিম্নবর্ণ
১০ বছরের কম	২	×	×
১০-১৯ বছর	৬	৫	৯
২০-৩৯ বছর	৩৪	২১	৫১
৪০-৫৯ বছর	৫৯	৪৩	৮৮
৬০ বছরের বেশি	৭৪	২৯	৮১
	১৭৫	৯৮	২২৯

বর্ণগতভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি বলতে হয়। তাহলেও বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মিলিত সংখ্যা কম নয়। বাংলাদেশে সতীদাহের আধিক্যের অন্যতম কারণ মনে হয় কৌলীন্যপ্রথা এবং এই কৌলীন্যপ্রথার অন্যতম আদিকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণরাঢ় অঞ্চল (হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি)। এই কৌলীন্যপ্রথা এমন একটি বিকৃত সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যে বহুপত্নীর অকালবৈধব্য শেষ পর্যন্ত একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধান সমস্যা ছিল দু'টি—একটি আর্থনীতিক, আর একটি বৈধব্যযন্ত্রণা। আর্থনীতিক সমস্যা হল বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের সমস্যা এবং বৈধব্যযন্ত্রণা অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেকদিক থেকেই অসহ্য। এ সমস্যার সমাধান দু'টি উপায়ে হতে পারে। আর্থনীতিক অবস্থার সাচ্ছল্য এবং বিধবাবিবাহের সামাজিক প্রচলন। সাধারণভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্রই ছিলেন বেশি। অধ্যাপনা-যজমানি-পৌরোহিত্য ছিল তাঁদের বর্ণগত পেশা এবং অধিকাংশই ছিলেন রাজা-মহারাজা জমিদার-যজমানদের বৃত্তিজীবী। কাজেই কুলীন ব্রাহ্মণপত্নীদের আর্থিক সমস্যা ও বৈধব্য যন্ত্রণা উভয়সংকটের সম্মুখীন হতে হত। ধর্মের নামে এই উভয়সংকটের সমাধান সম্ভব হয়েছিল সহমরণের মধ্যে। বাংলাদেশে সহমরণের আধিক্যের এই ধরনের কতকগুলি আর্থিক ও সামাজিক কারণ ছিল বলে মনে হয়। তারপর সহমরণ যখন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল এবং সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত হল, তখন ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও এই প্রথা সংক্রামিত হল। এই সংক্রমণের কারণ অব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা। একে সামাজিক প্রথার 'Brahminization' বা 'Sanskritization' বলা যায়।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক উইলবারফোর্স, ফাউলার বাক্সটন, জন পয়েণ্ডার এবং আরও অনেকে কমন্সসভায় ও তার বাইরে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। এদেশের খ্রীস্টান মিশনারীরাও সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা ও রচনা প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় স্বভাবতঃই এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক হন। তার জন্য হিন্দু-সমাজের কাছ থেকে অনেক অপমান ও অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়। এই আন্দোলনের ফলে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ বেন্টিঙ্ক সহমরণপ্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলে যেমন হয়, বাংলার হিন্দু-সমাজেরও প্রায় সেই অবস্থা হল সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হবার পর। সামাজিক জীবন সংঘাতের একটা নতুন স্তরে পৌঁছল।

১৮৩০-৩৩

নতুন সচলতা (dynamism) সঞ্চারিত হল সমাজে। কেবল সতীদাহ নিষেধ আইন পাস হওয়ার জন্য নয়, আরও কতকগুলি ঘটনার দ্রুত ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ-জীবনে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হল ১৮৩০ সাল থেকে। রামমোহনের ব্রাহ্মসভার বিরুদ্ধে 'ধর্মসভা' গঠিত হল ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০। ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি থেকে ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ জোড়াসাঁকোর নিজস্ব নতুন বাড়িতে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হল। ২৭ মে ১৮৩০ বিখ্যাত স্কটিশ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন রায় বিলেত যাত্রা করেন। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক, বিদ্রোহী সমাজচিন্তার অগ্রদূত ডিরোজিও হিন্দুধর্মবিরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে পদচ্যুত হন, ২৬ ডিসেম্বর তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় কয়েকদিনের অসুখে। এই ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটে যায় মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে, এবং প্রত্যেকটি ঘটনার এমন প্রত্যক্ষ গভীর প্রতিক্রিয়া হয় সমাজে যে হঠাৎ যেন মুখোমুখি তরঙ্গের আঘাতে সমাজের মগ্নচৈতন্য সবেগে সজাগ হয়ে ওঠে।

সতীদাহ-নিষেধ আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হয়ে একটি সভা গঠন করেন। ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ সংস্কৃত কলেজে কলকাতার হিন্দুবাঙালী ও হিন্দুস্থানী 'সম্ভ্রান্তসমূহ' সমবেত হয়ে এই

সভার নামকরণ করেন 'ধর্মসভা'। সভার স্থাপনের দিন প্রথম কর্তব্য নির্ধারিত হয়—এই আইনের বিরুদ্ধে একটি আরজি বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। সভাস্থাপনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, গোপীমোহন দেব ও রামগোপাল মল্লিক। যদিও "এই নগর মধ্যে এবং মফঃস্বলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুইলক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন," তাহলেও সিদ্ধান্ত হয় যে সর্বসাধারণের সভায় সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়াই ভাল। প্রথম দিনের সভাতেই ২৫০০, ২০০০, ১০০০, ৫০০ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে দেন। এই সময় আর কোন প্রতিষ্ঠান বা সভাস্থাপনে একদিনে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। সনাতন হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষার নামে কলকাতার ধনিক ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী হিন্দুরা সেদিন প্রায় একডাকে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মসভার একটি শাখা ভবানীচরণের উদ্‌যোগে ভবানীপুর অঞ্চলেও স্থাপিত হয়েছিল। সতীদাহ-নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আপীল ইংরেজিভাষায় রাধাকান্ত দেব রচনা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের এক সভায় স্থির হয় যে "যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।" অর্থাৎ যাঁরা হিন্দু হয়ে সতীদাহ সমর্থন করবেন না তাঁদের সমাজচ্যুত করা হবে।[২৩]

১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন রায় স্টীমারে বিলেত যাত্রা করে ৮ এপ্রিল ১৮৩১ লিভারপুল শহরে পৌঁছান। তাঁর বিলেত যাত্রার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল 'ধর্মসভা'র আপীলের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করা এবং সেখানকার ইংরেজ সমর্থকদের সাহায্যে আপীলটি নাকচ করার ব্যবস্থা করা। আগে বলেছি যে পয়েণ্ডার, বাক্‌সটন, উইলবারফোর্স প্রমুখ সমাজসংস্কারকরা ইংলণ্ডে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। পয়েণ্ডার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের এক সভায় সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের যুক্তি-প্রমাণের কথা উল্লেখ করে আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা দেন।[২৪] এই সময় উইলবারফোর্স একটি চিঠিতে (২২ মার্চ ১৮২৭) পয়েণ্ডারকে লেখেন :

"I have long considered the conduct of our Indian Government in relation to the Burning of Widows as justly deserving of

very severe censure and I cannot but hope that ere long so foul a reproach on Christian Nation will be done away for ever."

মার্শম্যান একটি চিঠিতে লেখেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭):

"On the human nature of this practice and the ease with which it might be stopped, we have written various essays in the 'Friend of India', from which my son in 1823 selected four and a few on other subjects and published them...as these Essays contain the opinion of all of us including Dr. Carey on the subject, I scarcely think I can add anything in a letter which will be stronger. The dreadful practice prevails most in the neighbourhood of Calcutta than anywhere."

ইংলণ্ডে গিয়ে রামমোহন রায় এরকম প্রভাবশালী কয়েকজন ইংরেজের সমর্থন পেয়েছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৩২ ধর্মসভার আপীল বাতিল করা হয়। রামমোহন রায় তখন বেডফোর্ড স্কয়ারে ডেভিড হেয়ারের পরিবারের গৃহে বাস করছিলেন। আপীল বাতিল হবার পর স্বভাবতঃই পয়েণ্ডার তাঁকে খুশি হয়ে একখানি চিঠি লেখেন। উত্তরে রামমোহন রায় লেখেন:*

48 Bedford Sq.
July 14—1832

My dear Sir,

Pray accept my sincere thanks for your kind enquiry after my health and for your hearty congratulation on the protection afforded by the Privy Council to the female Community of India. Thereby they have removed the odium from our character as a people. As we can be no longer guilty of female murder, we now deserve every improvement, temporal and spiritual. I find myself perfectly well to-day and with my best Regards and thanks for your truely Christianlike treatment of me I remain.

My dear sir
Yours very faithfully & sincerely
Rammohun Roy.

* মার্শম্যান ও রামমোহন রায়ের দু'খানি অপ্রকাশিত চিঠির প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হল (লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

48 Bedford Sq
July 14 1832

My dear Sir

Pray accept my sincere thanks for your kind enquiry after my health & for your hearty congratulation on the protection afforded by the Privy Council to the female community in India whereby they have removed the odium from our character as a people. As we can be no longer guilty of female murder, we deserve every improvement temporal & spiritual. I find myself perfectly well today & with my best Regards & thanks for your truly Christian like treatment of me I remain

My dear Sir
Yours very faithfully
& sincerely
Rammohun Roy

Edinburgh, Feby 17th 1827

My dear Sir

I am favoured with your welcome letter, and rejoice that this step is taken towards removing this load of guilt from the British name in India. On the horrid nature of this practice, and the ease with which it might be stopped, we have written numerous essays in the "Friend of India" from which my Son in 1823 selected four and a few on other subjects and published them thro' Kingsbury, Parbury and Allen, Leaden hall street under the title of Essays relative to the Character and Moral Improvement of the Hindoos, and if you will kindly send a servant to their shop with this letter, they will send you a copy. As these Essays contain the united opinion of all of us including Dr Carey, on the subject I scarcely think I can add any thing in a letter which will be stronger. The dreadful practice prevails more in the neighbourhood of Calcutta than any where. Were it to be accounted murder however for any one to assist the unhappy widow in putting an end to her life, as it would certainly be in England for a man to load the pistol or adjust the rope for a man determined to destroy himself, we think that this would in a little time put an end to the practice. Hindoos

we think Government would ever be o-
bliged to hang any man. For his showing
the duty. His being seized and committed
for murder, and brought to trial and af-
terwards sentenced to imprisonment for a
time, would gradually extinguish the zeal of
any native for this dreadful practice.

It may however be important for
you and the friends of humanity with you
to arm yourselves against discouragement,
supposing the first and even expected mo-
tion should be negatived. Every attempt
will serve more and more to impress
the public mind — and ultimately you can
not fail of success. I expect to be in London
some time between the 15th and the 20th of
March, and should I be able, I would do
myself the pleasure of conversing with
you farther on the subject. I am,

My dear Sir,
Very sincerely yours,

John Poynder Esqr — J Marshman

এই চিঠি লেখার অল্পদিন পরে, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩, রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। জেরিমি বেন্থামের মতো চিন্তানায়ক, উইলবারফোর্স প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক এবং অন্যান্য অগ্রগামী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন রামমোহন ইংলণ্ডে। রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। যদি অকস্মাৎ বিদেশে তাঁর মৃত্যু না হত এবং স্বদেশে বাংলাদেশে তিনি ফিরে আসতেন, তাহলে বাংলার পরবর্তী সামাজিক জীবনধারা কোন্ পথে কিভাবে পরিচালিত হত তা বলা যায় না।

সামাজিক জীবনের আদর্শ-সংগ্রাম 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ধর্মসভা' মোটামুটি এই দুটি পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গেল ১৮৩০-৩১ সালের মধ্যে। দুটি দলেরই প্রধান কর্মকেন্দ্র হল কলকাতা শহর, আন্দোলনও হল মূলত নগর-কেন্দ্রিক। দলাদলি ও আন্দোলনের ঢেউ নাগরিক সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে যে একেবারে পৌঁছয়নি তা নয়। ঢেউ-এর খানিকটা উচ্ছ্বাস গ্রামেও পৌঁছেছিল। রামমোহনপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামে বাস করতেন—যেমন রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু বোড়ালে (দক্ষিণ ২৪-পরগণা), কালীনাথ রায় টাকীতে (২৪-পরগণা) অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়ায় (হাওড়া-হুগলি), রাজা কাশীনাথ আন্দুলে (হাওড়া)। ধর্মসভাপন্থীদের মধ্যে অনেকে কলকাতার কাছাকাছি গ্রামে বাস করতেন। কাজেই 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ধর্মসভা' দুই দলেরই আদর্শ-সংঘাতের প্রতিক্রিয়া অন্তত কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম্যজীবনে বেশ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু এই দু'টি দলেরই গড়নের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য দিল। সেটি হল সামাজিক শ্রেণীর সাদৃশ্য। 'আত্মীয় সভা' ও পরবর্তী 'ব্রাহ্মসমাজ' তখন প্রধানত সম্ভ্রান্ত বাঙালী উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 'ধর্মসভা'র মধ্যে কলকাতার ধনিক উচ্চশ্রেণীভুক্ত বাঙালীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। কলকাতার অধিকাংশ ধনকুবের বাঙালী হিন্দু 'ধর্মসভা'র সমর্থক ছিলেন। আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে বিচার করলে 'ধর্মসভা'র ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি 'ব্রাহ্মসমাজে'র তুলনায় যথেষ্ট বেশি ছিল। তাছাড়া 'ব্রাহ্মসমাজে'র পোষকদের মধ্যে সমাজভয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব-জড়িত মনোভাব প্রকাশ পেত, 'ধর্মসভা'র সভ্যদের মধ্যে তার কোন চিহ্নই ছিল না। 'ধর্মসভা'র আদর্শ বিশ্বাস ও আবেগের ভিত্তি ছিল

দৃঢ়মূল, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের মূল তখন সমাজমানসের সামান্য গভীরেও প্রবেশ করেনি। তাই সামাজিক দলাদলিতে 'ধর্মসভা'র প্রতাপ ছিল অখণ্ড, 'ব্রাহ্মসমাজ' ছিল দোদুল্যমান। যদিও 'ধর্মসভা' তখন জাতিগত ও ব্যক্তিগত (অর্থাৎ বিত্তগত) দলাদলিতে অত্যধিক মত্ত হয়ে উঠেছিল,[২৫] তা সত্ত্বেও 'ব্রাহ্মসমাজ' সেই সুযোগ গ্রহণ করে তখন নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আক্রোশের প্রচণ্ডতা রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন এবং বিদেশযাত্রার আগে আসন্ন ঝড়ের আভাসও পেয়েছিলেন। কিছুটা ঝড়ের ঝাপটা তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়কার কথা স্মরণ করে লিখেছেন:[২৬]

"তখন সমাজের প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় 'নাচ তামাশা' নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়; ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্মসভার দল সতী দগ্ধ করিবার দল।... সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন।"

রামমোহনের বিলেত যাত্রা এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হবার পর ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহ উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রধানত দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক ৬০৲-৮০৲ টাকা অর্থসাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ কোনরকমে বাতি জ্বালিয়ে ছিল বলা চলে। আর্থিক অভাবের জন্য সমাজেরও কাজকর্ম ভাল চলত না। ধনিক ব্রাহ্মরা ধর্মসভার পৃষ্ঠপোষকদের মতো সভার কাজে পর্যাপ্ত অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন। বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল কৃত্রিম, অন্তরের কোন টান ছিল না, বিশ্বাসের মূলও দৃঢ় ছিল না। তাই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যখন প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় (১৮৪০ সালের গোড়ায়) তখন তিনি দেখেন—"সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন

করিতেছেন।"[২৭] অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে তখন 'অবতারতত্ত্ব' ও 'পৌত্তলিকতা'র মাহাত্ম্য প্রচারিত হচ্ছে।

রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর দশ বছরের মধ্যে (১৮৩০-৪০) ব্রাহ্মসমাজ একেবারে মুহ্যমান হয়ে যায়। ওদিকে ধর্মসভাও বিভিন্ন গোষ্ঠীপতিদের সামাজিক দলাদলিতে এবন মত্ত হয়ে ওঠে যে তার আসল উদ্দেশ্যের অনেকটা এই মত্ততার মধ্যে হারিয়ে যায়। সামাজিক জীবনে যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয় (১৮১৫-৩০ সালের মধ্যে) তা ব্রাহ্মসমাজ-ধর্মসভার কার্যকলাপের দিক থেকে এই সময় প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। আবার নতুন আঘাত ও নতুন সামাজিক গতিসঞ্চারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে বাংলার সমাজমঞ্চে আবির্ভাব হয় 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের। নাম শুনেই বোঝা যায় এই দলভুক্ত সকলে বয়সে তরুণ ছিলেন। ১৮৩০ সালে ইয়ং বেঙ্গল দলের অগ্রগণ্যদের বয়স ছিল এই ঃ

(১৮৩০)

শিক্ষক ডিরোজিও	ঃ ২১ বছর
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ ১৭ বছর
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	ঃ ১৬ বছর
রামগোপাল ঘোষ	ঃ ১৫ বছর
রাধানাথ শিকদার	ঃ ১৭ বছর
রসিককৃষ্ণ মল্লিক	ঃ ২০ বছর

হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি ডিভিয়ান ল্যুই ডিরোজিওর ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন বলে এই তরুণ গোষ্ঠীকে 'Derozians'-ও বলা হত। এই তরুণরা সকলে কলকাতা শহরে বাস করতেন বলে কেউ কেউ তাঁদের 'ইয়ং ক্যালকাটা'ও বলতেন।

আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মসভা গঠন করে যাঁরা আগে সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবয়সী ও প্রবীণ। মধ্যবয়সীদের কর্মশক্তি যাই থাকুক, উৎসাহ ও আবেগ সাধারণত তাঁদের অনেক হিসেবী ও সংযত হয়, তাঁরা আগুপিছু বিবেচনা করে, ভালমন্দ ফলাফলের কথা চিন্তা করে কাজ করেন। তাঁরা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে পারেন না, পদে পদে

পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও হাজার রকমের হিসেবী নিষেধের বন্ধনে তাঁদের চলার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক-পা করে তাঁরা এগিয়ে চলেন, মধ্যে মধ্যে অবস্থাগতিকে দু-পা পিছিয়েও আসেন। ব্রাহ্মরা ঠিক তাই করছিলেন। কিন্তু তরুণের ধর্ম তা নয়। তরুণের বিদ্রোহ পরিপূর্ণ বিদ্রোহ, মনে হয় যেন তার কোন দিগন্তরেখা নেই। তরুণ ডিরোজীয়ানদের বিদ্রোহের প্রথম উল্লাসে ঠিক তাই মনে হয়েছিল। উনিশ শতকের তিরিশের দশক নবযুগের বাংলার তরুণদের প্রথম বিদ্রোহকাল এবং তার ফেনোচ্ছ্বসিত প্রবল প্রকাশ তিন-চার বছরের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়, যদিও চল্লিশের দশক পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউ বইতে থাকে।

হেনরি ল্যুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৮২৬-২৭ সালে, ১৭-১৮ বছর বয়সে। একটি পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিওর জন্ম হয়। মৌলআলি ও সার্কুলার রোডের সংযোগ-স্থলের কাছে ডিরোজিও পরিবারের বাস ছিল। ছেলেবেলায় ডিরোজিও লেখাপড়া শেখেন ধর্মতলায় ড্রামণ্ড নামে এক স্কচ সাহেবের বিদ্যালয়ে। ড্রামণ্ড ছিলেন সংস্কারমুক্ত, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, প্রগতিবাদী। ডিরোজিও তাঁর নিজের জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে ও চরিত্রে, গুরু ড্রামণ্ডের যোগ্য শিষ্য হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনা—"it opened up, so to speak, a new era in the annals ... college."[২৮] এটি কিশোরীচাঁদ মিত্রের উক্তি। ডিরোজি...
শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের মতো "a successful teacher of ...
আদর্শ শিক্ষক ডিরোজিও হতে পেরেছিলেন তাঁর f...
জন্য তো বটেই, নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি ও আদর্শের ·পক্ষপাতী ছিলেন, তরুণ ছিলেন বলে তরুণ ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক...ন অস্থির চঞ্চল, কাজেই তাঁদের মাথায় পাঠ্যবস্তু ঠেসে দিয়ে তিনি তা... অসংযম প্রকাশ পেত। প্রসন্নকুমার পক্ষপাতী ছিলেন না, তার পরিবর্তে ... দর্পণ', 'হরকরা' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেট' দিতেন, এবং মানুষ জীবন ও স... ...ব্যত হয়ে 'মডারেট'দের অনুগামী হতে কিশোরীচাঁদ বলেছেন: "He ... বলতেন, "We disregard all that they only words but things, ...ged in measuring our success with the heart. He sought no... *The Enquirer*)[৩১]

বিদ্রোহী তরুণদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতার অভিযোগের একটি বড় কারণ হল পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ২৭ মে ১৮৩০ ডাফ কলকাতায় আসেন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কলকাতায় এসে তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব দেখে খুব উল্লসিত হন। ডাফ লিখেছেন: "We hailed it as heralding the dawn of an auspicious era." [৩২] কিন্তু হিন্দু কলেজ ছিল তাঁর মতে "the very *beau-ideal* of a system of education without religion." কাজেই ডাফ প্রথমেই এই তরুণ ছাত্রদের মনে ধর্মভাব জাগাবার জন্য সচেষ্ট হন। এই ধর্মভাব যে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য তা বলাই বাহুল্য। ঠিক হল তাঁরা কয়েকজন মিলে এবিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। দু'মাসের মধ্যেই তিনি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। আগস্টের (১৮৩০) গোড়ার দিকে প্রথম বক্তৃতা হয়, বক্তা পাদরি হিল। গরম বক্তৃতা, যেমন জলপ্রপাতের মতো আবেগ, তেমনি খুরধার যুক্তি—বিষয়বস্তু 'সবার উপরে খ্রীস্টধর্ম সত্য।' হিল সাহেবের বক্তৃতায় কলকাতার হিন্দুসমাজের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। ডাফ সাহেবের নিজের ভাষায়, "the whole town was literally in an uproar." তাঁর ছাত্র-শিষ্য রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র ভাষায়, "that lecture fell like a bombshell among the College authorities."[৩৩] কলকাতার হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষ করে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অভিভাবকদের উপর, এই বক্তৃতার যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে ডাফ যা লিখেছেন তার মর্ম এই: "বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে হিন্দুসমাজে নানারকমের গুজব রটতে আরম্ভ করে হুলুস্থূল পড়ে যায় শহরে। হিন্দুদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয় যে খ্রীস্টান পাদরিরা যে-কোন প্রকারে হোক, ভয় বা লোভ দেখিয়ে হিন্দু তরুণদের ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত করেছেন। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সভা ডেকে হিন্দুসমাজের কর্ণধাররা আমাদের হীন চক্রান্তের কথা জনসাধারণকে বোঝাতে আরম্ভ করেন। আমাদের কবল থেকে কি উপায়ে হিন্দু তরুণদের রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদপত্রে খুব উত্তেজিত আলোচনা হতে থাকে। ছাত্রদের অভিভাবকরা হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন যে কলেজের ধর্মনীতিহীন বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই তরুণদের নৈতিক চরিত্রের স্খলন হয়েছে।"

হিন্দু কলেজের পরিচালকরা এই সময় রীতিমত ভীত হয়ে ওঠেন। ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে একদল তরুণ যে কি রকম স্বাধীনচেতা হয়ে উঠছিল, তা তাঁরা আগে থেকেই লক্ষ্য করেছেন। তার উপর ডাফের নেতৃত্বে খ্রীস্টান পাদরিরা কি ভাবে তরুণদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছিলেন তাও তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির জরুরী বৈঠক ডাকা হয় এবং বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ধর্মবিষয়ে কোন আলোচনা-সভায় বা বক্তৃতায় ছাত্ররা যোগ দিতে পারবে না।

শনিবার, ২৩ এপ্রিল ১৮৩১। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরা জরুরী সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিত থাকেন উইলসন, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ। সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে সম্পাদক বলেন: "অধ্যক্ষদের এই জরুরী সভা আহ্বান করার অন্যতম কারণ হল, এই বিদ্যালয়ের কোন একজন শিক্ষকের অদ্ভুত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে হিন্দুসমাজে আশঙ্কার সঞ্চার হচ্ছে এবং তার ফলে বিদ্যালয়েরও ক্ষতি হচ্ছে। এই শিক্ষকের উপর বহু তরুণের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তাঁর অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ছাত্রদের রুচিনীতিবোধ ক্ষুণ্ণ তো হচ্ছেই, উপরন্তু তাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমে সমাজ ও পরিবারের পক্ষে অকল্যাণ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠছে। এর মধ্যে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের প্রায় ২৫ জন ছাত্র বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছে। আরও প্রায় ১৬০ জন ছাত্র নানাবিধ অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করেছে। অতএব এ বিষয়ে অধ্যক্ষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত।"[৩৪] বলা বাহুল্য, এই শিক্ষক হলেন ডিরোজিও।

ডিরোজিওকে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। ডিরোজিও পদত্যাগ করেন, ২৫ এপ্রিল ১৮৩১। পদত্যাগের আটমাস পরে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ হঠাৎ অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর কয়েকমাস।

ডিরোজিওর পদত্যাগের পর তরুণ ছাত্ররা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। ছাত্রদের বয়স তখন ১৬ থেকে ১৮ বছর, তাঁর নিজের বয়স ২২ বছর। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে তারুণ্যের বন্ধন সংকটকালে আরও দৃঢ় হয়। তাঁরা বুঝতে

পারেন যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের চার দেয়ালের গণ্ডির মধ্যে কেবল বাক্‌যুদ্ধ করে দিন কাটালে চলবে না, নিজেদের মুখপত্রের ভিতর দিয়ে বাইরে বৃহত্তর জনসমাজে তাঁদের মতামত পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে হবে। একমাসের মধ্যেই *The Enquirer* নামে ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় (মে ১৮৩১)। ডিরোজিও নিজেও *The East Indian* নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'এনকয়ারার' পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : "Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness." আরও এক মাস পরে (জুন ১৮৩১) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশিত হয়। মানুষের জ্ঞানের তিমির হরণ করে, দয়া ও সত্যকে সংস্থাপন করে, শঠতা সংহার করে জ্ঞানের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা পত্রিকার আদর্শ।

তিরিশের গোড়া থেকেই আদর্শ-সংগ্রাম বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মুখপত্রের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। 'ধর্মসভা'র মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নয় শুধু, উদারপন্থী ও ব্রাহ্মরাও (যেমন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *The Reformer* পত্রিকা) তরুণ ডিরোজীয়ানদের কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তরুণরা ধর্মসভাকে বলতেন 'গুড়ুমসভা', যেহেতু তরুণদের বিরুদ্ধে সর্বদা তাঁরা কটূক্তির গোলাগুলি বর্ষণ করতেন।

বিদ্বৎসভার বাক্‌যুদ্ধ ক্রমে মসীযুদ্ধে পরিণত হয়। তরুণদের উত্তেজনা স্বভাবতঃই বন্ধনহীন। এই সময় উত্তেজনার চরম সীমায় পর-পর কয়েকটি নাটকীয় ঘটনাও ঘটে যায়। কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মধ্যকলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তাঁর বাড়ির পাশে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দু'জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ঘটনার তারিখ হল ২৩ আগস্ট ১৮৩১ সাল। কোন কাজে কৃষ্ণমোহন বাইরে বেরিয়েছিলেন, বাড়িতে ছিলেন না। এই সময় তাঁর বন্ধুরা তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে করতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উত্তেজনার বশে কাছে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি-গোমাংস কিনে এনে তাঁরা উল্লসিত হয়ে ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। শুধু ভক্ষণ করেই তাঁদের তৃপ্তি হয় না। ভক্ষণের শেষে উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে

গো-মাংসের হাড়গুলি তাঁরা পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করেন। গো-হাড় বলে চীৎকার করতে করতে চক্রবর্তীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা তরুণদের প্রহার করতে উদ্যত হন, অজস্র ধারায় তাদের উপর কটুবাক্য ও অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। তরুণরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। প্রতিবেশীরা ঠিক করেন যে কৃষ্ণমোহনকে বাড়িতে বা পাড়ায় আর বাস করতে দেওয়া হবে না। তাই হয়, কৃষ্ণমোহন গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিছুদিন এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিয়ে পরে চৌরঙ্গিতে একজন সাহেবের গৃহে তিনি অতিথি হন। কলকাতা শহরে কোন হিন্দুপল্লীতে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করেননি।

এই সময় কৃষ্ণমোহন ছোট একটি নাটিকা লেখেন ইংরেজিতে—*The Persecuted* or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta. নাটিকাটি তিনি উৎসর্গ করেন হিন্দু তরুণদের :

To

Hindoo Youths

The following pages are inscribed to them with sentiments of affection, and strong hopes of their appreciating those virtues and mental energies which elevate man in estimation of a philosopher.

By their ever devoted
Friend & Servant

Calcutta, 12th November, 1831. Krishna Mohana Banerjea.

ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন যে নাটকীয় উৎকৃষ্টতার দিক থেকে বিচার করলে পাঠকরা তাঁর নাটক পড়ে হতাশ হবেন। রচনাগুণের চেয়ে রচনার উদ্দেশ্যই বড় কথা। সেই উদ্দেশ্য হল, হিন্দুসমাজের কর্ণধার যাঁরা তাঁদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও অসাধুতা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা। বিশেষ করে হিন্দুসমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যে কতদূর শঠ ও ধূর্ত তা এই নাটকখানি পাঠ করলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন এবং নিজেরা সাবধানও হতে পারবেন।

এই ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে ইংরেজদের মধ্যে অনেকে তখন নাটকখানি লিখতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং দু'কপি ছ'কপি পর্যন্ত অগ্রিম কেনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

তরুণ ডিরোজীয়ানরা শুধু যে সনাতনধর্মী গোঁড়া হিন্দুদের লক্ষ্য করে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতেন তা নয়, ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদেরও কঠোর সমালোচনা করতেন তাঁদের উভয়কূল রক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টার জন্য। ব্রাহ্মরা নীতিগতভাবে পৌত্তলিকতাবিরোধী হয়েও স্বগৃহে ও পরিবারে পৌত্তলিকের মতো আচরণ করতেন। তরুণ অতিপ্রগতিবাদীদের (ultra-radicals) কাছে ব্রাহ্মদের প্রচারিত আদর্শ ও আচরণের এই অসঙ্গতি অত্যন্ত বিসদৃশ বলে মনে হত। এই কারণে তাঁরা মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম মডারেটদের আচার-ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করতেন।

তরুণ ছাত্ররা যখন সমাজসংস্কারের অত্যুৎসাহে চারিদিকে "noise and confusion" সৃষ্টি করছিলেন, তখন তাঁদের শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর হঠাৎ মৃত্যু হয় (ডিসেম্বর ১৮৩১)। তার জন্য কোলাহল থামেনি। ১৮৩২-৩৩ সালে কোলাহল আরও কিছুটা বাড়ে। এবারে উত্তেজনায় ইন্ধন যোগান দেন খ্রীস্টান পাদরিরা। ১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর খ্রীস্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় হিন্দুসমাজে, তার ফল ফলতে আরম্ভ করে ১৮৩২ সাল থেকে। হিন্দুকলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন (আগস্ট ১৮৩২)। কৃষ্ণমোহন আনন্দ প্রকাশ করে 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় লেখেন (২৮ আগস্ট ১৮৩২):[৩৬] "We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country." কয়েকমাস পরে (নভেম্বর ১৮৩২) কৃষ্ণমোহন নিজেই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তরুণ ডিরোজীয়ানদের প্রবক্তা হিসেবে কৃষ্ণমোহনের নাম প্রায় সকলেই জানতেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁকে কেন্দ্র করে কম হয়নি। 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হিসেবেও অনেকের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাঁর ধর্মান্তরের সংবাদে কলকাতার হিন্দুসমাজে আর-একবার উত্তেজনার উত্তাল জোয়ার বয়ে গেল। এই উত্তেজনা সম্বন্ধে ডাফ লিখেছেন:[৩৭]

> "These baptisms, though small in number, were in quality of inestimable value···These were the first that had ever taken place

in Eastern India among the better classes of natives who had acquired a thorough European education..."

এতদিন পর্যন্ত খ্রীস্টান পাদরিরা হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত ও অনাদৃত বর্ণের দরিদ্র অসহায় লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে তাদের 'খ্রীস্টান' করেছেন। এই 'নেটিভ খ্রীস্টানরা' অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু, এবং দরিদ্র। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আত্মাভিমানের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মনে যে চাপা অসন্তোষ ও অভিযোগ ধূমায়িত হত তার সুযোগ নিয়ে আগে ইসলামধর্ম, এবং পরে খ্রীস্টান-ধর্ম, বাঙালী হিন্দুসমাজের নিচের স্তরে প্রবেশ করে। আগে যাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দরিদ্র। খ্রীস্টানধর্মের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজধর্ম গ্রহণ করলে দারিদ্র্য দূর হতে পারে, এরকম আশাও ধর্মান্তরিতদের পক্ষে মনে মনে পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দু পরিবারে, আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে, খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরের সূচনা হল মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমোহনকে দিয়ে। তরুণ কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরে হিন্দুসমাজে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল।

হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদল, 'পাতিফিরিঙ্গি কেষ্টা বান্দা', মডারেট ব্রাহ্মগোষ্ঠী ও সনাতনধর্মী হিন্দুরা ১৮৩২-৩৩ সালে যখন প্রত্যক্ষ আদর্শসংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজ-জীবন কলরব-মুখর করে তোলেন তখন বিদেশে ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে বিলেতযাত্রার আগে রামমোহন এই আদর্শসংঘাতের প্রস্তুতি দেখে গিয়েছিলেন, এবং দু'তিন বছরের মধ্যে তার যে চরম প্রকাশ হয়, হয়ত তার কিছু-কিছু সংবাদও তাঁর কানে পৌঁচেছিল। তিনি ফিরে এলে বাংলার সামাজিক জীবনের গতি তাঁর ইচ্ছা মতো কতখানি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তা বলা যায় না। তার কারণ সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের গতি কতকটা নদীর গতির মতো, সহজে তা ভিন্নমুখী করা যায় না।

ইয়ং বেঙ্গলের আবির্ভাব ও বিদ্রোহ বাংলার সমাজ-জীবনে একটা যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ এদেশের আধুনিক কালের ইতিহাসে প্রথম তরুণ-বিদ্রোহ (Youth Revolt), প্রথম ছাত্র-বিদ্রোহ (Students' Revolt)। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে এই তরুণ

ছাত্র-বিদ্রোহের মূল কারণ "discrepancy between the family structure and the total social structure"-এর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হয়।[৩৮] আঠার শতক থেকে কলকাতার নাগরিক সমাজের একটা নতুন রূপায়ণ আরম্ভ হয়েছিল, যাকে বিত্তকেন্দ্রিক নতুন শ্রেণীবিন্যাস বলা যায়। সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত কতকটা পরিমাণে সামাজিক মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা (Social Status) ক্রমেই বিত্তমুখী হয়ে উঠছিল, অথচ শ্রেণীমধ্যস্থ বিভিন্ন পরিবারের গড়ন ও পুরাতন নীতিগত বন্ধন বিশেষ শিথিল হচ্ছিল না। সমাজ বেশ কিছুটা পরিমাণে ব্যক্তিকৃতিমুখী (Achievement-oriented) হয়ে উঠছিল, কিন্তু পরিবার তা হচ্ছিল না। পারিবারিক ও সামাজিক গড়নের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের অভাব বা বিরোধ থেকে, অবস্থান্তরের ফলে, ক্রমে পরিবারভুক্ত তরুণদের মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হতে থাকে। এই অবস্থান্তর ঘটে উনিশ শতকের তিরিশে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলন দেখা দেয়। সমাজে তরুণদের ভূমিকা ও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানী আইজেনস্টাড্‌ট বলেছেন ঃ[৩৯]

> "Most of these movements arise in societies in which a traditional social order is undermined by the impact of modern, universalistic, social, political and economic developments—either through internal developments or through the penetration of foreign European groups and interests. Significantly enough, in most of these countries the political and intellectual development has been much more advanced than the economic."

এখানে পরাধীন দেশের অবস্থা বিচার করা হয়েছে। পুরাতন ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের সঙ্গে যখন নতুন বহুমুখী বিচিত্রগামী সমাজের সংঘাত হয়, তখন তরুণদের মধ্যে এই ধরনের সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বাধীন দেশে আর্থনীতিক বিকাশের ধারা যখন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়, তখন ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে আধুনিক শিল্পসমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সেকালের সামন্তসমাজ ও পরিবারের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরাধীন দেশে—যেমন ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে বিদেশী শাসকরা এই সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন। তবে স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশের ভিতর দিয়ে পরাধীন

দেশে সামাজিক-পারিবারিক নীতিবিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না, নতুন শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানসিক বিকাশের ফলে পুরাতন-নতুনে সংঘাত হয়। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষার ফলে তরুণ ছাত্রদের যে নতুন মানসিক বিকাশ হয়েছিল তা সমকালীন ইউরোপীয় মানসিক বিকাশের সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হয় না। নবযুগের ইউরোপের সমাজদর্শন ও জীবনদর্শন তরুণ ছাত্রদের মানসলোকে যে নতুন সমাজ ও নতুন জীবনের ভাবমূর্তি (image) সৃষ্টি করেছিল, বিরোধ হয়েছিল সেই জীবন ও সমাজপ্রতিমার সঙ্গে পুরাতন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সমাজের। তরুণদের এই আদর্শ সমাজপ্রতিমা হল 'universalistic' ও 'achievement-oriented' এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সমাজ হল 'particularistic', 'ascriptive' ও 'traditional'—অর্থাৎ তরুণদের 'মডেল' সমাজ ও পরিবার তখন মনে-মনে গড়া হয়ে গিয়েছে এবং তার রূপ হল বহুমুখী ও ব্যক্তিকৃতিমুখী, পুরাতন সমাজের মতো একমুখী, পূর্বারোপিত আদর্শবদ্ধ ও ঐতিহ্যিক নয়।

আইজেনস্টাড্‌ট বলেছেন :[৪০] "A purposeful attempt usually takes place to disconnect the young people from their families, to turn them against the latter and the order they represent, and to intensify the conflict between the generations." উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ত হতে পারে, না-ও হতে পারে, তবে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপাত্র ও আদর্শপন্থীদের যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমকালীন সাময়িকপত্রে হিন্দুকলেজের ডিরোজিও-অনুরাগী ছাত্রদের অভিভাবকদের এত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধ্যানধারণা, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রাত্যহিক চালচলন কথাবার্তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে পারিবারিক বিরোধ ও বিচ্ছেদের লক্ষণটি তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ প্রত্যেকেই প্রায় একরকম নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, এবং যাঁরা তা হননি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বিরোধের যন্ত্রণা প্রতিদিন নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। মানসলোকের আদর্শ-জীবন ও আদর্শ-সমাজের সঙ্গে বাস্তব জীবন ও সমাজের এই সংঘাত ছাড়াও, তার ফলে "the conflict between the generations"-ও তীব্রতর হয়েছে।

১৮৩৪-৪৩

নবীন-প্রবীণের এই দ্বন্দ্ববিরোধের তীব্রতা তিরিশের শেষ দিক থেকে চল্লিশের মধ্যে অনেকটা কমে যায়। তারুণ্যের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের চূড়া থেকে 'ইয়ং বেঙ্গল' ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন। তারুণ্যের নভোচারী স্বপ্ন যৌবনে বাস্তবমুখী হতে থাকে। আর্থনীতিক বা রাজনৈতিক অভিযোগের সঙ্গে যেহেতু 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক ছিল না, প্রধানত মানসলোকের কতকগুলি সামাজিক ভাবমূর্তির সঙ্গে তার গভীর সংযোগ ছিল, সেইজন্যও খানিকটা তাঁদের আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হঠাৎ শীর্ষে পৌঁছে প্রচুর বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করে, দ্রুত ছোট ছোট ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ে।

মধ্যে মধ্যে পাদরিদের দু'একটি বক্তৃতা ছাড়া তখন মাঠে-ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতাদির প্রচলন হয়নি। সামাজিক বিষয় নিয়ে এরকম প্রকাশ্য সভায় বির্তক বা আলোচনা বর্তমান কালেও হয় না। জনসভার প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজনীতি। তখন সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, জীবনদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল নানারকমের বিদ্বৎসভা। নবযুগের সন্ধিক্ষণে ইংলণ্ডে ও ইউরোপে, নতুন জ্ঞানবিদ্যার আলোক বিচ্ছুরিত হবার পর সমাজে এরকম বিদ্বৎসভার পর্যাপ্ত বিকাশ হয়। বিদ্বৎসভা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু তার রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিকযুগের বিদ্বৎসভার পার্থক্য অনেক। সামাজিক ইতিহাসবিদরা বলেন :[৪১]

> "...the world had not known until the eighteenth century any societies organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds of merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers; but there had never been...anything like societies, let alone a whole network of societies, for the avowed purpose of collective thinking and talking."

স্বাধীন ব্যক্তিচিন্তার প্রাথমিক স্ফূর্তির মধ্যেই আধুনিক সভাসমিতিতে সমষ্টিচিন্তা ও বির্তকের উদ্ভব হয়। ইংলণ্ড-ইউরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায় :[৪২]

> "Closely connected with the growth of education and enlightenment among the younger generations of merchants is the creation of Literary and Philosophical Societies in the leading

mercantile towns.···societies of this type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination."

বাংলাদেশে প্রধানত আধুনিক শিক্ষিতগোষ্ঠীর দিক থেকে এই বিদ্বৎসভা গঠনের তাগিদ আসে এবং নবজাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা শহরেই সেগুলি স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররাই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রেরণা সঞ্চার করেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখেছেন :[৪৬]

> "New societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to a prodigious excess···"

তিরিশের কথা। বাস্তবিক উনিশ শতকের তিরিশে বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। কতকগুলি উল্লেখ্য সভার নাম করছি :

বঙ্গহিত সভা ১৮৩০ : ছাত্রদের সভা
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন ১৮৩০ : ছাত্রদের সভা
ডিবেটিং ক্লাব ১৮৩০ : সাধারণ সভা, চোরবাগান
বঙ্গরঞ্জিনী সভা ১৮৩০ : সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা ১৮৩৩ : সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা ১৮৩৬ : সাধারণ সভা, ঠনঠনিয়া
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ১৮৩৮ : সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র
তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৯ : প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এছাড়া ছোট ছোট আরও অনেক সভা স্থাপিত হয়েছিল। একটি দশকের মধ্যে এতগুলি বিদ্বৎসভার বিকাশ থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে বিগত শতকের তিরিশে একশ্রেণীর বাঙালীর মনের আকাশ একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আলোয় হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এই আলো স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি ও

বুদ্ধির আলো। 'ইয়ং বেঙ্গল'-গোষ্ঠী একহাতে ব্র্যাণ্ডি এবং আর-একহাতে বই নিয়ে এই আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন। বেকন, হিউম প্রমুখ মনীষীদের দার্শনিক বই ছাড়াও, টম পেইন-এর (Tom Paine) দু'খানি বিখ্যাত বই '*Rights of Man*' ও '*The Age of Reason*' তরুণদের চিন্তাবিপ্লবের খোরাক যুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি, বিশ শতকে কার্ল মার্কস-এর চিন্তাধারার প্রভাবের সঙ্গে কতকটা তার তুলনা করা যায়। ডাফ লিখেছেন যে টম পেইনের বইগুলি "were abundantly supplied" এবং আমেরিকার একজন পুস্তকব্যবসায়ী, ডাফের ভাষায়, "basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars"—কলকাতায় এক জাহাজভর্তি বই পাঠিয়ে দেন। টম পেইনের যুগান্তকারী বই দু'খানিকে ডাফ মনে করতেন "The most malignant and pestiferous of all anti-Christian publications" —কারণ টম পেইন তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে মানুষের ঈশ্বরমুখী চিন্তাধারাকে আত্মনির্ভর ও মানবমুখী করতে চেয়েছিলেন। [৪৪]

'ইয়ং বেঙ্গল' বাংলাদেশে যে নতুন সমাজমুখী ও মানবমুখী চিন্তার আলো জ্বালিয়েছিলেন, কলকাতা শহরের বহু বিদ্বৎসভায় তারই স্পর্শে একে-একে অনেক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। তিরিশের মধ্যেই কয়েকটি প্রদীপের শিখা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮) ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র (১৮৩৯) ভিতর দিয়ে। নব্যচিন্তার মূলভিত্তি ক্রমে প্রসারিত হচ্ছিল এবং তার তারুণ্যের অসংযত উদ্দামতাও ক্রমে শান্ত ও সংযত হয়ে আসছিল। তিরিশের শেষ দিক থেকে এই দুটি বিদ্বৎসভা নব্যচিন্তার এই রূপান্তরের প্রধান সহায় হয়। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা' জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও কর্মের যোগসাধনে আরও অনেকটা এগিয়ে যায়। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকটিকে বলা যায় 'তত্ত্ববোধিনীর যুগ'।

তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে—এই পাঁচজনের স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয় যে ছাত্রজীবনের পর

তরুণরা যখন বাইরের সমাজে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন আর বিশেষ বোধ করেন না, জ্ঞানের অঙ্কুরগুলি ফলফুলের গাছপালায় পরিণত হয় না। কাজেই এমন একটি বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন "which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindus and of exciting an emulation for mental excellence." সভায় সকল রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত—ভূগোল সংস্কৃতি বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিক্ষা সমাজনীতি, এমন কি রাজনীতি পর্যন্ত, কোন বিষয় বাদ যেত না।[৪৫]

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র যুগে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়বছরের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (৬ অক্টোবর ১৮৩৯)। প্রথমে নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা,' পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রস্তাবে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নাম হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দান হল রামমোহনের পর মৃতকল্প ও প্রায়বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবনদান এবং একটি বিশেষ মূলনীতির উপর 'ব্রাহ্মধর্মের' প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শুধু যদি 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রচার অথবা বেদান্ত আলোচনা 'তত্ত্ববোধিনী সভার' কাজ হত, তাহলে ১৮৩৯ সালে মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে যে সভা স্থাপিত হয়েছিল, সেই সভার সভ্যসংখ্যা ১৮৪১-৪২ সালের মধ্যে ৫০০ পর্যন্ত হত না। আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনীর সভ্যসংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত হয়।[৪৬] তত্ত্ববোধিনীতে ধর্মতত্ত্বের আলোচনারও বিশেষত্ব ছিল, গোঁড়ামির কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত না। তা থাকলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বেদ-বেদান্ত বা যে-কোন শাস্ত্রীয় বচনের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী ব্যক্তির স্থান হত না সভায়। ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও, সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হত। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির গতি থেকে বোঝা যায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি কতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আকর্ষণের কারণ, উনিশ শতকের চল্লিশ থেকে নবযুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা পূর্বদশকের বয়ঃসন্ধির চিত্তবিক্ষেপ ও বুদ্ধিবিভ্রম কাটিয়ে উঠছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডিও প্রসারিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রথম সংঘাতের ফেণোচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মনে

দেশকালপাত্রবোধ-সম্ভূত একটা আদর্শ-সমন্বয়ের ইচ্ছা জাগছিল। স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা, স্বজাতিধর্মের প্রতি বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণা, প্রাচীন ও প্রবীণের প্রতি অশ্রদ্ধা—নব্যশিক্ষিতদের এই নাস্তিবাচক মনোভাবেরও ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এই পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

সভার সঙ্গে একটি পাঠশালা স্থাপন করা হয়,'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (জুন ১৮৪০)। হিন্দুকলেজের ধর্মহীন শিক্ষার প্রতি রামমোহনের আস্থা ছিল না, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথও সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই অভাব পূরণ করার জন্য রামমোহন যে বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮২৬), তারই নবপরিকল্পনা 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ইংরেজিভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রীস্টধর্মকে পৈতৃকধর্ম বলে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি দমন করা এবং বাংলাভাষায় বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও আলোচনা করা। তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি উপায় হল এই পাঠশালা, দ্বিতীয় উপায় হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৪৩)। পাঠশালা প্রথমে কলকাতা শহরে স্থাপিত হয়, কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারে তখন ধর্মশিক্ষা ও বাংলাশিক্ষা কোনটার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, কারণ ধর্ম বা বাংলা কোনটাই অর্থকরী শিক্ষা নয়। পাঠশালা তাই কলকাতায় চলল না, বাঁশবেড়িয়া গ্রামে (হুগলি) স্থানান্তরিত হল। অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এই দু'টি বিষয়ে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বাঁশবেড়িয়া পাঠশালায় শিক্ষক নিযুক্ত হন শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ। রামগোপাল ঘোষ হন পাঠশালার পরিদর্শক। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত হন তার সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনী যুগের মধ্যমণি যদি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা যায়, তাহলে অক্ষয়কুমার দত্তকে বলা যায় তার সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পেপার-কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দুজনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে থাকে। ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি ও স্বরূপ নির্ণয় থেকে আরম্ভ করে পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি নির্বাচন পর্যন্ত ব্যাপারে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ক্রমে বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। মতামতের দিকে থেকে অক্ষয়কুমারের প্রধান সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন, পরে

সম্পাদকও হন ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার-কমিটিরও তিনি একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। দেবেন্দ্রগোষ্ঠী ও অক্ষয়গোষ্ঠীর মতামতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর যুগে শিক্ষিত বাঙালীর মননক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে।

১৮৪৩ সাল—৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন দত্ত খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ; ২০ এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' স্থাপিত হয় ; পঞ্চম আইন দ্বারা (১৮৪৩) ভারতবর্ষে দাস-কেনাবেচার প্রথা বেআইনী ঘোষিত হয় ; ১৬ আগস্ট 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ; ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১৭৬৫ শক) বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ কুড়িজন বন্ধুসহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। এগুলি বড় বড় ঘটনা এবং প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই বছরে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম বিলেত যাত্রার পর (৯ জানুয়ারি ১৮৪২) কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'র অন্যতম সভ্য, প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সমাজসংস্কারক জর্জ টমসন (George Thompson)। টমসন শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর প্রেরণায় ও ইয়ং বেঙ্গলের উদ্‌যোগে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' স্থাপিত হয়। মধুসূদন দত্তের ধর্মান্তরে বাঙালী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়, এগার বছর আগে কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরের সঙ্গে তার কতকটা তুলনা করা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনা-গোষ্ঠীর সঙ্গে খ্রীস্টান পাদরিদের প্রচণ্ড সংঘাত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা করে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হবার কয়েকমাস পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে (১৮৩৯ সাল) ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে ?"

দীক্ষা গ্রহণের সময় আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সামনে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিবেদন করেন : "যাহাতে পরিণত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের

প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।" বিদ্যাবাগীশ বলেন, "রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দীক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, "ব্রাহ্ম সমাজে এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।"

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর। 'ব্রাহ্মসমাজ' রামমোহন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি রামমোহন-প্রবর্তিত নয়, এবং এরকম কোন পৃথক ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলার পরিকল্পনা আদৌ রামমোহনের ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম মূলত ব্রাহ্মধর্ম হলেও তখন 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' নামেই তা অভিহিত হত। অবশ্য রামমোহন তাঁর রচনায় একাধিকবার 'ব্রাহ্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন। যে বিষয়প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয়, পৌত্তলিকতাবর্জিত এক ও অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনায় যাঁরা প্রবৃত্ত হবেন, ভবিষ্যতে তাঁরাই 'ব্রাহ্ম' নামে অভিহিত হবেন, এরকম একটা ধারণা হয়ত তাঁর মনে ছিল। রামমোহনের সেই ধারণাকেই দেবেন্দ্রনাথ বাস্তব রূপ দেন। আচার্য বিদ্যাবাগীশ এইজন্যই বলেছিলেন যে রামমোহনের ইচ্ছা এতদিন পরে পূর্ণ হল এবং দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আগে 'ব্রাহ্মসমাজ' ছিল, এখন 'ব্রাহ্মধর্ম' হল। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে কিছুকাল 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' কথাটি প্রচলিত ছিল। ২৮ মে ১৮৪৭ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক) 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অধিবেশনে এই নামের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি গ্রহণ করা হবে সিদ্ধান্ত করা হয়।

ব্রাহ্মধর্মে 'দীক্ষা' গ্রহণ করাকে দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার" বলেছেন। কেন বলেছেন? আগে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় যাঁরা সমবেত হতেন তাঁদেরই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী মনে করা হত। কিন্তু তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে অনেকে নিছক কৌতূহলবশে উপস্থিত হতেন, এমনকি ব্রাহ্মসমাজ-বিরোধী গোঁড়া হিন্দুরাও কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আসতেন। তাছাড়া সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন উপাসনায় কেউ যোগ দিলেই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ বা

আনুগত্য প্রকাশ পাবে এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নৈতিক বন্ধন ছিল না। সেই কারণে রামমোহনের কালে, এবং পরে তাঁর অবর্তমানে, ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত অনুবর্তীদের মধ্যে একটা নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দৌর্বল্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রচারিত ধর্মাদর্শের সঙ্গে আচরিত কর্মজীবনের, অথবা প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনের কোন সংযোগ ও সামঞ্জস্য ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্বলতা দূর করার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রবর্তন করেন এবং উদ্দেশ্য ও আচরণের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধনের জন্য কতকগুলি অবশ্যপালনীয় বিধিবিধানও রচনা করেন। এই নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে, দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে একটি 'বিশিষ্ট সমাজ' হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মধর্মীরা প্রায় একটি স্বতন্ত্র ধর্মগোষ্ঠীতে পরিণত হন। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের এই নবরূপান্তরিত পর্বের প্রচারক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও সংগঠক 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। মৃতকল্প ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

১৮৪৪-১৮৫৯

উনিশ শতকের চল্লিশে বাঙালীসমাজের একটা বড় সমস্যারূপে দেখা দিল হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিদের ব্যাপক অভিযান। তিরিশের তুলনায় চল্লিশের এই অভিযানের গুরুত্ব একাধিক কারণে অনেক বেশি। খ্রীস্টান পাদরিরা যখন দেখলেন যে ব্রাহ্মসমাজ শুধু একটি 'সমাজ' নয়, বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত একটি 'ধর্মে'র মুখসংস্থা হয়ে উঠছে, তখন তাঁরা বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিদের নিন্দাবাদের প্রধান কারণগুলি 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সংযোগে নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ যখন অপসারণের সংকল্প করেন, তখন পাদরিদের বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। ১৮৪৩ সালের রূপান্তরের পরেও ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যানের মধ্যে কতকগুলি আপাতবিরোধ ও অসঙ্গতি থেকে যায়। এই বিরোধ ও অসঙ্গতিকে সরাসরি আক্রমণ করে পাদরিরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই বাদ-প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য প্রকাশিত হয় (১৮৪৫)। বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে একদিকে ব্রাহ্মসমাজের উপকার হয় এই যে ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের ঘোলাটে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ব্রাহ্মধর্ম ছিল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রবর্তন করলেও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে যেমন তাঁর খ্রীস্টান প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বাদানুবাদ চলতে লাগল, তেমনই অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গেও মতবিরোধ দেখা দিল। দেবেন্দ্রনাথের যুক্তির প্রতিবাদ শুধু পাদরিরাই যে করতেন তা নয়, অক্ষয়কুমারের মতো ঘোর যুক্তিবাদী লেখকদের পত্রেও দেবেন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করা হত। তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'পেপার কমিটি'তে অক্ষয়-পন্থীদের সংখ্যাই ছিল বেশি, কাজেই দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এই সময় খ্রীস্টান প্রতিপক্ষদের সামলাতে গিয়ে নিজের গোষ্ঠী ও ঘর সামলানোই দায় হয়ে উঠল। দলের ভিতরে মতভেদ হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ বেদের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য আরও তিনজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠান এবং নিজেও পরে কাশীতে গিয়ে বেদ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তা সত্ত্বেও বেদবেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলাতে সময় লেগেছিল। এই সময় আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের লেখা *India and India Missions* (১৮৪০) গ্রন্থ এদেশে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে ডাফ সাহেব হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে কুৎসিত কটাক্ষ ও নিন্দাবাদ করেন। এই গ্রন্থের বক্তব্য সমর্থন করে কলকাতার অন্যান্য খ্রীস্টান পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আরও অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তার প্রতিবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[৪৭] এই ইংরেজি বাদানুবাদের মধ্যে বেদান্তকে দেবেন্দ্রনাথ 'Revelation' অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কি না ইহা সর্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।" রাজনারায়ণ বসু এখানে যে সালতারিখ নির্দেশ করেছেন তা ১৮৪৫-৪৭ হলে ঠিক হয়। তাঁর *Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj* পুস্তিকা পাঠ করলেও ব্রাহ্মদের এই বিশ্বাসের কথা জানা যায়। এই বিশ্বাস বর্জন করতে যেমন খ্রীস্টান পাদরিরা পরোক্ষে ব্রাহ্মদের সাহায্য করেন, তেমনই প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেন তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রামগোপাল ঘোষ

রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ সত্যানুরাগী যুক্তিবাদী ডিরোজীয়ানরা এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তানুরাগীরা।

১৮৪৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বেদ-উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট ব্যাখ্যা বর্জন করেন। ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক রূপান্তরে অক্ষয়কুমারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন "অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন"।[৪৮] বাস্তবিকই তাই। শিবনাথ শাস্ত্রী পরিষ্কার করে সে-কথা লিখেছেন ঃ [৪৯]

> "ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।...তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না।...সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"

১৮৪৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রথম সংকলন করেন, ১৮৪৯-৫০ সালের মধ্যে বইখানি বাংলাদেশে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়। ১৮৫১ সালের মাঘোৎসবে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বেদ-বেদান্ত ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রও নয়। স্মরণীয় ঘটনা হল, অক্ষয়কুমার তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন, অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের দানের গুরুত্ব যে কত বেশি তা এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায়।

খ্রীস্টান পাদরিদের সঙ্গে আদর্শ-সংঘাতে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবিহীন শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধেও খুব চিন্তিত হন। হিন্দু কলেজের এই শিক্ষার প্রতি রামমোহনও সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার জন্য তিনি আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল তাই। কিন্তু ডাফ সাহেবের ধর্মান্তরের অভিযান যখন হিন্দু বালক-বালিকাদের দিকেও চালিত হল, তাঁর স্কুলের চোদ্দ বছরের বালক উমেশচন্দ্র সরকার ও

তার এগারো বছরের বালিকাবধূকে যখন তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিলেন (এপ্রিল ১৮৪৫), তখন দেবেন্দ্রনাথ খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন। পাদরিদের দৃষ্টি যদি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত ধাবিত হয় তাহলে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন:[৫০] "অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রীস্টান করিতে লাগিল। তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশ হইল।" পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার লেখেন:[৫১]

> "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না। আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশে যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল।...অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতির প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।"

অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ি করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁদের অনুরোধ করেন যেন হিন্দুসন্তানদের আর তাঁরা পাদরিদের বিদ্যালয়ে না পাঠান এবং নিজেদের একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে এই সময় ধর্মসভা ব্রাহ্মসভা ও ডিরোজীয়ানগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হন। ২৫ মে ১৮৪৫ একটি বড় সভা ডাকা হয়, তাতে প্রায় একহাজার লোক উপস্থিত হন। পাদরিদের বিদ্যালয়ে যেমন বিনা বেতনে ছেলেরা পড়তে পারে, তেমনি বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলেদের শিক্ষার জন্য 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সেইদিনই চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "সেই অবধি খ্রীস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"[৫২]

১৮৪৬ সালের গোড়ায় রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি 'আত্মচরিতে' লিখেছেন:[৫৩] "যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট

ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল; কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।" এটা ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম আবির্ভাবকালের (১৮৩০-এর) প্রগতিবাদের লক্ষণ, বোঝা যায় পরবর্তী দশকে তরুণ ব্রাহ্মরাও কিছুটা প্রগতিবাদের এই উপসর্গ মেনে চলতেন। ইয়ং বেঙ্গলও সেই সময় নীতি ও আদর্শের দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁরা তখন পরিণত যুবকগোষ্ঠী, তরুণ ব্রাহ্মরা বোধহয় তাই কিছুটা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুশীলন ও প্রচারকার্যে পরে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী হন, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মসমাজের কাজও এই সময় থেকে বেড়ে যায়।

'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একটু বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন, কারণ খ্রীস্টান পাদরিদের ধর্মান্তরের অভিযান তাতে বিশেষ মন্দীভূত হয়নি। বরং কিছুদিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট একটি আইন পাস করে পাদরিদের এই অভিযানের পথ আরও সুগম করে দেন। আইনটি Lex Loci বা স্বধর্মত্যাগী এদেশী খ্রীস্টানদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারের আইন। এই আইন পাস হবার পর হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, এবং আইনের বিরুদ্ধে আবেদনও করা হয়। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর' অভিযোগ করেন যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা এই প্রতিবাদ-আন্দোলনে বিশেষ যোগদান করেননি: "এই স্থলে প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতে একত্রে লজ্জা এবং দুঃখের উদয় হইতেছে, 'লেক্সলোসি' আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের মধ্যে কেহই তাহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। কেহই এক কপর্দক সাহায্য করেন নাই।"

এর পরেই "প্রভাকর" লিখেছেন যে পাদরিদের দৌরাত্ম্য অনেক বেড়েছে এবং কিছুদিন আগে মিশনারি স্কুলে হিন্দুর ছেলেদের না পাঠানোর জন্য সভা করে যে স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল তাতে কোন ফল হয়নি। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মিশনারিদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে বলে যে অনুমান করেছিলেন তা সত্য নয়। মিশনারিদের উপদ্রব তার জন্য আদৌ কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দুসমাজে কেন মিশনারিরা ধর্মান্তরিত

করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কেনই বা হিন্দুরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ই সবিস্তারে আলোচনা করেন (১৮৫৪)।[৫৪] তত্ত্ববোধিনী বলেন যে ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে কোন ধর্মকে অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তত্ত্ববিচারে কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে প্রচারকরা মাথা ঘামান, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা চিন্তনীয় বিষয় বলে মনে করেন না। তাহলে হিন্দুদের খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি? কেউ যদি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ-প্রয়োগ অনুসন্ধান করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁকে নিবৃত্ত করা কঠিন হত না। কিন্তু সাধারণত কেউ সেভাবে খ্রীস্টান হন না। 'তত্ত্ববোধিনী'র মতে হিন্দুদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের একটি কারণ হল 'গৃহ-কলহ'। পিতামাতা বা পরিবারের কারও সঙ্গে কলহ হলে অনেকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে মিশনারিদের আশ্রয় নেন এবং মিশনারিরা যতশীঘ্র সম্ভব তাঁদের "নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন।" দ্বিতীয় কারণ হল 'দারিদ্র্য'। "স্থলবিশেষে দৈন্যদশা এতদ্দেশীয় লোকের খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের···কারণ বলিয়া অবশ্যই গণ্য করিতে হইবে।" আর একটি কারণ হল, "আমারদিগের অশেষ দোষাকর দেশাচার সমুদয়।" 'তত্ত্ববোধিনী' লিখেছেন: "ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হন, গৃহমধ্যে তাহার বিপরীত ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। একমাত্র খ্রীষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিলেই এই সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এই বিবেচনায় অনেকে তাহাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছেন।" 'কলঙ্ক ও নিগ্রহ ভয়' খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের আর একটি কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও ধর্মাচরণের বিরোধিতা করে অনেকে নিগ্রহ ও কলঙ্কের ভয়ে সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্মের আশ্রয় নেন।

হিন্দুদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের যে কারণ বিশ্লেষণ করেছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' তা তৎকালের হিন্দুসমাজ ও হিন্দুপরিবারের দিক থেকে বিচার করলে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। গৃহকলহের কারণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে তরুণ-প্রবীণে সংঘাত, অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে সেকালের প্রবীণ অভিভাবকদের মতবিরোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। 'দারিদ্র্য' একটি বড় কারণ এবং তার ফলে সাধারণত মিশনারিদের হিন্দুসমাজে নিম্নবর্ণের লোকদের ধর্মান্তরিত করার সুযোগ

হয়েছে। 'দেশাচার'ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এবং নিন্দনীয় দেশাচারের প্রতি যেমন উচ্চসমাজের শিক্ষিত তরুণদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে, তেমনি নিম্নস্তরের উপেক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসমাজে বিদ্রোহের মনোভাব জেগেছে। উভয় স্তরেই সুবর্ণসুযোগ হয়েছে মিশনারিদের খ্রীস্টধর্ম প্রচার করার। তখনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির কথা ভাবলে 'কলঙ্ক ও নিগ্রহভয়ে' দেশাচার-বিরোধীদের সমাজ-পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে স্বধর্মত্যাগী হওয়া বাস্তব সত্য বলে মনে হয়। তবে এই কারণগুলির মধ্যে 'দারিদ্র্য'ই প্রধান কারণ এবং তার জন্য বাংলার হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত বর্ণ-স্তরে বেশি ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান দেখা যায়। নদীয়া চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি জেলায় এদেশীয় খ্রীস্টানবহুল অঞ্চলের প্রত্যক্ষ সামাজিক সমীক্ষা করলে আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চল্লিশের শেষদিক থেকে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার চেতনা ও আন্দোলন কিছুটা প্রসারিত হতে থাকে। এর মধ্যে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের যে বিকাশ হয় (১৮১৭-৪৯) তা নিতান্ত নগণ্য নয়। প্রধানত তাঁদেরই উৎসাহে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সূচনা এই সময় থেকে হয়। তার আগে খ্রীস্টান মিশনারিদের উদ্‌যোগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয় এবং কতকগুলি স্কুলও স্থাপিত হয় কলকাতায়। কলকাতা শহরের বাইরে উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্‌যোগী হন (১৮৪৫)। ১৮৪৭ সালে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টি সম্ভ্রান্ত বাঙালী হিন্দুদের উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, বারাসতের স্বনামধন্য কালীকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম।

শোনা যায়, শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে বেথুন বারাসতে যান বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। কলকাতায় এরকম একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা তিনি নাকি বারাসত থেকে পান। বছর দুই পরে বেথুন কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (৭ মে ১৮৪৯)। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল', পরে ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পর নাম হয় 'বেথুন স্কুল'। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েরা এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখবে এই ছিল বেথুনের ইচ্ছা। তিনি হিন্দুসমাজের বড় বড় কর্ণধারদের

সঙ্গে এ বিষয়ে কোন সলাপরামর্শ করা প্রয়োজনবোধ করেননি, অথবা মিশনারীদের সহযোগিতা চাননি। বরং সেকালের দু'একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে এই ব্যাপারে গোড়া থেকেই স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেছিলেন, যেমন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে বেথুন বিদ্যাসাগরকে অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, বিদ্যাসাগর সম্মত হন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। দূর থেকে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যাসাগর গাড়ির গায়ে একটি শাস্ত্রবচন খোদাই করে দেন—'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'। এর অর্থ হল—"পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে।" বেথুনের এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ২১ জন ছাত্রীর মধ্যে দু'জন হলেন পণ্ডিত মদনমোহনের দুইকন্যা ভুবনবালা ও কুন্দমালা। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ছাড়া বেথুন সাহেবকে যাঁরা অকুতোভয়ে এই কাজে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইয়ং বেঙ্গলের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এতদিন পর্যন্ত কোম্পানির ডিরেক্টররা ও তাঁদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা এবিষয়ে একরকম উদাসীন ছিলেন। বেথুনের চেষ্টা সার্থক হবার পর তাঁরা এই মনোভাব পরিত্যাগ করেন। স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনও এই সময় থেকে বাংলাদেশে ক্রমে ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে থাকে।[৫৫] স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে শিক্ষিত সমাজে ও তার বাইরে রীতিমত বিতর্ক ও আলোচনা আরম্ভ হয়। ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে কেবল যে ইংরেজিশিক্ষিতরাই স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন তা নয়, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও কয়েকজন স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে নানাভাবে আন্দোলন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের কথা আগে বলেছি। আরও একজন বাঙালী পণ্ডিত উদার সমাজসংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবক্তা ছিলেন, তিনি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। পণ্ডিতদের মধ্যে আরও কেউ কেউ প্রগতিশীল সমাজচিন্তা করতেন, কিন্তু গৌরীশঙ্করের মতো নির্ভয়ে সেই চিন্তা সমাজ-জীবনে প্রয়োগ করতে আর কেউ অগ্রসর হয়েছেন কিনা সন্দেহ। রামমোহনের সহমরণ-নিবারণ আন্দোলনে গৌরীশঙ্কর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গেও তিনি নানাভাবে

সহযোগিতা করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি এই কথা উল্লেখ করে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় লেখেন (২৬ মে ১৮৪৯): "সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্নমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন ··।" এই কথা বলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্য কহিব···।" অনেকটা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপাদান দিয়ে গঠিত ছিল পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের চরিত্র।

ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে সকলের দৃষ্টি কিন্তু কুসংস্কারের কুয়াশামুক্ত ছিল না। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ইংরেজিবিদ্যায় সুশিক্ষিত, 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদ ইংরেজি রচনায় দুরন্ত ছিলেন, বেশ ভাল ইংরেজি কবিতাও লিখতে পারতেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনে তিনি গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের দলে ভিড়ে তার বিরুদ্ধে তাঁর ইংরেজি পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এবিষয়ে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের সঙ্গে কাশীপ্রসাদের রীতিমত মসীযুদ্ধ চলে।[৫৬]

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে সমাজসংস্কার আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষা কেন্দ্র করে বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। রামমোহনের সহমরণ-নিবারণ আন্দোলনের পর (১৮২৯-৩০) এরকম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন আর হয়নি। লক্ষণীয় হল, দু'টি আন্দোলনই স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—সহমরণনিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষা দুই। স্ত্রীশিক্ষার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও যে দু'টি আন্দোলন এই সময় আরম্ভ হয় (১৮৫৫-৫৬)—বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য—তাও স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করে। নবযুগের বাঙালীর সমাজসংস্কারের ধারার মধ্যে এই সঙ্গতি কি আকস্মিক, না ঐতিহাসিক, না আত্মিক? বাংলাদেশ মাতৃরূপে শক্তিসাধনার দেশ। মাতৃধ্যান, মাতৃচিন্তা ও মাতৃ-কাতরতার মধ্যে বাঙালীর আত্মিক রূপটি যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, তেমন

আর অন্য কিছুতে হয় না। 'মা' বাঙালীর মর্মমূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই দেখা যায়, সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা উভয়ক্ষেত্রেই, বাঙালী শক্তিস্বরূপা মাতৃচিন্তার উৎস থেকেই অনুপ্রাণনা আহরণ করেছে সবচেয়ে বেশি। নবযুগের বাংলার নবজাগরণের প্রথম পথিক রামমোহন রায় যে তন্ত্রশাস্ত্রানুশীলনে গভীর অনুরাগী ছিলেন এবং কুলাবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁর গুরু ছিলেন, এ শুধু তথ্যমাত্র নয়, একটি জাতীয় তত্ত্বও বটে।[৫৭] তাঁর পরবর্তীকালের যোগ্যতম উত্তরসূরী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তন্ত্রশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, এবং তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। হিন্দুসমাজের অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার ও কুসংস্কারগুলি তাই মনে হয় বাংলার মাতৃমূর্তির মালিন্যের মধ্যে সর্বাগ্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় সমাজের মানবগোষ্ঠীর উপেক্ষিত ও নির্যাতিত অর্ধাঙ্গ (স্ত্রীজাতি) যে বাঙালীকে (হিন্দু) সামাজিক কুসংস্কারমুক্তি ও অগ্রগতির আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বেথুন শুধু স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও নতুন জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, 'কালা আইন' বা 'Black Acts'-এর পরিকল্পক ও রচয়িতা হিসেবে। তখন বেথুন ছিলেন বড়লাটের আইনসচিব। ১৮৪৯ সালে তিনি আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয়-ইউরোপীয়দের পারস্পরিক বৈষম্য দূর করার জন্য চারটি আইন খসড়া করেন। আইনগুলি এই: মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয়দের অপরাধের বিচার হতে পারবে, ইউরোপীয়দের অধিকারের একটা সীমা থাকবে, বিচারের সময় জুরী নিয়োগ করা চলবে, এবং বিচারবিভাগে অফিসারদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে হবে। এই আইনগুলি যে এদেশে ইউরোপীয়দের মাত্রাহীন অধিকারবোধ এবং শাসকশ্রেণীগত ঔদ্ধত্য ও দম্ভ সংযত করার উদ্দেশ্যে রচিত তা বোঝা যায়। স্বভাবতঃই তাই ইংরেজরা এই আইনের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যবোধ থেকে এগুলিকে 'কালা আইন' বলে বাতিল করার জন্য রীতিমত আন্দোলন করতে থাকেন। এরকম প্রত্যক্ষ জাত্যভিমানের সংঘাত আগে এতটা ব্যাপকভাবে কখনও হয়নি। শ্বেতাঙ্গদের স্পর্ধার জবাব কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে রামগোপাল ঘোষ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজরা

এদেশে জাতিগত বৈষম্য ও শাসক-শাসিতের শ্রেণীগত দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যেরকম বদ্ধপরিকর হয়েছেন তাতে কি তাঁদের স্বদেশবাসীরাই খুব গৌরব বোধ করবেন ? তা মনে হয় না, বরং তাঁরা লজ্জিত হবেন—"On the contrary, will not the generous and the noble sons of Britain feel ashamed of their countrymen in India, who are anxious to perpetuate an invidious distinction, and preserve their exalted position at the expense of their native fellow subjects ?"[৫৮]

'কালা আইন' বাতিল করার জন্য ইংরেজরা যখন দলবদ্ধ হন, তখন তাঁদের প্রতিপক্ষরাও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। আগেকার জমিদারসভা বা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির লক্ষ্যসীমাও এবারে অতিক্রম করার প্রয়োজন হয়। ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয় 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন', সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিছুদিন পরে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয় (২৯ অক্টোবর ১৮৫১), সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ। একে 'ভারতবর্ষীয় সভা' বলা হত। এই সভার প্রধান বিশেষত্ব হল শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বর্জন। কাজেই এই সভাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত আমাদের দেশের প্রথম জাতীয় সভা বলা যায়। আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, দেশীয় দলগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক উদ্দেশ্যে সভায় মিলিত হন। সভা গঠনে সামাজিক শ্রেণীগত সীমানাও কিছুটা প্রসারিত হয়। আগেকার মতো শুধু উচ্চশ্রেণীর জমিদার ও ধনিকদের মধ্যে এই সভা সীমাবদ্ধ থাকে নি, তার বাইরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও এর প্রসার বিস্তৃত হয়। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সভার প্রথম পদক্ষেপ শোনা যায় 'ভারতবর্ষীয় সভা'র মধ্যে।[৫৯]

ধনিক বাঙালীরা ভারতবর্ষীয় সভার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হননি। সভার কাজকর্মে (প্রধানত আবেদন-নিবেদন) সামান্য যেটুকু রাজনীতির গন্ধ ছিল, বোঝা যায় ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে সেটুকুও তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি। ১৮৫২ সালের মধ্যে এই সভার দু'টি শাখা বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার পথে এইটাই প্রথম পদক্ষেপ।

বিদ্বৎসভা ও সমাজসংস্কার সভা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উৎসাহ

এই সময় অক্ষুণ্ণ থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভার কাজকর্ম পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকলেও, তার আলোচনা যেহেতু ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল, তাই প্রকৃত বিদ্বৎসভার দায়িত্ব তার পক্ষে পালন করা সব সময় সম্ভব হত না। ১৮৫০-এর দিকে শিক্ষিত বাঙালীরা আরও উদার ও স্বাধীন চিন্তার অনুকূল একটি বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে মেডিকাল কলেজের একটি সভায় (১১ ডিসেম্বর ১৮৫১) ডক্টর ম্যুয়ট এদেশে এই ধরনের সভা স্থাপনের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সকলের সম্মতিক্রমে স্ত্রীশিক্ষার অধিবক্তা সমাজহিতৈষী মৃত বেথুন সাহেবের স্মৃতি উদ্দেশে একটি সভা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়। সভার নাম হয় 'বেথুন সোসাইটি'। এক বছরেই (৮৫২) সোসাইটির সভ্যসংখ্যা হয় ১৩১ জন, তার মধ্যে ১০৬ জন বাঙালী। ১৮৫৭ সালের মধ্যে সভ্যসংখ্যা হয় ৩৪২ জন। শিক্ষিত বাঙালী 'এলিট'-গোষ্ঠী (Elite) অধিকাংশই এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫৯-৬০ সালের মধ্যে দেখা যায়, সভার অধিবেশনে বিশেষ সভ্য-সমাগম হয় না, নিয়মিত চাঁদাও অনেকে দেন না। তার কারণ মনে হয়, বিশুদ্ধ বিদ্যানুশীলনে (সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা) তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তেমন উৎসাহ পেতেন না এবং সভায় ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল বলে কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। পরে আলেকজাণ্ডার ডাফের সভাপতিত্বে বেথুন সোসাইটির নতুন পর্বারম্ভ হয় (১৮৫৯-৬৯)।[৬০]

বেথুন সোসাইটি ছাড়া এই সময় 'পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি' (১৮৪৭), সর্বশুভকরী সভা (১৮৫০), সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি (১৮৫৪), বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৪—৫৫) প্রভৃতি নানারকমের সভা, প্রধানত সমাজোন্নতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বড়বাজার অঞ্চলে নব্যশিক্ষিত যুবকরা 'পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি' গঠন করেন সাহিত্য চর্চা ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। গৌরদাস বসাক (মাইকেল মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু) এই সভার প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। হিন্দুকলেজের সিনিয়ার বিভাগের কয়েকজন ছাত্র কলকাতায় ঠনঠনিয়া অঞ্চলে 'সর্বশুভকরী সভা' স্থাপন করেন, প্রধান উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার। এই সভার সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার যুক্ত ছিলেন। সভার মুখপত্র ছিল 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'। প্যারীচাঁদ মিত্রের

সহোদর কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্‌যোগে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি' তাঁর কাশীপুরের গৃহে স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। সভার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র। সভার নাম থেকেই বোঝা যায়, সমাজসংস্কারই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহের উৎসাহে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপিত হয়। সভার মুখপত্র ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। সাহিত্য অনুশীলন ও সমাজসেবা ছিল সভার উদ্দেশ্য।

এই সময়কার সভাগুলির সঙ্গে প্রধানত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তরা (বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব যুগের) সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র। বিদ্যানুশীলন ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সভাগুলির সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল ও তত্ত্ববোধিনীগোষ্ঠীর প্রধানরা যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি অনুশীলনের আগ্রহ এই সমস্ত সভার ভিতর দিয়ে বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে আরও একটি আগ্রহ মনে হয় তীব্রতর হয়েছে, সেটি হল সমাজোন্নতির আগ্রহ। সমাজের অনেক সমস্যাই আগে থেকে আলোচিত হচ্ছিল, রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র কাল থেকে। যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, চিরবৈধব্য ইত্যাদি কুসংস্কার থেকে যে সামাজিক জীবন মুক্ত করার প্রয়োজন, অনেকেই তা অনুভব করছিলেন। অন্তত উন্নত চিন্তার মুখপাত্র ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তদের বেশ বড় একটা অংশ যে রীতিমত তা অনুভব করছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সভাসমিতি ও পত্রিকার আলোচনার গতি থেকে তা বোঝা যায়। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় হল, সমাজসংস্কারকর্মের প্রেরণা সঞ্চার থেকে আরম্ভ করে সংস্কারমুখী চেতনা দেশবাসীর মনে খানিকটা জাগ্রত করা এবং প্রত্যক্ষভাবে ধর্মসংস্কার, সতীদাহপ্রথা-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি দুঃসাহসিক সংস্কারকর্মে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্বযুগের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তেরই কৃতিত্ব। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে সংস্কৃতবিদ্যায় সুশিক্ষিত কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতও যে সংস্কারকর্মের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কারকর্মের এই প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থ পুরুষ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি হিন্দু-কলেজের ছাত্র ছিলেন না, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। পাঠ শেষ করার পর কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করে বিদ্যাসাগর ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেখানে সম্পাদকের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে মতভেদ হওয়ার জন্য তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৫০ সালে আবার সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন, সাহিত্যের অধ্যাপকপদে। ১৮৫১ সালে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর তিনি সংস্কার করেন। তাঁর 'Notes on the Sanscrit College' (অপ্রকাশিত) শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে একটি অত্যন্ত মূল্যবান খসড়া। এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাসংস্কারের আসল উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার রূপ নিয়েছে।[৬১] খসড়াতে প্রথমেই তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে শিক্ষার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত বাংলা সাহিত্যের সম্ভার যথাসম্ভব সমৃদ্ধ ও উন্নত করা। একাজ শুধু ইংরেজিবিদ্যায় পারদর্শীদের দ্বারা সম্ভব হবে না, কারণ পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় তাঁদের পক্ষে কিছু রচনা করা কঠিন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তাঁরাই বরং সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের রচয়িতা হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের যে শিক্ষাসংস্কার করেন তাতে এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যার সংযোগের পথ খুলে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই মিলনের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া সংস্কারক বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ কীর্তি।

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গোড়া থেকেই বিদ্যাসাগর বেথুনের অন্যতম সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। ১৮৫৪ সালে বাংলার ছোটলাট এফ. জে. হ্যালিডে বাংলাশিক্ষার প্রসারে মনোযোগী হলে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রধান সহায়ক হন। ১৮৫৭ সালের গোড়া থেকে হ্যালিডে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্‌যোগী হন তখন বিদ্যাসাগরই তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে সেই কাজে সাহায্য করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'মডেল স্কুল'

স্থাপনে বিদ্যাসাগর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি অগ্রসর হন। শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক গুরুদায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কর্তব্য পালন করেও তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্‌যোগী হন। তার জন্য তাঁকে শুধু যে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাও একজন মানুষের পক্ষে করা কঠিন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্মের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এই সময় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তার সঙ্গে বহুবিবাহ প্রতিরোধ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে একজন ব্যক্তির মধ্যে সমাজসংস্কারের উদ্দীপনা যে এমনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার কারণ তার আগে প্রায় তিরিশ বছর ধরে নানারকমের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার ভিতর দিয়ে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, অথবা বহুবিবাহ নিবারণের সংকল্প বিদ্যাসাগরের মনে অকস্মাৎ বা সর্বপ্রথম উদয় হয় নি। রামমোহন ও তাঁর 'আত্মীয়সভা', ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী 'ইয়ংবেঙ্গল', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'ব্রাহ্মসমাজ', 'ধর্মসভা', নানারকমের বিদ্বৎসভা, এবং বহু নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবে ও ক্রিয়াকর্মে নিস্তরঙ্গ বাঙালী-সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিমানসে নতুন উন্নতিশীল সমাজ গঠনের ইচ্ছা ও উৎসাহ জেগেছিল। বিদ্যাসাগর পরোক্ষে ছাত্রজীবন থেকে, এবং প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনের গোড়া থেকে এইসব নতুন সামাজিক গোষ্ঠী ও সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই পরিবর্তনশীল সামাজিক চিন্তাধারা থেকেই তিনি তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রেরণাও পেয়েছিলেন।

বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল হল বহু নারীর অকাল-বৈধব্য। সতের-আঠার শতক থেকে এইসব কুপ্রথার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমাজে দেখা দিয়েছিল। রাজা রাজবল্লভের মতো দু-একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজস্বার্থে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য দেশের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ল-কমিশনের সেক্রেটারি গ্র্যাণ্টসাহেব (J. P. Grant) হিন্দুবিধবাদের

পুনর্বিবাহের পক্ষে কোন আইন পাস করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিশিষ্ট ইংরেজ আইনজ্ঞদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ আইনজ্ঞদের প্রতিকূল মতামতে তিনি আদৌ উৎসাহিত হন নি।[৬২] ল-কমিশনের প্রচেষ্টার ফলে সমাজে এই সময় কিছু আলোচনা ও আন্দোলনও হয়েছিল। তারই উল্লেখ করে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ১৮৪২ সালে লেখেন:[৯৪] "যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতি ও বিধবার পুনর্বিবাহের বাদানুবাদ হইয়া থাকে..."

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ বা আন্দোলনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ঘটে। বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ব্রাহ্মণ ও কয়েকজন বিষয়ীলোক দলবদ্ধ হয়ে একটি বালবিধবার বিবাহ দিতে উদ্‌যোগী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার জন্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। এই পত্রে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও আরও কয়েকজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। পরে আবার এই পণ্ডিতরাই বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করেন। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের আগে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করান।[৬৩] এই সময় কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে বারাসত অঞ্চলের একদল তরুণ একটি সভা স্থাপন করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই আন্দোলন অবশ্য খুব বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। সাময়িকপত্রেও এই সময় দু'একটি বিধবাবিবাহের বিচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে।

এই সমস্ত সংবাদ ও ঘটনা থেকে বোঝা যায়, রামমোহনের আত্মীয় সভার কাল থেকে বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত বিধবাবিবাহের সমস্যা সভাকক্ষের আলোচনা থেকে ক্রমে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠছিল। এই সংস্কারকর্মের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল এবং পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে জানুয়ারি মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'—এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় মতামত উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এদেশের লোক যে কর্তব্য-অকর্তব্য শাস্ত্রবচন অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, যুক্তি বুদ্ধি বিবেক অনুযায়ী করেন না, সেকথা পুস্তিকার প্রথমেই তিনি পরিষ্কার করে লেখেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁকে ঋষিবচনও সংগ্রহ করতে হয়েছিল। শাস্ত্রবচনের সাহায্যে বিদ্যাসাগর নবযুগের বাংলার মানবমুখী যুক্তিবাদের (Humanist Rationalism) ভিত্ গঠন করেছিলেন। তার আগে একাজ রামমোহন রায় করেছিলেন সহমরণ নিবারণের উদ্দেশ্যে পুস্তিকা রচনার সময়। রামমোহনের সামাজিক আদর্শের সুযোগ্য উত্তরসাধক হলেন বিদ্যাসাগর।

সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তিকা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২০০০ কপি বই বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তী সংস্করণও ৩০০০ কপি অল্পদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগর পরে একসঙ্গে ১০,০০০ কপি বই ছাপেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক): "কয়েকবৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃ সংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারংবার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্বমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত।"

বিধবাবিবাহ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর তাঁর বিরোধীপক্ষের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ও টীকা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ খণ্ডন করেন। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্য বিধীয়তে॥" পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তাহলে এই পঞ্চপ্রকার আপদে নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়। পরাশর-বচনের বিদ্যাসাগর-কৃত এই ব্যাখ্যা ও যুক্তি খণ্ডন করে বিরোধী পণ্ডিতরা বলেন যে এখানে বিবাহিত পতির কথা বলা হয়নি, ভাবী পতির উক্ত পঞ্চপ্রকার আপদে পাত্রান্তরে কন্যাপ্রদান বিধেয়। বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যাখ্যার সমর্থনে বিরোধীপক্ষের

যুক্তি খণ্ডন করে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। তার পরেও এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ বহুদিন ধরে চলতে থাকে। চলা স্বাভাবিক। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে দেখা যায়, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল ধারার পুনরুজ্জীবনকালে, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে।

শুধু প্রচারসাহিত্যের সাহায্যে অথবা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে বিধবা-বিবাহের মতো সংস্কারকর্ম যে সফল হবে না, তা বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ জানতেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করাই তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল, শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা নয়। তাই বিধবাবিবাহের পক্ষে যাতে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা হয় তার জন্য ভারতসরকারের কাছে প্রায় ১০০০ গণ্যমান্য লোকের (৯৮৭ জন) স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র তিনি পাঠান (৪ অক্টোবর ১৮৫৫)। ব্যবস্থাপক সভায় আইনের খসড়া নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন তার পক্ষে ও বিপক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক আবেদন ও প্রতিবাদপত্র ভারতসরকারের কাছে পৌঁছয়।[৬৪] রাজা রাধাকান্ত দেব অগ্রণী হয়ে ৩৬, ৭৬৩ জন লোকের স্বাক্ষরসহ বাংলাদেশ থেকে প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র পাঠান (১৭ মার্চ ১৮৫৬)। এছাড়া নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভাটপাড়া বাঁশবেড়িয়া কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতরা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান। প্রতিবাদীদের প্রধান যুক্তি ছিল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ ; বিধবাবিবাহের প্রচলন হলে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কলহ হবে এবং তার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেবে। হিন্দুসমাজ শুধু যে ধর্মচ্যুত হবে তা নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উৎসন্নে যাবে।

বিদ্যাসাগরের সমর্থনেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র ভারতসরকারের হস্তগত হয়। কৃষ্ণনগর বর্ধমান বারাসত মুর্শিদাবাদ মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কয়েকহাজার লোক সমর্থনপত্র পাঠান। কলকাতার মিশনারীরাও অনেকে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ইয়ং বেঙ্গল বা ডিরোজীয়ানরা একটি আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত আইন সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁরা বিধবাবিবাহ যাতে 'রেজিস্ট্রেশন' করা হয় সেই মর্মে আইনটি সংশোধন করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। এই সময় রেজিস্ট্রেশনের পক্ষে আরও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা

বিদ্যাসাগর নিজেও, আইন পাস হবার পরে, বিধবাবিবাহের শোচনীয় পরিণতির করুণ অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। পরে প্রধানত ব্রাহ্মদের আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে Civil Marriage Act III পাস হয়।

অবশেষে বহু বাদানুবাদের পর ২৬ জুলাই ১৮৫৬ বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। আইনটি পাস হবার পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন—

> সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
> কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায় ॥
> মিছা-মিছি অনুষ্ঠান, মিছে কাল হরা।
> মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা ॥

বোঝা যায়, বাঙালীচরিত্রের বাক্যবিলাসকে ব্যঙ্গ করে গুপ্ত-কবি এই পদ্য রচনা করেন। তাঁর ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন যে 'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।' বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এইটাই হল বড় বৈশিষ্ট্য। 'সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?' সাধারণ বাঙালীচরিত্র সম্বন্ধে গুপ্ত-কবির পক্ষে এই প্রশ্ন করাও স্বাভাবিক। তবে যে ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে এই প্রশ্ন, বাঙালীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। বিদ্যাসাগরের প্রতিজ্ঞা ছিল পর্বতের মতো অটল, সাহসও ছিল দুর্জয়। জুলাই মাসে আইন পাস হয়, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আইনসম্মত বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই বিধবাবিবাহের প্রথম পাত্র হলেন খাটুরা গ্রামনিবাসী (২৪-পরগণা) বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা করে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিধবাবিবাহের প্রথম পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। বিবাহের দিন স্থির হয় ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬, বঙ্গাব্দ ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৩। বাংলাদেশের, এবং ভারতের, সমাজসংস্কারের ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ স্মরণীয়।

বিবাহের দিন স্বভাবতঃই কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়, এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বহুলোক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। বিবাহের অনুষ্ঠান হয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে, ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে।

বিবাহের জন্য প্রায় ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়। পণ্ডিত অধ্যাপকদের জন্য সংস্কৃত কবিতায় স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়েছিল। কলকাতার বিবাহের পরদিন পাণিহাটিতে কুলীন কায়স্থ কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছরের বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতাই কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বিধবাবিবাহ যখন বাস্তবিক ঘটতে আরম্ভ করল, মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে প্রভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের উপর অজস্রধারায় অভিসম্পাত-বর্ষণ আরম্ভ হল। কিন্তু বাধাবিপত্তি, অভিসম্পাত ও কটুবাক্যে বিচলিত হবার মতো ব্যক্তি ছিলেন না বিদ্যাসাগর। সামাজিক কর্তব্য স্থিরচিত্তে পালন করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই সময় লেখেন: "এই মহৎ ব্যাপার যে ক'এক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।"

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা-বিবাহ করেন তাঁর জ্যেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মদনমোহন বসু। কলকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর পৈতৃক বাস ছিল। ভাইদের বিধবাবিবাহের উৎসাহ তিনিই দিয়েছিলেন। তারজন্য তাঁর খুড়োমশায় লেখেন যে বোড়ালের কায়স্থকুল থেকে বসু-পরিবার তাঁর এই কীর্তির জন্য বহিষ্কৃত হন। রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করতেন এবং সেখানে বিধবাবিবাহের আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। মেদিনীপুরের লোক তাঁর ঘর পুড়িয়ে দেবার ভয়ও দেখান।

বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান এর পর থেকে একটার পর একটা ঘটতে থাকে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের উৎসাহও অনির্বাণ থাকে, যদিও বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য সেই উৎসাহের শিখা ধীরে ধীরে পরে ম্লান হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন বাংলা ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে

বিবাহ করেন। ১৮৭০-৭১ সালের কথা। এই বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে একখানি চিঠিতে লেখেন :

> "আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক ; আমি উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।...বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

চিঠিখানি নানাদিক থেকে অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক। প্রথমত এই চিঠির মধ্যে বিদ্যাসাগরচরিত্রের মূল উপাদানটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি'—এইটাই বিদ্যাসাগরচরিত্রের বড় কথা। নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত ও আবশ্যক বোধ করতেন, তাই তিনি করতেন, লোকনিন্দা অথবা আত্মীয়কুটুম্বের বিরাগের ভয়ে কখনও সঙ্কুচিত হতেন না। সমাজ ও মানুষের জন্য তিনি জীবনে যত কাজ করেছেন, তার মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রবর্তনকে সবচেয়ে মহৎ কাজ বলে তিনি মনে করতেন।[৮৫]

১৮৫৭-৫৮

বাংলার সামাজিক জীবনের এই সচলতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে, ১৮৫৭ সালের গোড়ায় দেশীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কলকাতার অনতিদূরে দমদম ব্যারাকপুর অঞ্চলে এই বিদ্রোহে অগ্নিসংযোগ হয়, এবং ক্রমে সারা উত্তরভারতে সেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবিদ্রোহ পরে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কারণে গণবিদ্রোহের আকার ধারণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের প্রেরণার মূলে সচেতন জাতীয়তাবোধ কতখানি সক্রিয় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরাও যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধান ও

বিশ্লেষণের পর এই সন্দেহ দূর করতে পারেননি। বিদ্রোহের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এই বিদ্রোহ আমাদের দেশের প্রথম 'জাতীয় বিদ্রোহ'—কেউ বলেন আদৌ তা নয়, বিদ্রোহের এই ধরনের নির্দিষ্ট রূপ বলে তখন কিছু ছিল না। আপাতত এই বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই আমাদের। তবে বিদ্রোহের স্তূপীকৃত ঘটনা ও তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করলে, এবং জাতীয়তা-বোধের ঐতিহাসিক রূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে, ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে 'জাতীয় বিদ্রোহ' বলতে দ্বিধা হয়। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে অগাধ তথ্য-সমুদ্র মন্থন করে, এবং প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন: "On the whole, it is difficult to avoid the conclusion that the so called First National War of Independence of 1857, is neither the First, nor National, nor a War of Independence."[৬৬]

বাংলাদেশ সম্বন্ধে উল্লেখ্য হল, এই বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের কণামাত্র সহানুভূতি ছিল না। কেন ছিল না, সে প্রশ্নও নিশ্চয় ঐতিহাসিকদের বিচার্য বিষয়। যদি কেউ বলেন যে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে দেশপ্রীতির অভাব ছিল বলে তাঁরা এই বিদ্রোহের স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝতে পারেননি, তাহলে তাঁর অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হয় না। রামমোহনের কাল থেকে ইয়ং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী ও বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের সমাজকর্ম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যেটুকু পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি তা থেকে অন্তত তাঁদের সমাজচেতনা ও চলমান ইতিহাসবোধ যে যথেষ্ট সজাগ ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাছাড়া আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে ভাববার আছে। 'সিপাহী বিদ্রোহ' শেষ হতে না হতে বাংলাদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং কৃষকরা শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী হলেও, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তরা দৃপ্ত-কণ্ঠে এই বিদ্রোহ ও কৃষকদের অভিযোগ সমর্থন করেন। প্রকৃত জাতীয় চেতনার প্রকাশ ও প্রসার এই সময় থেকে হয়, এবং তারপর 'জাতীয় মেলা' 'ভারত সভা' প্রভৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে 'জাতীয় সম্মিলন' ও 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার পথে ভারতের জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হয়। 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময়

যাঁদের জাতীয় চেতনা লুপ্ত অথবা সুপ্ত ছিল, তাঁদের সেই চেতনা নীল বিদ্রোহের সময়, এবং তার পরে, হঠাৎ সবলে আত্মপ্রকাশ করল, এরকম উদ্ভট ধারণা করার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় দেখা যায়, বাঙালী পরিচালিত বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকপত্রে—সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকায়—বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশিত হতে থাকে।[৬৭] অধিকাংশ রচনায় বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক রূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রোহটা যে মূলত ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উদ্ধারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট, একথা বিশেষ জোর দিয়ে বাংলা পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। অবশ্য বাংলা পত্রিকা এবং বাঙালী-পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলিও তখন হিন্দুদেরই ছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণে তাঁরা যে বিদ্রোহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ 'আবিষ্কার' করেছিলেন, তা বলা যায় না, তাছাড়া ভারতের হিন্দু সামন্তরাও অনেকে যে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন, তাও তাঁদের অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেন 'সিপাহী বিদ্রোহ'কে ভারতে মুসলমানরাজ্য পুনরুদ্ধারের একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি, সেটাও চিন্তার বিষয়। তার চেয়েও লক্ষণীয় হল, নতুন ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে পূর্বের মুসলমান রাজত্বের তুলনা করে প্রায় সকলে বলেছেন যে সেকালের মুসলমান শাসনে প্রত্যাবর্তন আধুনিক যুগ থেকে অতীতে ফিরে যাওয়ার মতোই কোন মতেই কাম্য নয়। হিন্দু সামন্তরা স্বভাবতঃই সামন্তযুগে ফিরে যেতে চান বলে তাঁরা মুসলমান শাসকদের চক্রান্তে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। বিদ্রোহের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ থেকে প্রথমে এই কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিদ্রোহের 'জাতীয় রূপে'র বদলে 'সাম্প্রদায়িক রূপ'ই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় কথা, অতীতের মুসলমান শাসিত সামন্তযুগকে শিক্ষিত হিন্দুরা ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতি বলে মনে করতেন। কোন কারণেই, এমন কি ইংরেজবর্জনের বিনিময়েও, ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌গতি নব্যশিক্ষিত হিন্দু-মধ্যবিত্তদের কাম্য ছিল না। তাঁরা অগ্রগতির সমর্থক ছিলেন, তাই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন এবং তাকে 'জাতীয় বিদ্রোহ' অথবা 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে ভাবতে পারেননি নি।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া শুধু যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল তা নয়, ব্রিটিশ আমলের নতুন জমিদারশ্রেণীও রীতিমতো সন্ত্রস্ত

হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজের শাসনস্বার্থেই এই নতুন জমিদারশ্রেণী গঠিত হয়েছিল এবং বাংলাদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হয়েছিল তার প্রধান সহায় (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই নতুন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ ইংরেজশাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে তাঁরা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় অবস্থান্তরের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। বিদ্রোহের পরেই ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি আবেদনপত্র পাঠান এবং সেই পত্রে বাংলাদেশের মতো ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ করেন:[৬৮]

> "A comparison of the loyal and the disloyal throughout the late period of the crisis will, your petitioners submit, at least show a tendency of a Permanent Settlement *to create a powerful class, who feel their interest as one with the ruling power and who are satisfied with their position.*"—*Emphasis* added.

এই নতুন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ এবং নতুন মধ্যবিত্তের স্বার্থ এক ছিল না। নতুন জমিদাররা নতুন মধ্যবিত্তদের জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তার যে আদৌ সুনজরে দেখতেন না, সে বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি (২১৫-১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কাজেই শ্রেণীস্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করলেও নতুন জমিদারশ্রেণী ও নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর 'সিপাহী বিদ্রোহ'-বিরোধিতার কারণ যে ভিন্ন ছিল, সেকথা মনে রাখা দরকার। উপরের নতুন জমিদার ও মধ্যের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী ভিন্ন দৃষ্টিতে বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও, বিদ্রোহকালে ইংরেজ শাসকদের নির্মম অমানুষিক অত্যাচার যে দেশের জনসাধারণের মনে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ইংরেজবিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের ভাব সঞ্চারিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের এই মনোভাবই পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং বাংলাদেশে 'নীলবিদ্রোহ' থেকে তার সূচনা হয়।

১৮৬০-১৯০০

১৮০০-১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ১৮৬০-১৯০০-র ধারার পার্থক্য আছে। পতিত জমি আবাদযোগ্য করে তোলা এবং তাতে বীজ বপন করার সঙ্গে প্রথম ধারাকে খানিকটা তুলনা করা যায়। দ্বিতীয়

ধারায় দেখা যায়, সেই বীজ অঙ্কুরে পরিণত হচ্ছে এবং সমাজ-জীবন ক্রমেই জটিল ও কলরবমুখর হয়ে উঠছে। রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা, ডিরোজিও ও তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁদের অনুরাগীরা উন্নতিশীল ভাবধারা ও বলিষ্ঠ সংস্কারকর্মের ভিতর দিয়ে বাংলার সমাজমানসকে উজ্জীবিত ও প্রগতিমুখী করে তুলেছিলেন। অবশ্য অবাধে করতে পারেননি, বিপরীতমুখী ঐতিহ্যিক (হিন্দু) ভাবধারার প্রতিরোধের সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছিল প্রতি পদক্ষেপে। এই দুটি ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং সংঘাতের ক্ষেত্রও ব্যাপক হয়। এই পর্বে বহু শাখা-প্রশাখায় ভাবসংঘাতের যে বিস্তার বাংলার সমাজ-জীবনে দেখা যায়, তার প্রধান ঐতিহাসিক কারণ হল—

ক। বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্রুত প্রসার, বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যশ্রেণীর (educated Bengali middle-class) বিস্তার।

খ। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী শাসকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত, এবং তার ফলে জাতীয়তাবোধের বেধবৃদ্ধি।

শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রসার প্রসঙ্গে পূর্বে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি (চতুর্থ অধ্যায়)। জাতীয় চেতনার বিকাশ প্রধানত ঐতিহ্যিক হিন্দু ভাবাশ্রয়ী (traditional Hinduism) হয়ে ওঠে—এবং তারও অন্যতম কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হিন্দুপ্রাধান্য—যার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নব্য-হিন্দুত্বের (neo-Hinduism) বেশে পুরাতন হিন্দুভাব পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন বেশ প্রবল হয়। এই আন্দোলনের প্রাবল্যের আরও একটি বড় কারণ হল, পরিণত বয়স-বুদ্ধির জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেশ বড় একটা অংশের সমাজচিন্তায় এই সময় বৈপরীত্য (contradiction) ও অসঙ্গতি দেখা দেয় (যেমন দেবেন্দ্রনাথের যুগের আদি-ব্রাহ্মদের মধ্যে), এবং নবীন যুবকগোষ্ঠী (যেমন কেশবচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী নবীন ব্রাহ্মরা) এই চিন্তা-বৈপরীত্যের বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন (যেমন ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে যায় আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান গোষ্ঠীতে), উন্নতিশীল সমাজচিন্তাকে সুসংবদ্ধ ও

সংহত করতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার জন্য শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে চিন্তাসংকট গভীর হয়, উন্নতিশীল চিন্তাধারার গতি বিপর্যস্ত ও ব্যাহত হয়, নব্য-হিন্দুভাবধারা প্রবল হয়ে ওঠে, এবং জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রিক চিন্তার তরঙ্গ অনেকটা সমাজচিন্তাকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু এই ভাবসংঘাতের ঐতিহাসিক সুফল ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর মননের ক্ষেত্রে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের কর্ষণের পর বাঙালীর মনীষা শতদলের মতো ফুটে ওঠে আধুনিক বাংলা কাব্যে, গল্প-উপন্যাস কথাসাহিত্যে, নাটকে, রঙ্গালয়ের অভিনয়ে, সঙ্গীতে ও চিত্রকলায়। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তার বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান দেন। সে-ইতিহাস স্বতন্ত্র, শুধু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া তার বিস্তারিত আলোচনা আপাতত আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ধারাবিশ্লেষণের গণ্ডিবহির্ভূত।

বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে একসময় কেশবচন্দ্র সেন 'thunderbolt of Bengal' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মনে হয় যেন ডালহৌসির আমলে যে রেলওয়ে-যুগের সূচনা হয়, সামাজিক জীবনে যে নতুন গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়, কতকটা তারই প্রতিমূর্তিরূপে কেশবচন্দ্র আবির্ভূত হন। ১৮৫৭ সালে ১৯ বছর বয়সে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৫৯ সালে তিনি স্টেজ-ম্যানেজার ও প্রযোজক হয়ে 'বিধবাবিবাহ নাটক' অভিনয় করেন, চিৎপুরে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে। বিদ্যাসাগর একাধিকবার এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। সামাজিক রঙ্গমঞ্চে, বিদ্যাসাগরের পরে, তাঁরই আদর্শের উত্তরাধিকারী রূপে, কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়।[৬৯]

১৮৫৯-৬০ থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্যন্ত 'কেশবচন্দ্রের যুগ' বলা যায়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই সময়টাকে বলা হয় 'নবোত্থানের' যুগ। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজও সূর্যমণ্ডলের ন্যায় মানবচক্ষুর গোচর হইল।" তরুণ বাংলার কণ্ঠ হলেন কেশব, এবং সে-কণ্ঠ যেমন দৃপ্ত তেমনি আবেগময়। 'বাংলার বজ্র'

ত্যাগ্রস্ত ব্রাহ্ম (কার্টুন) — বসন্তক ১২৮

কলকাতার রাস্তার শোচনীয় অবস্থা (কার্টুন) — বসন্তক ১২৮০

ষণ্ড ও ভেক (কার্টুন)—বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ?

বসন্তক ১২৮০

বলেই মনে হবার কথা। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে প্রবল বেগে কেশব "lecturer, tract-writer, reformer, missionary and philanthropist" হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মসমাজ নবজীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত হল। একসময় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯-৫৯) ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীরা পরবর্তী-কালে (১৮৫৯-৭২) অনুরূপ দায়িত্বই পালন করেন। কিন্তু কেশবের যুগের ভাবসংঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশি। এই সময়ের মধ্যে নীল-বিদ্রোহ হয়, দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ' নাটক (১৮৫৯-৬০), মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' (১৮৬১), বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১) ও বিবেকানন্দ (১৮৬৩) জন্মগ্রহণ করেন, ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিভেদের ফলে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয় (১৮৬৬), 'হিন্দু মেলার' অধিবেশন আরম্ভ হয় (১৮৬৭), প্রথম ও দ্বিতীয় অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তরুণ ব্রাহ্মদের উৎসাহে (১৮৬২ ও ১৮৬৪), তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় (১৮৭২)। শুধু এই ঘটনাগুলির সংযোগ লক্ষ্য করলে বাংলার সমাজ-জীবনে নতুন চিন্তাবর্তের বেগ ও রূপ অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। বেগ প্রবল, আবর্তও জটিল। এই বেগবান জটিল চিন্তাবর্তের মধ্যে কেশব বিশিষ্ট নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গল-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল সমাজচিন্তাকে কালোপযোগী নতুন স্তরে উত্তরণের কর্মে ব্রতী হন। কিন্তু এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের পথে কেশবের চরিত্রে ও কর্মে আদর্শগত অসঙ্গতি দেখা দিতে থাকে, তার ফলে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ও বিরোধ হয়, এবং নায়কের উচ্চাসন থেকে তিনি নামতে থাকেন। বাংলার আকাশে কেশবের উত্থান ও পতন হয় উল্কার মতো।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর তরুণ অনুগামীরা প্রথম থেকেই সংস্কারকর্মে উৎসাহী হন। ব্রাহ্মধর্মের আচার্যদের ব্রাহ্মণত্বের সনাতন প্রতীক 'উপবীত' বর্জন তাঁরা দাবি করেন, ব্রাহ্মরীতি অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহে উদ্‌যোগী হন। তার সঙ্গে বিধবাবিবাহের উদ্‌যোগ, আয়োজন, অনুষ্ঠানও পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। মনে হয় যেন বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন, এমনকি তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদেও অভিষিক্ত করেন (১৮৬২)। কিন্তু কেশবপন্থীদের সংস্কারের দাবি ক্রমে বাড়তে থাকে।

উপাসনার সময় এবং বাইরের সমাজে চলাফেরার সময় তাঁরা পুরুষ-নারীর সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দাবি করেন। কেশব নিজে আত্মীয়স্বজনের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে সস্ত্রীক কলুটোলার পৈতৃক গৃহ থেকে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যান, তাঁর আচার্যপদে অভিষেক-অনুষ্ঠানের সময় (১৮৬২)। বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার ইতিহাসে এটি স্মরণীয় ঘটনা। 'ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা' গঠন করে কেশবপন্থীরা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনায় নবীনদের প্রত্যক্ষ দায়িত্বগ্রহণ দাবি করেন। মেয়েদের জন্য 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' স্থাপিত হয় (১৮৬৫)। তার আগে 'সঙ্গত সভা'র উদ্‌যোগে নারীপ্রগতির জন্য অন্তঃপুর শিক্ষা ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬২-৬৩) প্রকাশ আরম্ভ হয়। নবীন ব্রাহ্মদের এই সব সামাজিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে বেশিদিন আপস করে চলা প্রবীণ ব্রাহ্মদের পক্ষে (দেবেন্দ্র-গোষ্ঠী) সম্ভব হয় না। কেশবের আগে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের (বিদ্যাসাগর সমর্থিত) একটি দেবেন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী ছিল। অক্ষয়-গোষ্ঠী ১৮৬৩-৬৪ সালেই দেবেন্দ্রনাথের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বতন্ত্র 'উপাসনা সমাজ' স্থাপন করেন এবং সেখানে নতুন পদ্ধতিতে উপাসনা পর্যন্ত আরম্ভ করেন। বিস্ময়কর হল, এই নতুন উপাসনাপদ্ধতি রচনায় নাকি বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন—"they began to conduct divine service according to a new form framed by themselves and revised by Pandit Iswar Chandra Vidyasagar ..."[৭০] কেশবচন্দ্রের আগে প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের, এবং অক্ষয়-গোষ্ঠী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ গঠন না করে, নিভৃতে একটি 'উপাসনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এ হল ১৮৬৩-৬৫ সালের কথা।

১৮৬৪-৬৫ সালের মধ্যে নবীন কেশবগোষ্ঠীর কার্যকলাপ এমন স্তরে পৌঁছয় যে প্রবীণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে, কেশব ও তাঁর সহকর্মীরা ব্রাহ্মধর্মের বাণী প্রচারে জয়যাত্রা করেন। ১৮৬৪ সালের মধ্যেই প্রচারের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। কেশবের তরুণ সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, অঘোরনাথ

গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল বসু, কান্তিচন্দ্র মিত্র, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু। প্রচার ও কাজের ভিতর দিয়ে কেশবগোষ্ঠী ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। নবীন ব্রাহ্মযুবকরা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে, হিন্দুধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন। সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাঁরা হিন্দু-আচার ও দেবদেবীকে মানতে চান না। তাঁদের উপর পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন চলতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :[৭১]

> "In Bengal the new ferment roused up the spirit of old Hinduism. 'Put them down, put them down,' was the cry raised everywhete by the leaders of orthodox Hinduism."

তিরিশের ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলনের সঙ্গে এই নবীন কেশবগোষ্ঠীর আন্দোলনের অনেক সাদৃশ্য আছে। তরুণ ব্রাহ্মরা উনিশ শতকের ষাট-সত্তরে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি ক্রমে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। প্রবীণদের কাণে নবীনদের এই স্বাতন্ত্র্যের সুর স্বভাবতঃই বেসুরো মনে হয়। কেশব *Struggle for Religious Independence and Progress in the Brahmo Samaj* সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন (জুলাই ১৮৬৫)। তারপর *Jesus Christ—Asia and Europe* বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা (মে ১৮৬৬) বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়। প্রবীণ ব্রাহ্মরা পর্যন্ত রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের বিচ্ছেদ হয়, কেশবগোষ্ঠী 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন (নভেম্বর ১৮৬৬)। নবগোপাল মিত্র নতুন সমাজ গঠনে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রবীণদের সমাজের নাম হয়—'আদি ব্রাহ্মসমাজ'।

এই সময় প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপনে অগ্রণী হন (১৮৬৬)। সভার অনুষ্ঠানপত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা, বাংলায় কথোপকথন ও বক্তৃতা, হিন্দুশাস্ত্রসম্মত সমাজসংস্কার, দেশীয় (হিন্দু) উৎসব-অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা, দেশীয় পোশাক পরিধান ইত্যাদির সংকল্প ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের একবছরের মধ্যে নবগোপাল মিত্র উদ্‌যোগী হয়ে 'হিন্দু মেলা' প্রবর্তন করেন ('চৈত্র মেলা' বা 'জাতীয় মেলা'ও বলা

হত)। ১৮৬৭ সালে 'হিন্দু মেলা'র প্রথম অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন : "এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা।··· একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা 'হিন্দু মেলা' ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে।"

লক্ষণীয় হল, হিন্দু মেলার প্রেরণা দেন ও প্রবর্তন করেন দু'জন কেশব-গোষ্ঠী-বিরোধী 'আদি' ব্রাহ্ম—রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিভেদকালেই 'হিন্দু মেলা' সোৎসাহে প্রবর্তিত হয়। এ শুধু আকস্মিক ঘটনাসংযোগ নয়। এই ঘটনা-পরম্পরার তাৎপর্য আছে এবং তার বিশেষ গুরুত্ব আছে সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে। নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে প্রবীণ ব্রাহ্মরা যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে একটু বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন তা তাঁদের পরবর্তী কর্মধারায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। হিন্দু মেলার মধ্যে অবশ্য শুধু হিন্দুত্বের নয়, স্বাদেশিকতার প্রেরণাও ছিল। এই স্বাদেশিকতাবোধ সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী নীলবিদ্রোহের (১৮৫৯-৬০) ফল। নীলকরদের অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতনের কথা আগে আমরা বর্ণনা করেছি (পৃষ্ঠা ৩১-৩৬)। নীলবিদ্রোহ তারই প্রতিক্রিয়া। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী ধর্মঘট করে নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নদীয়া যশোহর পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কারণ এই জেলাগুলিই ছিল নীলচাষের প্রধান কেন্দ্র। 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহী চাষীদের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' নাটকে তার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। মাইকেল মধুসূদন এই নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, রেভারেণ্ড জেমস লঙ তা প্রকাশ করেন। লঙের কারাদণ্ড হয়, হরিশচন্দ্রেরও মৃত্যু হয়—

> "নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার।
> অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হল কারাগার,
> প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

গবর্নমেন্ট যে নীল কমিশন (Indigo Commission) নিয়োগ করেন (১৮৬০)

তার সুপারিশে অবশ্য প্রজারা বিশেষ উপকৃত হয়নি। কেবল নীলকরদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা কিছুটা সংযত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ শাসকরা প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে কিছুটা নীলকরদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তরা সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, তাঁরা নীলবিদ্রোহ মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করেন। হরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, মাইকেল তাঁদের নির্ভীক মুখপাত্র হন। এই সময়ে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশও (১৮৬০) স্মরণীয় ঘটনা। রাবণ-সন্তান রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ মধুসূদনের কাব্যের নায়ক, জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণ দেশদ্রোহিতার প্রতিমূর্তি। কাব্যের প্রতিপাদ্য, সুর ও নতুন ছন্দের মধ্যে আগাগোড়াই বিদ্রোহ। সনাতন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে, গতানুগতিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেল মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। স্বাদেশিকতাবোধ, বীরত্ব ও বিদ্রোহের উজ্জীবনে এই কাব্যের দানও উপেক্ষণীয় নয়।

জাতীয়তাবোধের নবজাগরণের এই পরিবেশে 'হিন্দুমেলা'র উদ্‌ভব হয়। মেলার অনুষ্ঠানে যেমন জাতীয়তার সুর ধ্বনিত হয়—শুধু বাংলার নয়, সর্বভারতীয় জাতীয়তার—তেমনি তার হিন্দুত্বের প্রচারও বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তার ধারা যেমন পরে 'ভারত সভা' ও 'জাতীয় কংগ্রেসে'র মধ্যে হিন্দুবেশ অনেকটা ত্যাগ করে পূর্ণ রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে, তেমনি হিন্দুত্বের ধারাটিও ক্রমে প্রবল হয়ে ধর্ম ও সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনীতির মধ্যেও হিন্দুধারার মিলন-মিশ্রণ চলতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের মন এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়, যদিও দু'টি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধারা নয়, পাশাপাশি প্রবাহিত অথচ বহু শাখা-প্রশাখায় মিশ্রিত ধারা। অর্থাৎ জাতীয়তার ধারা হিন্দুত্বের পনরভ্যুত্থান-ধারার সঙ্গে বরাবরই মিশ্রিত ছিল, যেমন হিন্দুত্ব ছিল জাতীয়তার সঙ্গে।

হিন্দুধর্মের পনরুত্থান-ধারাকে বেগবান ও শক্তিশালী করেছে ব্রাহ্মসমাজে প্রবীণ-নবীনদের আদর্শবিরোধ, অন্তর্বিরোধ, বিভেদ-বিচ্ছেদ, এবং উভয় গোষ্ঠীর পরবর্তী আদর্শচ্যুতি। দেবেন্দ্র-কেশব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম যে বিচ্ছেদ হয় তার মূল কারণ, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, দুটি :[৭২]

"In reply to the Adi Brahmo Samaj cry of 'Brahmoism is Hinduism,' the young reformers cried 'Brahmoism is Catholic and

Universal,' and on the question of caste they definitely declared that its renunciation was as essential to Brahmoism as the renunciation of idolatry. These were the main issues upon which they parted."

বিচ্ছেদের পরে আদিসমাজপন্থীরা ক্রমে হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এই ঝোঁক দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল, উদার মধ্যপন্থাই তিনি শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করতেন। সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে তিনি হিন্দুত্বের সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ কাম্য বলে মনে করতেন না। দেবেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেও শিবনাথ বলেছেন:[৭৩] "Devendra Nath who has justly acquired the title of Maharshi, a great seer, from his countrymen, was essentially a Hindu in all his spiritual aims and aspirations. He ever remained so." কেশব-পন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে আদিসমাজ সামাজিক-পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান (অনুষ্ঠানপদ্ধতি)—যেমন ব্রাহ্মণের উপনয়ন, বিবাহে সপ্তপদী ইত্যাদি—হিন্দু ঘেঁষা করে সংস্কার করেন।[৭৪] নবীন ব্রাহ্মদের প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের দাবির এই প্রতিক্রিয়া তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়, হিন্দুসমাজের বিক্ষোভ প্রশমিত করার স্বার্থে। দুর্বলের নিরাপদ আত্মরক্ষা ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। আত্মসমর্পণ যে আত্মরক্ষার প্রশস্ত পথ নয়, বিভ্রান্তি বিচ্যুতি ও পরাজয়ের পথ, ক্রমেই উনিশ শতকের সত্তরের মধ্যে সামাজিক আন্দোলনের ধারায় ব্রাহ্মদের পরিণতিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীরা ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নস্তূপের উপর বিজয়-পতাকা প্রতিষ্ঠা করেন।

সমকালের সাময়িকপত্রের আলোচনায় এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্রাহ্মদের অন্যতম মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দেওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার আলোচনাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৭৫] দু-একটি নমুনা উল্লেখ করছি। 'হিন্দু সমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখা উচিত কি না?' শিরোনামে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন (২৭ মাঘ ১২৭০):

"হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সেরূপ নহে। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম। হিন্দুদিগেরও সেই আদি ধর্ম। জনক,

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন।... ফলতঃ ব্রাহ্মে ও হিন্দুতে বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ে এক জাতীয় ও এক ধর্মাবলম্বী, কেবল কিঞ্চিৎ প্রধান ভেদ এই মাত্র।"

১৮৬৭-৬৮ সাল থেকে ব্রাহ্মবিবাহ আইন-সঙ্গত করার জন্য প্রধানত কেশবপন্থীরা আন্দোলন আরম্ভ করেন। তার কারণ ব্রাহ্মবিবাহ পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দুবিবাহ নয় বলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা ব্রাহ্মবিবাহ 'অবৈধ' বলে অভিযোগ করেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা স্বীকৃত না হলে পরে নানারকমের সামাজিক ও পারিবারিক জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। তার জন্য কেশবপন্থীরা ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাস করার দাবি উত্থাপন করেন। প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে, এই বিষয় নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়। অবশেষে আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে তিন-আইনে রেজিস্টারী-বিবাহের আইন পাস হয়। ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার এই আন্দোলনের সময় আদিসমাজপন্থী ব্রাহ্মরা দীর্ঘ ও দ্রুত পদক্ষেপে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের দিকে এগিয়ে যান। রাজনারায়ণ বসু এই সময় (১৮৭২) 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা হয় ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভবনে। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণ লিখেছেন: যেদিন "বক্তৃতা করা হয়, সেদিন লোকে লোকারণ্য। বক্তৃতা করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্রোতারা পর্যন্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন।" সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মদের লক্ষ্য করে হিন্দুরা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে থাকেন—"শুনলেন তো, এবার গোবর খেয়ে আবার হিন্দু হয়ে যান।" 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা মন্তব্য করেন—"হিন্দুধর্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন।" কলকাতার সনাতন হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার মুখপাত্ররা রাজনারায়ণকে বলেন, 'হিন্দুকুলচূড়ামণি।' কেউ বলেন, রাজনারায়ণ 'কলির ব্যাসদেব'। "কলিকাতার প্রগাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বিখ্যাত শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণবাবুর একটি প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করা কর্তব্য।" সনাতনধর্মীরা তাঁকে হিন্দুসভার সভ্য হতে অনুরোধ করেন, "কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একীভূত হইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত হই" (রাজনারায়ণ)। ত্রিবেণীর কাছে আকনা গ্রামের "গাঢ় সাকারবাদী হিন্দু" দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ স্থানীয় লোকদের কাছে রাজনারায়ণ বসুর পরিচয় দিয়ে বলেন

"ইনি অন্যরূপ ব্রাহ্ম নহেন। ইনি হিন্দু ব্রাহ্ম।" 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক জেম্‌স রাটলেজ বক্তৃতার প্রশংসা করে বিলেতের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় লেখেন। প্রতিবাদ করেন বাঙালী খ্রীস্টান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। তিনি বলেন যে শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর থেকে চুন আমদানি করে হিন্দুধর্মের কলি ফেরানো হচ্ছে। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী এই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়। সমাজের স্রোত তখন সবেগে হিন্দুমুখী হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের চরিতকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন:[১৬]

> "দেশের স্রোত অন্যান্য খাত কাটিয়া বহিয়া চলিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নদী ক্রমশঃ মরা নদী হইয়া দাঁড়াইল। এই বিখ্যাত ১৮৭২ সালেই বঙ্কিমের প্রতিভার নবরবি 'বঙ্গদর্শনে'র ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। কিন্তু এই নূতন সাহিত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব ও আদর্শের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিল না। তারপরে এই নূতন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকেও দেশের স্রোত ফিরিল। ৺মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ইঁহারা 'ভারত সভা' স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। ক্রমশঃ কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্সের আরম্ভ হইল। তখন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের যুগ গিয়া স্বাদেশিকতার যুগ এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল। ক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অল্‌কট ব্লাভাটস্‌কির থিয়সফির আন্দোলন, অদৃশ্য মহাত্মা সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি গুহ্য সাধনার ব্যাপার হিন্দুধর্মের সার বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এক নূতন অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসের আন্দোলন—এই সমস্ত পরে পরে উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সমস্তের ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতা পাশ্চাত্ত্য দেশের ধর্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে খর্ব নয়, তাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।"

১৮৭০-৭২ সাল থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার সমাজজীবনের মূল ধারাগুলি এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ-বিকার ও ক্রমিক অবনতি, জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক স্বজাতি-ঐতিহ্যগৌরব, ক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের শক্তিশালী করে তোলে।

'হিন্দু ব্রাহ্ম' ছাড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে যে 'অন্যরূপ ব্রাহ্ম'রা ছিলেন, তাঁদের ব্রাহ্মত্বকে শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রই সংকটাপন্ন করে তোলেন। কেশবচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবাতিশয্য। এদিক থেকে তিনি খাঁটি বাঙালীই

ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতায় শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতেন। ১৮৬০ সালের শেষদিক থেকে কেশবের মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও অবতারভাবের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তাঁর বিখ্যাত 'Great Men' বক্তৃতার মধ্যেই (১৮৬৬) অবতারবাদের বীজ রয়েছে দেখা যায়:

"Great men are sent by God into the world to benefit mankind. They are his apostles and missionaries who bring to us glad tidings from heaven; and in order that they may effectually accomplish their errand they are endowed by him with requisite power and talents."

৮৬৮ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যদুনাথ চক্রবর্তী ও নীলকমল দেব একখানি পত্র প্রকাশ করে কেশবের অবতারভাবের প্রতিবাদ করেন: [৭৭]

"আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে কতিপয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং কেহ কেহ তাঁহার চরণধূলি লইলেন কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে এখানে এই ভারতবর্ষে তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহার মুক্তি হইবে না। তিনি একজন ঈশ্বরাবতার। ঐ সকল ব্রাহ্মের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পত্রে কেশববাবুকে 'দয়াল প্রভু' 'পাপীর গতি' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহারা কেশববাবুকে লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে পরিব্রজণ করেন।"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'সোমপ্রকাশ' কেশবের অবতারভাবের কঠোর সমালোচনা করেন, যদিও 'সোমপ্রকাশ' ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট পত্রিকা নয়। সোমপ্রকাশ লেখেন (৫ পৌষ ১২৭৫): [৭৮]

"বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণের ব্যবহারবিষয়ক বিস্তর পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। আরো অনেকগুলি দীর্ঘপত্র আমাদিগের হস্তে রহিয়াছে। এক বিষয় লইয়া অধিকতর আন্দোলন করা আমাদিগের ব্যবহারানুগত নহে। বিশেষতঃ কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বালকবৎ ব্যবহার করিতেছেন।... বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ ভালরূপে লেখাপড়া জানেন বলিয়া অভিমান করেন। আমাদিগেরও এতদিন ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য দেখিয়া এখন বিপরীত জ্ঞান জন্মিতেছে। মানুষের চরণরেণু লেহন এটি কি কৃতবিদ্যের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নহে? কৃতবিদ্যের এত নীচ কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা আগে ইহা

জানিতাম না। কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বিদ্যার অবমাননা করিবার নিমিত্ত কি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন?"

অবতারভাবোন্মাদ ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখে মুগ্ধ হন এবং ২৮ মার্চ তাঁর পরিচালিত *The Indian Mirror* পত্রিকায় সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায়, পত্রিকায় এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ প্রচারিত হয়। অতঃপর কেশব-গোষ্ঠীর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' 'ধর্মতত্ত্ব' 'সুলভ সমাচার' 'The New Dispensation' প্রভৃতি পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ-সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে।[৭৯] কেশবের খ্যাতি ও প্রতিভার দীপ্তি তখনও শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সর্বোজ্জ্বল। তাঁরা স্বভাবতঃই দক্ষিণেশ্বরমুখী হয়ে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের অকৃত্রিম মাধুর্য, তাঁর ধর্মমতের উদারতা এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের মতো অনন্য-সাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব ও সহযোগ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালীর মন সহজেই আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অবশেষে যে-কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করে 'তিন-আইন' পাস করান, সেই কেশবচন্দ্র নিজের কন্যার বিবাহ দেন কুচবিহার রাজ-পরিবারে হিন্দুমতে। ১৮৭৮ সালে বিবাহ হয়। তার ফলে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিচ্ছেদ হয় এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৭৮ মে)। কেশব-অনুরাগীরা 'নব বিধান' সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন বসু হন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র প্রথম সভাপতি, শিবচন্দ্র দেব প্রথম সম্পাদক এবং উমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম সহকারী সম্পাদক। কিন্তু তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের মরা গাঙ্গে আর জোয়ার আসে নি।* সমাজ-জীবনের স্রোত তখন অন্যান্য খাতে প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করেছে। শিবনাথ লিখেছেন:[৮০]

> "The Brahmo Samaj rose with Keshub Chunder Sen; with him, perhaps, it has gone down in public regard. I say this with great, very great regret, and with a sense of shame, that we, the standard-bearers of the new faith, have not proved quite worthy of the trust reposed in us."

---

* ব্রাহ্মসমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন কাটে। ব্রাহ্মধর্ম, হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবোধের উপাদান-মিশ্রিত 'গোরা' উপন্যাস রচনার প্রেরণা তিনি এই পরিবেশ থেকে পেয়েছেন বলে মনে হয়। ১৯০৭-৮ সালে 'প্রবাসী'তে এবং ১৯০৯-১০ সালে পুস্তকাকারে 'গোরা' প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের এই পরিণতি থেকে মনে হয়, বাঙালী চরিত্রে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও ভাবাবেগ কত গভীরে প্রসৃত। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বোধ হয় কেশবচন্দ্রই প্রথম অবতারবাদের মোহজাল নতুন করে বিস্তার করেন, যে-মোহজাল থেকে আজ পর্যন্ত, সাধারণ বাঙালী তো দূরের কথা, শিক্ষিত বাঙালীরাই মুক্ত হতে পারেন নি। কেশব-পরবর্তী কালে বড় বড় অবতারের আবির্ভাব হয়েছে বাংলাদেশে। বিশ শতকের অপরাহ্ণেও দেখা যায়, বাংলাদেশে অবতারের সংখ্যা অগণিত, এবং তাঁদের অনুচরবর্গের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুসমাজের এই অবতার-উপসর্গ সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্রহেলিকা মনে হয়। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলে এই প্রহেলিকা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দীপ্তি যখন ব্যক্তিপূজা ও অবতারবাদের রাহু গ্রাস করতে উদ্যত হল, তখন বঙ্কিমপ্রতিভার নতুন সূর্যোদয় হল বাংলার আকাশে এবং তার বর্ণচ্ছটায় শিক্ষিত বাঙালী ও ভাবুক বাঙালী যেন বিমুগ্ধ হয়ে গেল। যদিও কেশবের পরে তৎকালের তরুণদের কাছে শিবনাথ-আনন্দমোহনের ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদিতা ও উদারতার খানিকটা আকর্ষণ ছিল, তাহলেও 'বঙ্গদর্শন'-যুগের বঙ্কিমের কাছে সে-আকর্ষণ ম্লান হয়ে গেল। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন তরুণ ছাত্র। তিনি লিখেছেন :[৮১]

> "Shivanath's Brahmoism was more attractive to me than that of the Keshub··· Social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath's religion and piety."

শিবনাথ-আনন্দমোহনের ব্রাহ্মধর্ম যদিও সামাজিক ও জাতীয় মুক্তিচিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, তাহলেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা, বিচারশীল ঐতিহ্যগৌরব, পাশ্চাত্যবিদ্যা ও প্রাচবিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য (রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে সেযুগের 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' বলেছেন) এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যানুশীলনের ভিতর দিয়ে তার যুগান্তকারী রূপায়ণ খুব সহজেই বাংলার শিক্ষিত তরুণের মন ও জনমন জয় করে ফেলল। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন : "The generation of

Bengalee youths to which I belonged came, however, in more direct contact with the 'Bangadarshan' than with the 'Tatta-bodhini' School." তার কারণ বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র স্মৃতিকথায় লিখেছেন :[৮২]

"The years 1875-1878 ··saw the birth of our new Nationalism. This new Nationalism had its origin in a renaissance in Bengalee literature brought about by our contact with modern European thought··· Bankim Chandra was, in a special sense, the prophet of this renaissance··· Bankim Chandra, combining in himself the the novelist, the historian, the essayist, and the critic, was the centre and organising genius of this renaissance. The 'Bangadar-shan' School did for contemporary Bengalee thought and literature what the French Encyclopaedists did for 18th century European thought and French literature."

রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গল-তত্ত্ববোধিনী-বিদ্যাসাগরের যুগকে যদি উনিশ শতকের বাংলার প্রথম পর্বের নবজাগরণ বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগকে বলা যায় দ্বিতীয় পর্বের নবজাগরণ। দ্বিতীয় পর্বের নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আদর্শ-সমন্বয়ে গভীর স্বাজাত্যবোধের অনুরঞ্জন। এই স্বাজাত্য-বোধের একটি ধারা, অলকট-ব্লাভাটস্কি প্রমুখ পাশ্চাত্য থিয়োজফিস্টদের প্রভাবে এবং তিরিশের 'ধর্মসভা'র অন্তঃসলিলা রক্ষণশীল প্রবাহের উচ্ছ্বাসে হিন্দু-ঐতিহ্যমুখী হয়ে ওঠে। দেশের যা-কিছু সব ভাল, বিদেশের যা-কিছু সব খারাপ এবং প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আকর, এরকম একটা মনোভাব ঐতিহ্যাবদ্ধ পনরুত্থানবাদীদের মধ্যে প্রকট হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার সমর্থক ছিলেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে তিনি স্বজাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুশীলন ও পুনর্মূল্যায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) তার সাক্ষী। 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দু-সমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনা বোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত

আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।"—(আধুনিক সাহিত্য)

'বঙ্গদর্শনে'র যুগে (১৮৭২ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত বলা যায়) বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সব্যসাচী'। "সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন" (রবীন্দ্রনাথ)। জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে, সাহিত্যসৃষ্টি ও সমাজ-সংস্কারকর্মে বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধ পাশ্চাত্ত্যপন্থীদের ও অন্ধ দেশাচারপন্থীদের "ধূম এবং ভস্মরাশি" দূর করার ভার নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে তাঁর 'গঠনকার্য' চলছিল প্রখর স্বাজাত্যবোধ ও দেশ-কাল-সাপেক্ষতার ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মানবমুখী যুক্তিবাদ ও উদারতার অভিযানে—ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে। সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ব-ইতিহাস-অর্থনীতি-ভাষা—সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত অভিযান আরম্ভ হল 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে এবং তার মধ্যে যে-সুর সর্বোচ্চগ্রামে ধ্বনিত হতে থাকল, তা হল স্বাদেশিকতার সুর। এই সুরের ভাবোদ্দীপ্ত ঝংকার প্রথম শোনা গেল 'কমলাকান্তে' (১৮৭৫): "চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকা রূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।" এই সুরের গম্ভীর পরিণতি হল 'আনন্দমঠে' (১৮৮২) 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে। নবজাতীয়তাবোধ-উদ্‌ভূত এই নবজাগরণের গুরু হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'কমলাকান্তে'র দৃষ্টি দিয়ে নতুন করে আমরা চিনলাম আমাদের 'জননী জন্মভূমি'কে। 'কমলাকান্তে'র প্রকাশকালে, 'বঙ্গদর্শনের মধ্যাহ্নে, 'ভারত সভা' (Indian Association) স্থাপিত হল (২৬ জুলাই ১৮৭৬)। নীল বিদ্রোহ, হিন্দু মেলা, বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র ভিতর দিয়ে যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ও বিস্তার হচ্ছিল, তার প্রকাশ হল 'ভারত সভা' সংগঠনে। তার আগের বছর শিশিরকুমার ঘোষের উদ্‌যোগে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' (সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) স্থাপিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র এই সময় 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। বাংলার তরুণদের

মনে জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিবনাথ ও তাঁদের সহকর্মীরা সচেষ্ট হন এবং 'ছাত্রসভা' (Students' Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায় (ম্যাৎসিনি, শিবাজী, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বিষয়ে) তরুণরা উদ্‌বুদ্ধ হন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :[৮৩]

> "I felt that the political advancement of the country must depend upon the creation among our youngmen of a genuine, sober and rational interest in public affairs. The beginnings of public life must be implanted in them···. They must, on the one hand, be stirred out of their indifference to politics, which was the prevailing attitude of the student-mind in Bengal in 1875, and on the other, protected against extreme fanatical views which, as all history shows, are fraught with peril in their pursuit. I was resolved, so far as it lay in me, to foster a new spirit and to produce a new atmosphere. This was the underlying idea that prompted me to help in the organization of the Students' Association."

'ভারত সভার' ভিতর দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক আদর্শ সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অগ্রসর হন। 'ভারত সভা' দেশের একটি বড় রাজনৈতিক অভাব পূরণ করে। দেশের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি-স্থানীয় কোন রাজনৈতিক সংস্থা এতদিন পর্যন্ত ছিল না। "British Indian Associalion" বা "ভারতবর্ষীয় সভা" ছিল মুখ্যত উচ্চশ্রেণীর ও জমিদারদের সভা এবং তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন (পৃষ্ঠা ২১৫-১৭ দ্রষ্টব্য)। 'ভারত সভা' রাজনীতিক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :[৮৪]

> "The Indian Association supplied a real need. It soon focussed the public spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of the educated community of Bengal."

ইটালির ম্যাৎসিনি হলেন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শের প্রেরণাদাতা :[৮৫]

"Mazzini had taught Italian unity. We wanted Indian unity. Mazzini had worked through the young. I wanted the young men of Bengal to realize their potentialities and to qualify themselves to work for the salvation of their country…."

'ভারত সভা' প্রথমে 'সিবিল সার্ভিস' পরীক্ষায় ভারতীয় প্রতিযোগীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করে। লালমোহন ঘোষ সভার মুখপাত্র হয়ে বিলেত যান। সমগ্র উত্তরভারত, পশ্চিমভারত ও দক্ষিণভারত সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবির কথা প্রচার করে জনচিত্তে বিপুল সাড়া জাগান। 'ভারত সভা' হয় 'জাতীয় কংগ্রেসে'র অগ্রদূত।

মধ্যবিত্ত-পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্রে ব্রিটিশ কুশাসনের সমালোচনা এই সময় তীব্রতর হতে থাকে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য Vernacular Press Act (১৪ মার্চ ১৮৭৮) পাস করা হয়, ভারতীয়দের নিরস্ত্র করার জন্য Arms Act-ও বিধিবদ্ধ হয়। তার ফলে মধ্যবিত্তের জাতীয় চেতনা আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। জনমত গঠন ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে ভারত সভার দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। ১৮৭৯ সালে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে (পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ) সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন।

১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিলের (Ilbert Bill) আন্দোলন আরম্ভ হয়। রিপনের নির্দেশে তাঁর আইনসচিব ইলবার্ট বিচারবিভাগে ভারতীয়-ইংরেজের বর্ণবৈষম্যজনিত অধিকারভেদ দূর করার জন্য এই আইনের খসড়া করেন। ভারতের বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কবি হেমচন্দ্র এই সময় লেখেন :

"গেল রাজ্য, গেল মান, হাঁকিল ইংলিশম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রানশন কেস্তরিক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া, 'নেভার—নেভার'।"

বিচারপতি নরিস হাইকোর্টে শালগ্রাম শিলা আনিয়ে এক মকদ্দমার বিচার করেন বলে বিভিন্ন পত্রিকায় সমালোচনা করা হয়, সুরেন্দ্রনাথও সমালোচনা

করেন। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয় (মে ১৮৮৩)। তার ফলে জনসমাজে বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, তরুণ ছাত্রসমাজ স্বভাবতঃই তার শীর্ষে থাকেন। এই ছাত্রবিক্ষোভ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন।[৮৬]

> "In the demonstration that followed the passing of the sentence they took a leading part in a fashion common among young men all over the world, smashing windows and pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Ashutosh Mukherjea..."

বিক্ষুব্ধ 'rowdy' ছাত্রদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও একজন ছিলেন।

ইলবার্ট বিল ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আন্দোলনের ফলে (১৮৮২-৮৩) সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা আরও ব্যাপক ও গভীর হয়। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় এবং তাঁর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দেশবাসীর মর্মস্থল পর্যন্ত স্বজাতি অনুরাগে রঞ্জিত করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠকাল থেকে বিশ শতকের গোড়ায় 'স্বদেশী আন্দোলনে'র অভ্যুত্থান পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' হয় দেশাত্মবোধের উদ্‌বোধন ধ্বনি, পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই ধ্বনির মাহাত্ম্য এতটুকু ম্লান হয়নি। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও আজ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'। 'বন্দে মাতরম্' প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :[৮৭]

> "The cry, at one time banned and barred and suppressed, has become pan-Indian and national, and is on the lips of an educated Indian when on any public occasion he is moved by patriotic fervour to give expression to his feelings of joy... Its stately diction, its fine musical rhythm, its earnest patriotism, have raised it to the status and dignity of a national song···"

১৮৮২-৮৩ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায়। এর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভারত সভার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হয়। সুরেন্দ্রনাথ কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে এসে তাঁর সহকর্মীদের প্রস্তাবে, ভারত সভার আনুকূল্যে, কলকাতায় একটি 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'

লীগ ও ভারতবর্ষীয় সভার বিবাদ (কার্টুন) বঙ্গদূত ১২৮০

খড়দহ ঘাটের শিবমন্দির

বিসর্জন

সলভিন্‌স
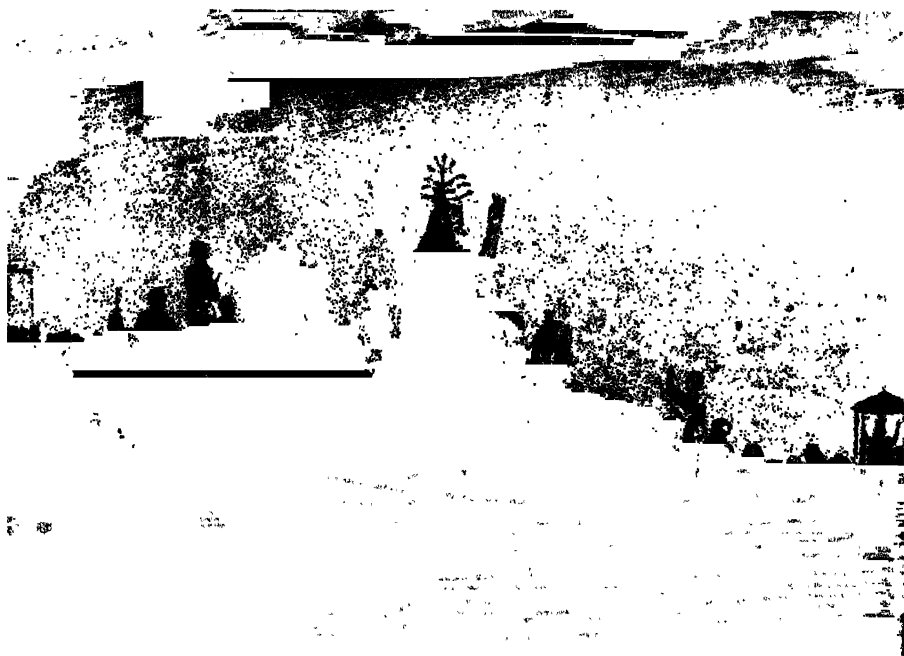
আহ্বান করেন (ডিসেম্বর ১৮৮৩)। ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৩ কলকাতায় 'অ্যালবার্ট হলে' অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় ভারত ভ্রমণ করে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আহ্বান জানান (১৮৮৪)। ২৫, ২৬, ২৭, ডিসেম্বর ১৮৮৫ কলকতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে 'জাতীয় সম্মেলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন, ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ন ও মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনও যোগ দেন। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ বোম্বাই শহরে ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশনে যদিও সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহলেও বাংলার বিশিষ্ট নেতারা (সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ) কেউ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। তার কারণ বোম্বাই-এর কংগ্রেসের প্রথম উদ্যোক্তারা যতটা ইংরেজ রাজানুগত্যের ছায়ায় থেকে রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া-অভিযোগ জ্ঞাপন করতে চেয়েছিলেন, বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন-শিশিরকুমার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঠিক ততটা ছায়ার নিচে থাকতে চাননি। মনে হয় এই কারণেই তাঁদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায় (১৮৮৬), সভাপতি হন দাদাভাই নৌরজী। রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন-মতিলাল সকলে অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনের নিখুঁত বিবরণ দিয়ে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :[৮৮]

> "জাতীয় সভার সৃষ্টি দিবসে বোম্বাই নগরে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাতীয় সভার দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা মহানগরীতে যে অপূর্ব দৃশ্য ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বোম্বাই সভা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যাহা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, গত ২৬শে ডিসেম্বরের রাত্রি প্রভাত হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে স্বপ্ন নহে প্রকৃত ঘটনা। কলিকাতার রাজপথ ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিতে পরিপূর্ণ, ঘোর কলরবে দিগদিগন্তর প্রকম্পিত ; লক্ষ লক্ষ ধনী মানী দরিদ্র, রাজা প্রজায় রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন, শকটে শকটে কলিকাতার বক্ষ প্রকম্পিত হইতেছে, আশায় উৎসাহে প্রফুল্ল নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে, প্রাণের আবেগে ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজা কোন্ ঐশী বলে বলীয়ান হইয়া একযোগে, এক পন্থার পথিক হইয়া যেন কোন অপূর্ব জগতে গমন করিতেছেন।..."

প্রত্যক্ষদর্শী 'সোমপ্রকাশ'-প্রতিনিধির এই বিবরণ থেকে বাংলাদেশে কলকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে জনসমাজে যে বিপুল

উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায়, এবং বোঝা যায় বোম্বাই-এর সঙ্গে কলকাতার স্বাদেশিকতামুখী সামাজিক পরিবেশের পার্থক্য কত। কিন্তু কংগ্রেস-রাজনীতির তাৎকালিক লক্ষ্য 'সোমপ্রকাশে'র এই বিবরণের কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন—"পার্সী জাতির শিরোমণি মিঃ দাদাভাই নাওরাজী জাতীয় সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন··· এই মহাত্মা জাতীয় সভার উচ্চতম আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমেই রাজভক্তির চূড়ান্তভাব প্রকাশ করিলেন।" "যে সকল মুসলমান জাতীয় কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন নাই নবাব রেজা আলি তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বলিলেন ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে কেবল এই কয়েকজন লোক ভিন্ন কন্‌গ্রেস সভায় কাহারও বিরূপ দৃষ্টি নাই।" "কন্‌গ্রেসের সকল সভ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে ভারতবাসী ইংরাজকে রাজ্য দিয়া সুখী হইয়াছেন।"

পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীনতার কথা তখনও চিন্তা করতে পারেন নি। দেশের উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর উর্ধ্বস্তরের মধ্যেই তখন কংগ্রেস গণ্ডিবদ্ধ ছিল এবং ব্রিটিশ শাসকদের কাছে, প্রধানত আবেদন-নিবেদনের ভিতর দিয়ে, তাঁরা শ্রেণীস্বার্থের আংশিক চরিতার্থতার জন্যই প্রথমে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে আমাদের জাতীয় আন্দোলন গণ-আন্দোলন ও পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্যের পথে পৌঁছেচে প্রায় বিশ শতকের তিরিশে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেও কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এবং বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গবিভাগের (১৯০৫) ফলে জাতীয়তাবোধের এক বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাংলাদেশ থেকে সর্বভারতে উৎসারিত হয়।[৮৯]

জাতীয় আন্দোলনের এই ধারার পাশে সামাজিক আন্দোলনের যে-ধারাটি প্রবলবেগে বাংলাদেশে বইছিল, সে-সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন:[৯০] "Practically the whole decade, 1880 to 1890, was marked by a strong current of religious revival

and social reaction, which positively set back the movement of progress not only in Bengal but all over India." এই সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ধারার প্রবাহ শক্তিশালী করেছে "the revival of mediaevalism in the Brahmo Samaj itself" এবং থিয়োজফিকাল সোসাইটির আন্দোলন—"which··· was perhaps the most powerful of the forces that brought in this movement of Hindu religious revival and social reaction." (বিপিনচন্দ্র)।[৯১] ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব কিভাবে ক্রমে ম্লান হয়ে গেল, ১৮৭০-এর দশকের মধ্যে, সে কথা আগে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের শেষ জ্যোতিটুকুও নিভে গেল। পৌরাণিক অবতার-বাদের মোহাচ্ছন্নতা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাটল না, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মাহাত্ম্য প্রচার করেই প্রায় তাঁর বাকি জীবনটা কেটে গেল। অন্যদিকে প্রবীণ ব্রাহ্মদলের অন্যতম মুখপাত্র রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদনের পর (১৮৭২-৭৩) 'মহা হিন্দু সমিতি' প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। 'জাতিভেদ' সম্বন্ধেও তাঁর মতামত প্রায় সনাতন হিন্দুপন্থী হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বলেন :[৯২] "জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্বক লোক সমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে; দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোকসমাজের উপকার সাধন করে।" জাতিভেদের সমর্থনে রাজনারায়ণ সুজনবিদ্যার (Eugenics) সাহায্য নিয়েছেন। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'র (১৮৮৬-৮৭) মধ্যে তিনি মহা হিন্দুসমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন :[৯৩]

> "মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Eurasian and Anglo-Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দুদিগের আছে। হিন্দুদিগের ধর্মসম্বন্ধ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্যে হইবে।···

হিন্দুজাতির উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা যদি ধর্মমূলক না করিয়া সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে বুনিয়াদশূন্য ও গাঁথুনিশূন্য আল্‌গা ইটকের বাড়ী যেমন প্রবল বায়ুর প্রথম ঝটিকাতে পড়িয়া যায়, তেমনি সভা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য মহা হিন্দু সমিতিকে ধর্মমূলক করা হইয়াছে। এইজন্য এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের স্তব করিয়া সভা আরম্ভ হইবে এবং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, কারণ ভারত মাতার হিতার্থ একত্রিত হওয়া অপেক্ষা কোন্ ধর্মক্রিয়া শ্রেষ্ঠতর?"

লক্ষণীয় হল, রাজনারায়ণ বসু এই 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ব্যক্ত করেন কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন-কালে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' রাজনারায়ণের প্রস্তাব সমর্থন করে লেখেন (কার্তিক ১৮০৮ শক, ১৮৮৬): "এখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বলে আমাদের অনেক উৎকর্ষ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক।...এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভা সমিতি বা যে কোন উপায়েই হোক যিনি এই হিন্দু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম রীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক এদেশের একজন পরম বন্ধু।" রাজনারায়ণ ও তত্ত্ববোধিনীর 'হিন্দু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম রীতি রক্ষার' আবেদন একসুরে বাঁধা। এই 'মহা হিন্দুসমিতি'র প্রস্তাবের ফলে যে আন্দোলন হয়, সে-সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন:[৯৪] "আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সংবাদপত্রে আন্দোলন উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্মসভা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্মসভাকে প্রথমতঃ মহাহিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও তৎপরে [পশ্চিমের 'ভারত ধরম্'] মহামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।"

রামমোহনের কালে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুদের 'ধর্মসভা' গঠিত হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর পরে ব্রাহ্মসমাজের নীতিবিকৃতি ও বিচিত্র কার্যকলাপ হিন্দুধর্মসভার ভারতব্যাপী পুনরুত্থানে সহায় হয়। ইয়ং বেঙ্গল ও বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে ১৮৮০-৯০ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানসতার দোলন (swing) বিস্ময়কর মনে হয়। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, পরাধীন দেশে স্বাদেশিকতাবোধ স্বভাবতঃই জাতীয় ঐতিহ্যমুখী হয়।

কিন্তু স্বাদেশিকতার এই স্বাভাবিক ঐতিহ্যপ্রবণতা স্বীকার করেও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীর মনের গতির প্রায়-বিপরীত বাঁক-পরিবর্তনের বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি ও কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরবর্তী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ব্যাপক প্রসার এর একটি কারণ মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি ছিল সীমাবদ্ধ, এবং অভিজাত সমাজের মতো শিক্ষিতদের তখন একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাকৌলীন্য ও চিন্তাভিজাত্য ছিল। সহজে তাঁদের চিন্তাজগতে সাধারণ স্তরের চিন্তার ছায়াপাত হত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা বিদ্যা প্রচলিত হবার পর এবং সেই বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির পর সমাজের সাধারণ স্তরভুক্ত অনেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কলেবর বৃদ্ধি করেন। শিক্ষার মান ও উদ্দেশ্যও আর্থিক পেশাগত হয়ে ওঠে, প্রকৃত বিদ্যা ও চিন্তার অনুশীলন, অথবা মনন-সাধনের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না। কাজেই সমাজের সাধারণস্তরের চিন্তা-ভাবনা-আদর্শ এই সম্প্রসারণপর্বে শিক্ষিত বাঙালীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক পরিমাণে তাঁদের সুবুদ্ধি ও সুযুক্তিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম্ সমাজমানসের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ[১৫]

> "If a society in which the various classes have very unequal standards of life, very unequal opportunities for leisure, and vastly dissimilar opportunities for psychological and critical development, offers the chances of cultural leadership to larger and larger sections of the population, the inevitable consequence is that the average outlook of those groups... tends more and more to become the prevalent outlook of the whole society... *as a result of large-scale ascent, the limited intelligence and outlook of the average person gains general esteem and importance and even suddenly becomes a model to which people seek to conform.*"—*emphasis* added.

ম্যানহাইমের এই সামাজিক সূত্র বর্তমান জনতা-সমাজের (mass society) ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। বিশ শতকের অপরাহ্ণকালে বর্তমানে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তর মধ্যে (এবং ভারতেরও, তবে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্বশ্রেণীর তুলনায় বয়সে প্রবীণ বলে এই উপসর্গ তাঁদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকট) যে ধর্মীয়

(অবতারবাদ, গুরুবাদ, পৌত্তলিকতা, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রুচিবিকারের উপসর্গ দেখা যায় তা ম্যানহাইমের এই সমাজবিজ্ঞানের সূত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই সূত্রের প্রাথমিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে (১৮৭৫-১৯০০)—শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রথম প্রসারণ কালে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তখন স্বাদেশিকতার জোয়ার ও জনসংখ্যার স্বল্পতা ব্যাপক নৈতিক বিকৃতি ও অবনতি অনেকটা প্রতিরোধ করে, কিন্তু সামাজিক চিন্তাস্রোত সাধারণস্তরের ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসের খাতে বইতে থাকে। এই প্রবাহ পথেই হিন্দুধর্মের পনরভ্যুত্থান আন্দোলন বাংলাদেশে শক্তিশালী হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশকে সেইদিকে আকর্ষণ করে।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে রাজনারায়ণ বসু একখানি চিঠিতে লেখেন (১৫ জুন ১৮৭৮):[৯৬] "...it is evident that the Brahmo movement is a *superficial* one, and has not penetrated into the very depths of Hindu Society. What is the cause of this? The cause is we do not know how to move Hindu Society. *Hindu Society must be moved in a Hindu way.*" (*emphasis* added). রাজনারায়ণ বসু সত্যকথাই বলেছেন, কিন্তু 'Hindu way'-টা কি? হিন্দুসমাজ 'must be moved', কিন্তু কোন্ দিকে, তার 'direction' কি? এই 'direction'-এর উপর নিশ্চয় 'way' নির্ভর করে। তা ছাড়া 'Hindu way' একটি নয়, অনেক। বৈষ্ণবের পন্থা ও তান্ত্রিকের পন্থা এক নয়, শঙ্করের পন্থা ও শ্রীচৈতন্যের পন্থাও এক নয়। রাজনারায়ণের 'জাতিভেদ' রক্ষা ও 'হিন্দু মহাসমিতি' গঠনের পন্থা এবং কেশবচন্দ্রের অবতার-মাহাত্ম্যের পন্থাও এক নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণ-কেশবচন্দ্র বা তাঁদের পরবর্তী ব্রাহ্মনেতা কারও পক্ষে 'Hindu way' আবিষ্কার করে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিন্দুসমাজের গভীরে প্রোথিত করা সম্ভব হয়নি। বরং আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের পথই তাঁরা প্রশস্ত করেছেন।

১৮৮০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে 'হরিসভা'র দ্রুত বিকাশ হতে

থাকে। 'ব্রাহ্মসভা'র নকল 'হরিসভা'। খ্রীস্টানদের উপাসনাসভার অনুকরণে ব্রাহ্ম উপাসনাসভা স্থাপন করে যেমন ব্রাহ্মসমাজ একসময় খ্রীস্টান পাদরিদের ধর্মাভিযান প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন,[১৭] তেমনি হিন্দু রক্ষণশীলরা ব্রাহ্মদের ধর্মীয় প্রভাব নির্মূল করার জন্য 'হরিসভা' স্থাপনে উদ্‌যোগী হলেন। সমাবেশ-উৎসব (congregational worship) বাংলাদেশে বৈষ্ণবরাই প্রবর্তন করেন, সংকীর্তন ও মহোৎসবের ভিতর দিয়ে, কিন্তু তাতে শিক্ষিত-শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করতেন না। আধুনিক মণ্ডলী-বা-সমাবেশ উপাসনা ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত, প্রধানত শিক্ষিতরাই সেই মণ্ডলীভুক্ত। এই ব্রাহ্ম মণ্ডলী-উপাসনাসভার মডেলেই হিন্দুদের 'হরিসভা' গঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:[১৮]

> "It was the Brahmo Samaj which first introduced congregational worship in modern India. With this Hindu revival and reaction, *Hari Sabhas* commenced to grow up everywhere which inaugurated a kind of congregational worship. At meetings of these *Sabhas*, scripture texts were read and expounded by some Pandit and hymns or *bhajans* were sung. All this was clearly a reproduction of the Brahmo mode of worship."

হিন্দুদের এই হরিসভার আন্দোলন, এমন ব্যাপক রূপ ধারণ করে যে গোঁড়া হিন্দুসমাজেই রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার হয়। 'সোমপ্রকাশ' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র নয়, হিন্দুসমাজেরই মুখপত্র। তৎসত্ত্বেও 'হরিসভা'র বিস্তার ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' যে আলোচনা করেন (১৮ শ্রাবণ ১২৯৩), তা নির্ভীক সাংবাদিকতা ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:[১৯]

> "ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় কালে ব্রাহ্মের উপর লোকের যে বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল সেই ভাবের সহায়তায় স্থানে স্থানে হরিসভা স্থাপিত হইল। হরিসভা ব্রাহ্ম সমাজের বিদ্বেষ্টা। দেশের ভিতর স্থানে স্থানে যদি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত না হইত, কোথাও কখনও বর্তমান পদ্ধতিক্রমে হরিসভা স্থাপিত হইত কি না সন্দেহ।* এই সকল হরি-সভার অধিকাংশ সভ্য কাহারা? যাহারা 'আর্যধর্ম' সনাতন 'হিন্দুধর্মের' নাম ডাকিয়া

* বিপিনচন্দ্র পালের ব্যাখ্যার সমর্থন 'সোমপ্রকাশে'র এই উক্তিতে পাওয়া যায়

একতালে বেদব্যাসের জন্ম দিতে চায়, পৈত্রিক ধর্মত্যাগী অনাচারী নাস্তিক বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ঘৃণা করে, মস্তকের উপর শিখা রাখিয়া কুপ্পী ও জপের ঝুলি ধারণ করিয়া গৌর নাম জপ করিতে করিতে দোকানদারী করে, আদালতের আমলা হইয়া নিতাইয়ের নামে উৎকোচ গ্রহণ করে, রাধা নামে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যার পদতলে আত্মসমর্পণ করে, আর রসকলি কাটিয়া প্রতিবাসীদিগের বৌ-ঝির সর্বনাশের চেষ্টায় বিচরণ করে। যাঁহারা বাস্তবিক বৈষ্ণব নামের অধিকারী আমরা তাঁহাদিগকে এই ঘৃণিত দলভুক্ত করিয়া পাপের ভাগী হইতে পারি না। যে সকল সভ্য বাস্তবিক ধর্মাত্মা তাঁহাদিগের চরণে একশতবার প্রণাম করিয়া দূরে রাখিয়া দি। কিন্তু একশতের মধ্যে একজনও যদি এইরূপ সাধু-হৃদয় ব্যক্তি থাকেন তিনিও এই দলে সারস বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। অবশিষ্ট নিরানব্বই জনের ধর্মের আড়ম্বর যেমনই অধিক তাহাদের পশুবৎ ব্যবহার কলঙ্কিত প্রবৃত্তি ও ভয়ানক অত্যাচারের কাহিনীও তেমনি বিচিত্র। পাঠক! হরিসভায় গিয়া ইহাদের প্রেমের ঢলাঢলি দেখিয়া আসিয়াছেন, যদি একবার এই পাশব বৃত্তিপরায়ণ পাষণ্ডদিগের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এই পাষণ্ডেরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে।"

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীরা, এমনকি তাঁদের মধ্যে অতিগোঁড়া যাঁরা তাঁরাও, নিশ্চয় ধর্মের নামে নৈতিক ব্যভিচারের স্রোত সমাজে প্রবাহিত হোক কামনা করেননি। কোন যুগে, কোন সমাজে, কোন ধর্মপ্রবর্তকই তা কামনা করেন না। কিন্তু ধর্মান্দোলন যখন কোন সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লোকচিত্ত জয় করতে চায়, তখন তার মধ্যে আদর্শবিকার ও ব্যভিচারের একটা ঝোঁক দেখা দেয়। ভণ্ড-ধার্মিকরা তার সুযোগ নিয়ে ব্যভিচারের পথ আরও সুগম করে। সাধারণ জনস্তরে তখন, ম্যানহাইমের পূর্বোদ্ধৃত সমাজসূত্র অনুসারে, ব্যভিচারনীতিই ধর্মনীতিরূপে প্রবল হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্ত্য-আদর্শপন্থী ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে নব্যহিন্দুধর্মবাদীদের 'হরিসভা' আন্দোলনের সামাজিক ফলও তাই হয়েছিল। শুধু 'হরিসভা' নয়, বাংলাদেশের বহু ধর্মসম্প্রদায় (বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি) এই সময় নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং 'গুরুবাদ' পুনরুজ্জীবিত হয় :[১০০]

"......গুরু ব্যবসা আজকাল যেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে আফ্রিকার দাসব্যবসা তাহার নিকট হার মানে। ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত কোন লোকে যদি আমাদের ধর্মের উপর একটুও বা কটাক্ষপাত করে অমনি আমাদের স্বধর্মপ্রিয়তার বৃদ্ধি হয়, সর্পের লাঙ্গুলে

অমনি যেন পা পড়ে। বিলাতে গিয়া যদি কেহ কখনও অখাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, অমনি সংস্কারকগণ সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বধর্মে থাকিয়া ধরাচূড়া পরিয়া মালা ঠুকিতে ঠুকিতে যাহারা··· ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, সমাজের ভিতর তাহাদের একটা শাসন করিবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই।"

ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত যখন সমাজে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন কারও তা শাসন করার চেষ্টা থাকে না, কোন কালেই থাকে না, আজও নেই। তার কারণ, 'ধর্ম' এমনই একটা জিনিস যা প্রকাশ্যে সমালোচিত হলে আজও সভ্য মানুষের মনে আদিম মানুষের প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। কাজেই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে যে-কোন প্রকৃত ধার্মিক, বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী ব্যক্তি নীতিভ্রষ্ট ধর্মাচরণের নীরব ও নির্বাক দর্শক থাকাই সমীচীন মনে করেন, প্রতিবাদ করে সাপের লেজ মাড়াতে চান না। ধর্মব্যবসায়ীরা তা জানেন বলেই ধর্মের নামে তাঁরা স্বেচ্ছাচার-ব্যভিচারের স্বাধীনতা পান। এই স্বাধীনতাও অনেক ক্ষেত্রে, উনিশ শতকের শেষে, বাংলার বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধন যোগায় এবং বৃহত্তর জনসমাজের মানসিক আবর্জনার তলানি উপরে গেঁজিয়ে তোলে।

সমাজের উপরের স্তরে নব্যহিন্দুধর্মের মননধর্মী আন্দোলনের মধ্যে (১৮৮০-১৯০০) দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়—একটিকে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ধারা, আর-একটিকে বলা যায় শশধর তর্কচূড়ামণি-কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন-অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রবর্তিত ধারা। শেষদিকে, ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকা পর্যটন ও চিকাগো ধর্ম মহাসভায় (১৮৯৩) হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচারান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর, আর-একটি ধারা এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ধারা, স্বামীজীর তিরোধানের পর (১৯০২), স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। 'রামকৃষ্ণ মিশন' (মে ১৮৯৭, রেজিস্টার্ড এপ্রিল ১৯০৯) ও 'বেলুড় মঠ' (ডিসেম্বর ১৮৯৮) উনিশ শতকের মধ্যেই স্থাপিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' (১৮৮৪), অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' (১৮৮৪) ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১) নব্যহিন্দুধর্মের অনুশীলনে এবং 'আলোচনা' ও 'সঞ্জীবনী' ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হয়। বঙ্কিমের

'বঙ্গদর্শন'-পর্ব ও 'প্রচার'-পর্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'প্রচার'-পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের বিচারশীল অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব এবং শশধরগোষ্ঠীর মনোভাব এক বা অভিন্ন ছিল না। বঙ্কিমের 'অনুশীলনধর্ম' ছিল যুক্তিবাদী ও মানববাদী ব্রাহ্মধর্মেরই হিন্দু-রূপায়ণ। বিপিনচন্দ্র বলেছেন :[১০১] "Bankim Chandra's *Anusheelana Dharma* was really the Brahmo Somaj ideal of....the harmionous developmunt of all the faculties of man....through his personal and social life, and he preached it only without the unpopular Brahmo name." শশধরগোষ্ঠীর নব্যহিন্দুধর্ম তা ছিল না। শশধর তর্কচূড়ামণি, বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, "adopted a new line of interpretation seeking to reconcile ancient Hindu ritualism and mediaeval Hindu faith with modern science." দেশে-বিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উন্নতি হোক, একদল হিন্দুপণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন, 'কিছুই নতুন নয়, সবই বেদে আছে, সবই শাস্ত্রে আছে।' তর্কচূড়ামণি ছিলেন সেই পণ্ডিতগোষ্ঠীর অন্যতম। অক্ষয়চন্দ্রকে বিপিনচন্দ্র বলেছেন "the most powerful opponent of progressive social views" এবং কৃষ্ণপ্রসন্নকে বলেছেন, "He had the power to rouse popular sentiments by vulgar witticism and through playing upon words."[১০২] কুসংস্কারের অন্ধকারে আছন্ন জনসমাজে পণ্ডিত ও শিক্ষিতগোষ্ঠীর এই ধর্মান্দোলন যে শক্তিশালী হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই আন্দোলন লক্ষ্য করে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করেন :[১০৩] "অনেকে বলেন, পুরাতন হিন্দুধর্ম শীঘ্র পুনরুজ্জীবিত হইবে। আবার হিন্দুগণ আর্য মুনিঋষির প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রানুসারে চলিবেন।...কিন্তু আমরা এই বেলা বলিয়া রাখিতেছি, যিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, খাঁটি হিন্দুধর্ম আর চলিত হইতে পারিবে না। সেদিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। আমাদেরও ইচ্ছা নয় যে আবার সমস্ত হিন্দুধর্মনীতি সমাজে অবিকল প্রচলিত হউক। তাহা প্রচলিত হইলে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই।" হিন্দুধর্মে একটু ভেজাল দিয়ে চালাতে হবে, কারণ 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন যে ইংরেজদের শাসনকালে সমাজের বাস্তব অবস্থার ও লোকের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চাকরি-বাকরি

ব্যবসা-বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা, এগুলি যথানিয়মে করতে হলে শাস্ত্রসম্মত হিন্দুধর্ম অনেকটা যুগসম্মত করতে হবে। খাঁটি হিন্দুধর্মের গোদুগ্ধে একটু জল না মিশিয়ে উপায় নেই। 'সোমপ্রকাশে'র এই টিপ্পনি বাস্তব সত্য। আমরা দেখেছি, শুধু জল-মেশানো তরল হিন্দুধর্ম নয়, অনাচার-ব্যভিচারের গরল মেশানো হিন্দুধর্ম কিভাবে সাধারণ জনস্তরে, পুনরুত্থানবাদীদের প্রচারের ফলে, বিস্তৃত হয়েছে।

প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের ধারা, নব্যহিন্দুধর্মের এই আন্দোলনের ফলে, স্বভাবতঃই ব্যাহত হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কঠোর সমালোচনায় পুনরুত্থানবাদীরা মুখর হয়ে ওঠেন। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অক্ষয়চন্দ্র তাঁর পত্রিকায় ও বক্তৃতায় একরকম ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন।[১০৪] বহুবিবাহ আইনত বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগরের শেষ প্রচেষ্টা (১৮৬৬) ব্যর্থ হয়। স্ত্রীশিক্ষা মন্থর গতিতে চলতে থাকে, তাও উচ্চশিক্ষা নয়, লিখন-পঠন শিক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার একুশ বছর পরে. ১৮৭৮ সালে, মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হিন্দুসমাজ ভাল চোখে দেখে নি, এমন কি প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মরাও তার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এ বিষয়ে লিখেছেন (চৈত্র ১৮০২ শক, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ):

"গত তিন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুইজন এল.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে অনেকে বি.এ. এম.এ. পরীক্ষা দানে কৃতকার্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন··· কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার কি শুভকর ফল তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি।··· আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতিবিচ্যুত হইবেন।"

১৮৮০ সালে যদি প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মরাই প্রকাশ্যে এই ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করতে পারেন, তাহলে নব্যহিন্দুধর্মের প্রচারকরা তার প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ১৮৯১ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'মনুসংহিতা'র আদর্শ স্ত্রীসমাজে প্রয়োগ করার জন্য ওকালতি করেন:[১০৫] "... জন সমাজে সুনীতি সদাচার ও ধর্মব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীরক্ষা ও তন্নিবন্ধন প্রজাশুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বাধীন থাকিলে ইহা আদৌ সম্ভবিতেই পারে না।" 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:[১০৬] "দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যদ্যপি আমরা এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করি, তাহা হইলে পরে আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে।" উদারচিন্তার পোষক হয়েও 'সোমপ্রকাশ' অবরোধপ্রথা পর্যন্ত সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হননি:[১০৭]

> "হিন্দুর সমাজবন্ধনী যেমন দৃঢ়, লোকের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার পক্ষে যেমন অনুকূল, তেমন আর পৃথিবীর কোন জাতিরাই নহে।... হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপকেরা দেখিলেন স্ত্রীলোকের চরিত্র নির্মল রাখিতে গেলে তাহাদের কমনীয়কান্তি, সুন্দর বদনচন্দ্রিমা লোকলোচনের অন্তর্হিত করিয়া রাখা চাই; তাই সভ্য নীতিসঙ্গত অবরোধপ্রথা হিন্দুসমাজের ভিতর প্রবর্তিত করিলেন। এই অবরোধপ্রথার ফলে হিন্দুরমণীরা জগতের সম্মুখে সতীত্বের আদর্শস্বরূপে পরিচিতা হইয়াছেন।"
>
> —১৮ শ্রাবণ ১২৯৩

লক্ষণীয় হল, এই 'সোমপ্রকাশ' হরিসভা, গুরুবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে তীব্র-কঠোর ভাষায় হিন্দুধর্মের ব্যভিচারের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা প্রসঙ্গে, উনিশ শতকের প্রায় শেষ দশকের কাছাকাছি, অবরোধপ্রথার সঙ্গে সতীত্বের সম্পর্ক এবং হিন্দুদের সমাজবন্ধনের দৃঢ়তার প্রশংসায় বেসামাল হয়ে গিয়েছেন। এ-প্রশ্ন 'সোমপ্রকাশে'র মনে হয়নি যে হিন্দুদের সমাজবন্ধন যদি দৃঢ় হত, তাহলে সেকালের সমাজের ভিত্তি যে ধর্ম, সেই ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের বন্যা বইত না, যে-ব্যভিচারের বন্যায় তাঁরাও আতঙ্কে শিউরে উঠে আর্তনাদ করেছেন। তা যদি মনে হত, তাহলে একমাত্র পর্দার অন্তরালে থাকলে অথবা 'লোকলোচনের অন্তর্হিত' করে রাখলে যে স্ত্রীলোকের 'সতীত্ব' রক্ষা হয়, এরকম হাস্যকর যুক্তির অবতারণা তাঁরা করতে পারতেন না। আসল কথা হল, ধর্মের চেয়েও হিন্দুসমাজের কাছে, গুরুতর

সমস্যা যে স্ত্রীস্বাধীনতা, এই নিষ্ঠুর সত্যই 'সোমপ্রকাশে'র উক্তি ও যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। কাজেই ১৯০০ সাল পর্যন্ত যদিও তিনজন বাঙালী মহিলা এম. এ. এবং বাইশ জন মহিলা বি. এ. পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হন, তাহলেও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন উনিশ শতকের শেষে যে পদে পদে ব্যাহত হয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।[১০৮] দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁর সহযোগীদের স্ত্রীশিক্ষা-স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনে আন্দোলন সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এমন কি বিদ্যাসাগরও মনে হয় বার্ধক্যে নব্যহিন্দুধর্মের আন্দোলনে এবং বিধবাবিবাহ বাল্যবিবাহ প্রচলন (আইন সত্ত্বেও) ও বহুবিবাহ-প্রতিরোধের সামাজিক ব্যর্থতায় কিছুটা দেশাচার-সচেতন হয়েছিলেন। সহবাস-সম্মতি আইনের প্রস্তাবের (Age of Consent Bill) বিরুদ্ধে অভিমত জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেন (ভারত-সরকারের কাছে লিখিত চিঠিতে) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ :[১০৯]

> "I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage."

অবশেষে মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে বিদ্যাসাগরও 'religious usage'-এ হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। যিনি আইনসম্মত বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, যিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তিনি প্রকারান্তরে 'বাল্যবিবাহের' সমর্থন করেন শেষজীবনে। অথচ এই বাল্যবিবাহই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল উনিশ শতকে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার। বাল্যবিবাহের সামাজিক কুফল নিয়ে তখনকার সাময়িকপত্রে আলোচনাও হয়েছে যথেষ্ট।[১১০] কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু লোকাচারের বিরোধিতার ভয়ে কোন সংস্কারক তার প্রতিকার করতে পারেননি। নব্যহিন্দুধর্মের আন্দোলন স্বভাবতঃই বাল্যবিবাহপ্রথা আরও দৃঢ়মূল করেছে। তার ফলে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোন উল্লেখ্য অগ্রগতি বাংলাদেশে হয়নি।

উপরন্তু আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার ফলে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর এনট্রান্স-এল. এ. এম. এ পাসকরা যুবক, ডাক্তার-উকিল-ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, বাংলার সামাজিক জীবনে নতুন একটি সমস্যা দেখা দেয়। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার 'commercialisation', অর্থাৎ বিদ্যাও

বাজারের পণ্য এবং যার বিদ্যা যত বেশি (অবশ্যই লেবেল-বা ছাপ-মারা বিদ্যা) তাঁর বাজার-মূল্যও (market-price) তত বেশি। সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিনের ভাষায় বলা যায়—"the learned had to begin to work for a 'free market'··· there was a close correlation between the mercantile classes and the intelligentsia··· by the inherent objective and stylistic relationship of money and intellect."[১১১] কাজেই শিক্ষিতরা নতুন একটি শিক্ষা-বিদ্যাব্যবসায়ী শ্রেণীতে পরিণত হন। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য 'free market' যেহেতু খুবই সীমাবদ্ধ, তাই বিবাহ-বাজারে (matrimonial market) শিক্ষিতরা মূল্য-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। বাঙালী হিন্দুসমাজে বিবাহ-পণপ্রথার (dowry) উদ্ভব হল। আধুনিক বাণিজ্যপ্রবণ শিক্ষার ভীতিপ্রদ সামাজিক অভিসম্পাত এই পণপ্রথা। 'সোমপ্রকাশ' এ বিষয়ে 'বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয়' শিরোনামে (১০ আষাঢ় ১২৯১) লেখেন :[১১২]

> "পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার যে বিবাহ দেওয়া হয় তাহারই নাম আসুর। বঙ্গদেশে অনেকদিন অবধি এ-বিবাহটি চলিয়া আসিতেছে। কুলীন মৌলিক বংশজ প্রভৃতির ব্যবস্থাই এ কুৎসিত প্রথার কারণ।··· একে এই প্রথার জালায় বাঁচা যায় না, কত বৃদ্ধ ও গুণহীন কাপুরুষ গুণবতী ও রূপবতীর পাণিগ্রহণ করিতেছে।·· এই জালার উপরে আবার পুত্রবিক্রয়ের জ্বালা উপস্থিত। এই পুত্রবিক্রয়ের প্রথা উপস্থিত হওয়াতে সকল শ্রেণীরই, বিশেষতঃ কায়স্থশ্রেণীর কন্যার বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার দুই তিনটি কন্যা জন্মে, তিনি অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন হন। বরকর্তার চিত্তসন্তোষ সাধনার্থ তাঁহাকে ইটে-ভিটে বিক্রয় করিতে হয়। লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে বাসা বাঁধেন না। ছেলে যে পরিমাণে পাস দিতে আরম্ভ করে, সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে।···একি সভ্য ব্যবহার ?"

'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক আলোচনার শেষে তৎকালের জনপ্রিয় লোক-কবি রূপচাঁদ পক্ষী রচিত একটি সঙ্গীত (পণপ্রথা বিষয়ে) উদ্ধার করেছেন :

> "আ মরি কি আকাল, কন্যাবিবাহের কাল, আজ কাল
> হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
> মাতৃদায়, পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায়, ভিটে
> মাটি চাটি হয়, বিয়ের ব্যয়েতে ॥···

বাঙালী বাধাকুল, প্রায় হলো নির্মূল, বিশ্ববিদ্যালয়
স্কুল, সুরু যে হতে।
এনট্রান্স একপেসে, এল এ দুপেসে, বি.এ
তেপেসে মান্য ভারতে॥…
চারিপেসের কর্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ্য, যার ছেলে গণ্ডমূর্খ,
সে মরে দুঃখেতে।
ছেলে থাকিলে গুণবন্ত, একরাত্রে হতাম ভাগ্যবন্ত, পোড়াকপালী
ভেড়াকান্ত, ধল্লেন গর্ত্তেতে॥…
উচ্চশিক্ষার প্রভাবে, দেশের উন্নতি হবে, সমাজের কুক্রিয়া যাবে,
বিদ্যার জ্যোতিতে।
হিতে হলো বিপরীত, পাসকরা বাড়ায় কুরীত, এশিক্ষা কার মনোনীত
হয় অনিষ্ট যাতে॥…"

বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজে 'কন্যাদায়' যে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার দান, এই সামাজিক সত্য অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। 'কন্যাদায়ে'র অবশ্যম্ভাবী ফল হল, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অমর্যাদা ও অপমান। এই অমর্যাদার অভিশাপ নিয়েই বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্ম হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই অভিশাপের বোঝা তাকে বহন করতে হয়। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রগতিবাদীদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে, একেবারে রুদ্ধ হয়নি—হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের গুরুগর্জনের মধ্যেও তাঁদের গুঞ্জন শোনা গিয়েছে, এমন কি সনাতন-হিন্দুধর্মীরাও বহুবিবাহাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন[১১৩] —কিন্তু সমাজসংস্কারের ইতিহাসের নিষ্ঠুর প্রহসন হল, 'পুত্রবিক্রয়' ও 'কন্যাদায়ে'র 'অসভ্য' ('সোমপ্রকাশে'র ভাষায়) প্রথা রহিত করার জন্য কোন আন্দোলনে কোন ফল হয়নি। স্ত্রীজাতির অমর্যাদা ছাড়াও, পণপ্রথার ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তের আর্থনীতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের সঞ্চিত মূলধনটুকু, স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্যের বা কর্মসংস্থানের শেষ সম্বলটুকু তাঁরা হারিয়েছেন, এবং বংশপরম্পরায় প্রধানত চাকরি-রূপ দাসত্বের মুখাপেক্ষী হয়েছেন।

এই সময় বাংলার মুসলমানদের সমাজচিন্তার গতি কি ছিল তা না জানলে সমাজচিত্র সম্পূর্ণ হয় না। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, সে কথা আগে বলেছি (পৃষ্ঠা ২১৭-২০)। উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই 'ওয়াহবী' আন্দোলন বাংলার-তথা-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মগোঁড়ামি নতুন করে জাগিয়ে তোলে এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তখন থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আর্থনীতিক সংগ্রামে (যেমন বাংলার প্রজাবিদ্রোহে) দরিদ্র মুসলমান কৃষকরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্রোহ করেছে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থসীমা লঙ্ঘন করে তারা হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ("In the peasant rising around Calcutta in 1831, they broke into the houses of Musalman and Hindu landholders with perfect impartiality" —*Hunter*[১১৪]) তাহলেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে শেষ পর্যন্ত তারা মুক্ত হতে পারেনি। ক্যান্টওয়েল স্মিথ তাই বলেছেন :[১১৫]

> "The *Wahabi* movement, therefore, did not set lower class Muslims against lower class Hindus in open conflict, nor did it divert lower class Muslims from economic issues to a false solidarity with their communal 'friends' but class enemies. *None the less it did encourage communal attitudes*, especially in religious thinking, and left a considerable section of the Muslim masses more susceptible to later communalist propaganda than they might otherwise have been."—*emphasis* added.

বাংলাদেশে ওয়াহবীরাই প্রথম 'সন্ত্রাসবাদী' বলে পরিচিত হন, আবছুল্লার বিচারপতি নরম্যান-হত্যা (১৮৭১) এবং শের আলির বড়লাট মেও-হত্যার (১৮৭২) পর। কিন্তু তার ফলে কোন অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ, অথবা রাজনৈতিক চেতনা মুসলমানদের মধ্যে জাগেনি। আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের যেটুকু বিকাশ হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তাও নগণ্য। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে মুষ্টিমেয় মুসলমান যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, বৃহত্তর মুসলমান-সমাজের কাছে তাঁরা বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। বাংলাদেশে মৌলবী আবছুল লতিফ 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন

করে (এপ্রিল ১৮৬৩) পাশ্চাত্য জ্ঞানবিস্তার প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হন। আবদুল লতিফ নিজে লিখেছেন:[১১৬]

"Being fully aware of the prejudice and exclusiveness of the Mahomedan community, and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo Society, I founded the Mahomedan Literary Society in April 1863......"

আবদুল লতিফের এই প্রয়াস যে একেবারে ব্যর্থ হয় তা নয়। সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৯৮) আন্দোলনের ফলেও মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।[১১৭] কিন্তু বাংলাদেশে যখন ধীরে ধীরে ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় তখন থেকে, আমরা দেখেছি, জাতীয়তাবোধের নবজাগরণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের কণ্ঠে 'হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্বে'র সুরই ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হতে থাকে। তার সঙ্গে নব্যহিন্দুধর্মের আন্দোলনও যুক্ত হয়। তার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ব্যবধান বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলার মুসলমানরা তাঁদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির দাবি-দাওয়া স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণা করতে আরম্ভ করেন এবং ব্রিটিশ শাসকরাও কৌশলে তাকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে চালনা করেন। তৎকালের সাময়িকপত্রের আলোচনা থেকেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।[১১৮] কংগ্রেসের আন্দোলন এই সাম্প্রদায়িকতার প্রবাহ প্রতিরোধ করতে পারেনি। ১৮৯১ সালে সৈয়দ আমীর আলির বিখ্যাত গ্রন্থ *Spirit of Islam* প্রকাশিত হয়।[১১৯] এই গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ এবং কেবল বাংলার বা ভারতের নয়, ভারতের বাইরের সমগ্র মুসলমানসমাজের মনে এই গ্রন্থ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, খ্রীস্টধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের কঠোর সমালোচনা করে আমীর আলি ইসলামধর্মের অতুলনীয় মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। এমন একসময়ে করেন যখন এদেশে আর্যধর্ম (দয়ানন্দ) ও নব্যহিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উচ্চশিক্ষিতদের কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। কাজেই আমীর আলির ইসলামধর্মগ্রন্থ এদেশের উদীয়মান

শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আকর হয়ে ওঠে।[১২০] সৈয়দ আহমদের প্রভাবও তার ফলে কিছুটা শেষদিকে ম্লান হয়ে যায় এবং তিনিও শুদ্ধ-সদাচারী ইসলামপন্থী হয়ে ওঠেন, জাতীয় জীবনে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হন।

অতঃপর এই 'Spirit of Islam' কার্জনের শাসনকালে (১৮৯৯-১৯০৫) বাংলাদেশে প্রবলভাবে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগের ফলে (১৯০৫)। ১৯০৫ সালেই স্থাপিত হয় 'মুসলিম লীগ'।। "The partition struck at the root of the Bengali nation, and at the nationhood of the Indian Motherland"[১২১]—এবং তার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় হয় বিশ শতকে। সে-ইতিহাসের ছন্দ ও আবর্তের সঙ্গে উনিশ শতকের পার্থক্য আছে, কিন্তু তবু ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় বলতে হয়— "In everything the old overlaps the new" এবং সামাজিক ইতিহাসের ধারায় "There is never any clear cut"—সমাজ ও জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। তাই বিশ শতকের বাংলার আবর্তসঙ্কুল সামাজিক জীবনের সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্যে, সন্ধান করলে দেখা যাবে, অনেক স্রোত ও তরঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে উনিশ শতকে—হয়ত বা তারও আগে, আরও দূর অতীতে।

নির্দেশিকা

২২৮ (১) Lewis Mumford : *The Culture of Cities*, London Reprint 1944, p. 98

২২৯ (২) Quoted in Mnmford, op. cit, p. 72

২২৯ (৩) H. J. Rainey : *Historical and Topographical Sketch of Calcutta*, Calcutta 1876, p. 118 : "1802 : On the 20th August, a Regulation was passed prohibiting Hindu parents from casting their children off Sagar Island."

২২৯ (৪) The Calcutta Monthly Journal : December 1801 : "Gangasagar Child Throwing Ceremony".

২৩১ (৫) G. M. Trevelyan : *English Social History*, London 1948 pp. 495-96.

২৩১ (৬) H. L. V. Derozio : *Poems*, Calcutta 1827

২৩১ (৭) Trevelyan, op. cit, p. 96

২৩২ (৮) Trevelyan, op, cit, pp. 96-97

২৩২ (৯) Bengal Hurkaru : 'Lal Bazaar Revelries', September 24, 1842

২৩২ (১০) Karl Mannheim : *Essays on The Sociology of Culture*, London 1956, pp. 137-39

২৩৩ (১১) জয়গোপাল গুপ্ত : গীতরত্ন, কলিকাতা ১২৬৩, পৃষ্ঠা ৭-৮

২৩৩ (১২) রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সংগৃহীত : রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। কলিকাতা ১৭৯৫ শক, পৃষ্ঠা ৮

২৩৪ (১৩) Lewis Mumford : *Technics and Civilisation*, London 1934, p. 136

২৩৪ (১৪) Mumford, op. cit, p. 134

২৩৫ (১৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামমোহন রায় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৬): রামমোহনের গ্রন্থাবলীর তালিকা দ্রষ্টব্য।

২৩৫ (১৬) *Johnson's England* : An Account of the Life and Manners of his Age : ed, by A. S. Turberville (Oxford 1933) : Vol I, pp. 210-11

২৩৫ (১৭) The Calcutta Journal, Vol 3, May 18, 1819, No. 89 (লাইন ঃ ৩)

২৩৬ (১৮) Karl Mannheim : *Man and Society*, London 1940, p. 84 fn.

২৩৮ (১৯) F. Parkes : *Wanderings of a Pilgrim etc.* London 1850
E. Roberts : *Scenes and Characteristics of Hindostan*, London 1835. ইত্যাদি।

২৪০ (২০) শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০৪, বিষ্ণু চক্রবর্তীর জীবনী : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮০৭ শক, ৮৭১ সংখ্যা সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮০-৬৮৪

২৪১ (২১) Parliamentary Papers (London) Vol XVIII, 1821

২৪১ (২২) Parliamentary Debates (London)

1821—April-July, Vol V, Cols 1217-22

1823—May-July, Vol IX, Cols 1017-1021

1825—April-July, Vol XIII Cols 1043-1047

সতীদাহের সংখ্যা বিষয়ে তথ্যাদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

২৪৫ (২৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০-৭; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৫-৭৮

২৪৫ (২৪) *Human Sacrifices in India* : Substance of the Speech of John Poynder, on the 21st and 28th Days of March 1827, London 1827.

২৫১ (২৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ২য়, পৃষ্ঠা ২৭১-৭২, ২৭৪, ৫৮০-৮১

২৫১ (২৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পৃষ্ঠা ১৪-১৫

২৫২ (২৭) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : পঞ্চবিংশতি, পৃষ্ঠা ১৬

২৫৩ (২৮) Kisory Chand Mitra : 'The Hindoo College and its Founder'—a lecture, printed in App. B, Peary Chand Mitra's *A Biographical Sketch of David Hare*, Calcutta 1877.

ডিরোজিও সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদের উক্তিগুলি এই বক্তৃতা থেকে গৃহীত।

২৫৪ (২৯) Peary Chand Mitra : op. cit,

২৫৪ (৩০) Rev. Lal Behari Day : *Recollections of Alexander Duff*, London 1879, Ch. III, pp 27-36

২৫৫ (৩১) India Gazette : ১৮৩১-৩২ সালের পত্রিকায় 'এনকয়ারার' পত্রিকার অনেক উদ্ধৃতি আছে।

২৫৬ (৩২) Rev. Alexander Duff : *India and India Missions*, Edin 1840, Appendix pp. 631-708—ডাফের উক্তিগুলি ও 'এনকয়ারার' পত্রিকার মন্তব্যগুলি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে উদ্ধৃত।

২৫৬ (৩৩) L. B. Day : op. cit, Ibid

২৫৭ (৩৪) Hindu College MS Proceedings, 1831 (unpublished).

বিনয় ঘোষ : বিদ্রোহী ডিরোজিও

২৫৯ (৩৫) Baboo Krishna Mohana Banerjea : *The Persecuted* or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta, Lal Bazar 1831.

২৬০ (৩৬) Alexander Duff : op. cit, p. 673.

২৬০ (৩৭) Duff : op. cit, p. 679-80

২৬২ (৩৮) S. N. Eisenstadt : *From Generation to Generation* : Age Groups and Social Structure, Free Press, New York 1964, p. 318

২৬২ (৩৯) Eisenstadt, op. cit, pp 313-14

২৬৩ (৪০) Eisenstadt, op. cit, p. 311

২৬৪ (৪১) Encyclopaedia of Social Sciences (1951 print), vol. 6

২৬৪ (৪২) A. S. Turberville edited : *Johnson's England* : An Account of the Life and Manners of his Age (Oxford 1933), vol. I, pp 210-11

২৬৫ (৪৩) Duff : op. cit, pp. 637-38

২৬৬ (৪৪) Duff : op. cit, p. 640

২৬৭ (৪৫) Selections from Discourses delivered at the Meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge, Vol I. (1840), Vol II (1842), Vol III (1843).

২৬৭ (৪৬) Sivanath Sastri : *History of the Brahmo Samaj*, vol I, Calcutta 1919 pp 86-88

২৭২ (৪৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ২য়, পৃষ্ঠা ৪৭৭-৯৭ : 'ডাফের প্রতিবাদ', আশ্বিন ১৭৬৬ শক ; 'Vaidantic Doctrines Vindicated', ১ ফাল্গুন ১৭৬৬ শক ।

২৭৩ (৪৮) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা

২৭৩ (৪৯) শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা ২০০

২৭৪ (৫০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী : ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

২৭৪ (৫১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৭ শক জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

২৭৪ (৫২) আত্মজীবনী : পৃষ্ঠা ৬৫

২৭৪ (৫৩) রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৪৬

২৭৬ (৫৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ১ম, পৃষ্ঠা ১৮১ ; ২য়, পৃষ্ঠা ৫৫৯-৬৩ ; ৩য়, পৃষ্ঠা ৫৭৬-৭৮

২৭৮ (৫৫) J. A. Richey : *Selections from Educational Records*, Part II (1840-59), pp 52-56

২৭৯ (৫৬) সম্বাদ ভাস্কর, ১২ জুন ১৮৪৯

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রচনাগুলি 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭-৪২৬ দ্রষ্টব্য ।

২৮০ (৫৭) ভূদেব মুখোপাধ্যায় : বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১৩২৭—'রাজা রামমোহন রায় ও তন্ত্রশাস্ত্র', পৃষ্ঠা ১৪৩-৫৯

দিলীপকুমার বিশ্বাস : 'রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র'—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৬ খণ্ড, ৪ সংখ্যা, বৈশাখ আষাঢ় ১৮৮২ শক ।

'রাজা রামমোহন ও তন্ত্র'—দেশ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৭

২৮১ (৫৮) Speeches of Ram Gopaul Ghose etc., Calcutta N. D. p. 65

২৮১ (৫৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩য়, পৃষ্ঠা ৩৪৯-৫০, ৩৬০-৬১, ৩৬৩-৬৪

২৮২ (৬০) Transactions of the Bethune Society, 1859-60

২৮৪ (৬১) বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, ৪ অধ্যায়

২৮৬ (৬২) Widow Remarriage Papers, Manuscript Records, National Archives, Delhi : Letter dated Fort William, the 24th July 1837

২৮৬ (৬৩) দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশবংশাবলি চরিত, ২৪ অধ্যায়

২৮৮ (৬৪) Widow Remarriage Manuscript Records : National Archives, Delhi

২৯১ (৬৫) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাঁর সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' তিনখণ্ড দ্রষ্টব্য। এছাড়া—

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪, ১৯১, ১৯৭, ২১৬-২০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১-৭০, ১৯৬-২০১, ২০১-৪

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭-৮০, ৯০-৯২, ১৩০-৩১, ২৯০-৯১, ৩০০-১, ৩০৩-৫, ৩১৩-১৪, ৩২৯-৩০, ৩৩৮-৩৯, ৩৪৩-৪৭, ৩৫২-৫৮, ৩৭৭

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭-২৮, ৩২২-২৩, ৩৩০-৪৩

২৯২ (৬৬) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী, ও ডঃ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছেন। এছাড়া আরও অনেক রচনা এবিষয়ে ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহের 'স্বরূপ' বা 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমান লেখকের কাছে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিশ্লেষণ ও মতামত অনেক বেশি ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়:

Dr. R. C. Majumdar: *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, second edition, Calcutta 1963.

এই গ্রন্থের চতুর্থ বিভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় 'The Character of the Outbreak of 1857' (pp 383-432) দ্রষ্টব্য।

বিদ্রোহের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য:

Benoy Ghose: 'Bengali Intelligentsia and the Revolt' in *Rebellion 1857, A Symposium*, People's Publishing House, New Delhi 1957.

২৯৩ (৬৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চার খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৯৪ (৬৮) British Indian Association Reports, 1859-60

২৯৬ (৬৯) কেশবচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী প্রধানত P. C. Mozoomdar-এর *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen* (Calcutta 1931) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২৯৮ (৭০) Sivanath Sastri: *History of the Brahmo Samaj* Calcutta 1919, Vol I, pp. 146-47

২৯৯ (৭১) Sivanath Sastri: op. cit, p 148

৩০১ (৭২) Op. cit, p. 189

৩০২ (৭৩) Op. cit, p. 187

৩০২ (৭৪) Op. cit, p. 190

৩০২ (৭৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২০৩-১১

৩০৪ (৭৬) অজিতকুমার চক্রবর্তী: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: এলাহাবাদ ১৯১৬, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৫০৪-৩০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয়, 'প্রাসঙ্গিক তথ্য'

৩০৫ (৭৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২১৫-১৬

৩০৫ (৭৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২১৬-১৭

৩০৬ (৭৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে) কলিকাতা ১৩৫৯

৩০৬ (৮০) Sivanath Sastri : op. cit, p. 306

৩০৭ (৮১) B. C. Pal : *Memories of My Life and Times*, Calcutta 1932, p. 309

৩০৮ (৮২) op. cit, pp. 226-27

৩১০ (৮৩) Surendranath Banerjea : *A Nation in Making* : Oxford University Press 1925, p. 38.

৩১০ (৮৪) op. cit, p. 42

৩১১ (৮৫) op. cit, p. 43

৩১২ (৮৬) op. cit, p. 76 (pp 76-79)

৩১২ (৮৭) op. cit. Chapter XX, pp. 205-6

৩১৩ (৮৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৪৭১-৭৩

৩১৪ (৮৯) S. N. Banerjea : op. cit Ch. XVIII 'The Partition of Bengal'.

৩১৪ (৯০) B. C. Pal, op. cit, p. 433

৩১৫ (৯১) op. cit, pp. 424-25

৩১৫ (৯২) রাজনারায়ণ বসু : বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, ১৮৮২—'জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন।'

৩১৫ (৯৩) রাজনারায়ণ বসু : বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭), ভূমিকা।

৩১৬ (৯৪) আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৯৮

৩১৭ (৯৫) Karl Mannheim : *Man and Society* ; London 1954, p. 102

৩১৮ (৯৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৫৯

৩১৯ (৯৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয়, সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা ২৯-৩০

৩১৯ (৯৮) B, C. Pal : op. cit, p 428

৩১৯ (৯৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৬৭

৩২০ (১০০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৭

৩২২ (১০১) op. cit, p. 427

৩২২ (১০২) op. cit, pp. 438-39

৩২২ (১০৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৩১৮-২২

৩২৩ (১০৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৪৩

৩২৪ (১০৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা ৩৫১-৫৮

৩২৪ (১০৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২৭৬-৭৮

৩২৪ (১০৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৮-৬৯

৩২৫ (১০৮) Calcutta University Calendar, upto 1900

৩২৫ (১০৯) বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩-৪

৩২৫ (১১০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা ৫৩৫-৪১ ; চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২০৬-৭, ২১২-১৫, ২৫৯-৬৯, ২৮৫-৯৩, ৩২৩-২৪, ৩৬২-৬৩, ৩৬৯-৭০

৩২৬ (১১১) A. V. Martin : *Sociology of the Renaissance*, London 1945, p. 41

৩২৬ (১১২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ৩১২-১৫

৩২৭ (১১৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৯

৩২৮ (১১৪) W. W. Hunter : *The Indian Mussalmans*, pp. 106-7

৩২৮ (১১৫) W. Cantwell Smith : *Modern Islam in India—A Social Analysis* Lahore 1943, pp. 189-90

৩২৯ (১১৬) Abdul Luteef : *A Short Account of My Public Life*, Calcutta 1885—Thacker Spink & Co-র প্রকাশিত আবদুল লতিফের কর্মজীবনের ঘটনাবলীর সংকলন গ্রন্থে (১৯১৫) সন্নিবেশিত।

৩২৯ (১১৭) W. Cantwell Smith, op. cit, Ch. I

G. F. I. Graham : *Life and Work of Syed Ahmed Khan*, London 1885.

৩২৯ (১১৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র পৃষ্ঠা ২৩৪–৩৭, ২৬৭-৬৯, ৩৪৩-৪৪, ৩৫৯, ৪০৩-৬, ৫৬৩-৬৪, ৫৬৯-৭১

৩২৯ (১১৯) Syed Ameer Ali : *The Life and Teachings of Mohammed, or The Spirit of Islam*, 1891—পরবর্তী সংস্করণে (১৯২২) নাম দেওয়া হয় *The Spirit of Islam.*

৩৩০ (১২০) Cantwell Smith, op. cit, Ch. II

৩১০ (১২১) Valentine Chirol : *India Old and New* p 115

নির্ঘণ্ট